ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের

ভৌতিক

মজার মজার গল্প

সম্পাদক

মনোজিৎ বসু

ও

সুপ্রীন মৈত্র

www.banglabooks.in

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.banglabooks.in
Click here

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের

ভৌতিক

মজার মজার গল্প

সম্পাদক

মনোজিৎ বসু

ও

সুপ্রিয় মৈত্র

সুপ্রকাশিনী

৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

BHAUTIK MAJAR MAJAR GALPA
of TRAILOKYANATH MUKHOPADHAYA
Edited by Manojit Basu & Sudhin Maitra

প্রকাশক

শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র

৮ বি, কলেজ রো,

কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশ

১৯৬৫

মুদ্রণে

নিউ মহামায়া প্রেস

৬৫/৭ কলেজ স্ট্রীট,

কলিকাতা ৭০০০৭৩

॥ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ॥

জন্ম ঃ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে (১২৫৪ বঙ্গাব্দের ৬ শ্রাবণ) ২৪-পরগনা জেলার শ্যামনগরের কাছে রাহুতা গ্রামে। পিতার নাম—বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়।

কর্ম-জীবন ঃ ১৮৬৬-৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে তিন বছর বীরভূমের দুটি স্কুলে এবং পাবনা জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) একটি স্কুলে শিক্ষকতা; পরে উড়িষ্যার কটক জেলায় পুলিসের দারোগাগিরি। ১৮৭০-৭৫ খ্রীব্দাব্দে 'বেঙ্গল গেজেটিয়ার' সংকলন-দপ্তরে সংকলন-কর্মে নিযুক্ত থেকে বিশেষ কর্মদক্ষতার পরিচয় প্রদান। ১৮৭৫-৮১ খ্রীষ্টাব্দে তখনকার উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে এবং সংযুক্ত-প্রদেশের (এখনকার উত্তর-প্রদেশের) অযোধ্যায় ভারত-সরকারের 'কৃষি ও বাণিজ্য' বিভাগে কর্মরত। ১৮৮১-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সরকারের রাজস্ব ও কৃষি দপ্তরের 'প্রদর্শনী বিভাগের' মুখ্য-পরিচালক। এর মধ্যে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার 'বেঙ্গল ইকনকিম মিউজিয়ম-এর সহকারী-অধ্যক্ষের কাজও করেন। এই সময়ের মধ্যে একবার ও পরে ১৮৮৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আর একবার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী সংগঠনের ব্যাপারে ইউরোপে গমন। ভারত-সরকারের নির্দেশ মতো সেই সময় তিনি ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, জার্মানি, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালা ও সরকারী দপ্তরে ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যাদির ও কারুশিল্পের সংগ্রাহকরূপে কাজ করেন। ১৮৮৭-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতীয় যাদুঘর' (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম)-এর সঙ্গে যুক্ত 'বেঙ্গল ইকনমিক অ্যাণ্ড আর্ট মিউজিয়ম'-এর সহকারী কিউরেটার। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ।

সাহিত্য-জীবন ঃ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ।

গ্রন্থাবলী ঃ (ইংরেজী) 'এ হ্যাণ্ড বুক অব্ ইণ্ডিয়ান প্রোডাক্টস্ অ্যাণ্ড র-মেটিরিয়াল্স্' (১৮৮৩); আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স অব্ ইণ্ডিয়া (১৮৮৮); এ ভিজিট টু ইয়োরোপ (১৮৮৯); ব্রাস্, ব্রোঞ্জ অ্যাণ্ড কপার ম্যানুফ্যাকচার্স (১৮৯৪); পটারী অ্যাণ্ড গ্লাসওয়্যার অব্ বেঙ্গল (১৮৯৪-৯৫)। (বাংলা) কঙ্কাবতী (১৮৯২); ফোকলা দিগম্বর (১৯০১); মুক্তামালা (১৯০২); মজার গল্প (১৯০৬); ভূত ও মানুষ (১৯০৭); পাপের পরিণাম (১৯০৮); ডমরু-চরিত (১৯১৩)।

মৃত্যু ঃ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, ৭৩ বছর বয়সে।

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

নিবেদন

উনিশ শতকের যে কালপর্বে ধীরপ্রবহমান বাঙালী জীবনের বিভিন্ন স্তরের নরনারীকে নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ নানান বিচিত্র রসের কাহিনী রচনা করে চলেছেন, সেই সময়ে বাঙলা কথাসাহিত্যসাম্রাজ্যে একাধিপতি সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে বাঙালী মানুষের অন্তরতম সত্তাকে আবিষ্কার করছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন হওয়া সত্ত্বেও ত্রৈলোক্যনাথ যে আচ্ছাদিত হয়ে পড়েন নি, তার বিশেষ কারণ তাঁর দৃষ্টির অনন্যতা, রচনার ভিন্নতর স্বাদবৈচিত্র্য, এবং তাঁর কৌতুকস্মিত, হাস্যোচ্ছল মনটি। সেই মন, সেই দৃষ্টি নিয়ে যখন কলম ধরেন তিনি, তখন নির্মল হাসির ঝরনা অনর্গল ধারায় ঝরে পড়ে, আর অপ্রাকৃত ভৌতিকতাও রসিক মনের প্রীতিরসে জারিত হয়ে কৌতুকচ্ছটা বিকিরণ করতে থাকে।

তাই, বিশ শতকের এই অষ্টম পাদেও ত্রৈলোক্যনাথ বাঙালী জীবনে প্রাসঙ্গিক, আজও তিনি আমাদের মানবিকতাকে স্পর্শ করেন, সঞ্জীবিত করেন। গত শতকের হয়েও এখনও তিনি আমাদের শতকের চিরনবীন কথাকার।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় মনোজিৎ বসুর আকস্মিক মৃত্যুতে এই বইটির সম্পাদনা অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়ায় আমাকেই সম্পাদনার কাজে এগিয়ে আসতে হয়। এই কাজে যাঁরা আমাকে সৎ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সুধীন মৈত্র

সূচীপত্র

লুল্লু / ১

নয়নচাঁদের ব্যবসা / ৪৩

বীরবালা / ৭১

পাপের পরিণাম / ৯৪

লুল্লু

প্রথম অধ্যায়

চুরি

"লে লুল্লু," আমীর সেখের মুখ দিয়া যখন এই কথা তুইটি নির্গত হইল, তখন তিনি জানিতেন না, ইহাতে কী বিপত্তি ঘটিবে। কথা তুইটি আমীরের অদৃষ্টে বজ্রাঘাতরূপে পতিত হইল। আমীরের বাড়ি দিল্লী শহরে, আমীর জাতিতে মুসলমান। একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমীরের বিবি একেলা বাহিরে গিয়াছিলেন। পরিহাস করিয়া, স্ত্রীকে ভয় দেখাইবার জন্য আমীর ভিতর হইতে বলিলেন,—"লে লুল্লু।" অর্থাৎ কি না "লুল্লু! তুই আমার স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া যা।" লুল্লু, কোনো তুরন্ত বাঘেরও নাম নয়, কিংবা ছুরিধারী কানকাটারও নাম নয়। "লুল্লু" নেহাত কথার কথা, ইহার কোনো মানে নাই, অভিধানে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না, পরিহাস করিয়া আমীর কেবল কথাটি জোড়তাড় করিয়া বলিয়াছিলেন।

কিন্তু যখন বিপত্তি ঘটে, তখন কোথা হইতে যেন উড়িয়া আসে। আশ্চর্যের কথা এই, লুল্লু ছিল একটি ভূতের নাম। আবার, দৈবের কথা শুন, লুল্লু সেই রাত্রিতে, সেই মুহূর্তে আমীরের বাড়ির ছাদের আলিশার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল। হঠাৎ কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। সে চমকিয়া উঠিল। শুনিল,—কে তাহাকে কী লইতে বলিতেছে। চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে এক পরমা সুন্দরী নারী। তাহাকেই লইয়া যাইবার জন্য লুল্লুকে অনুরোধ করা হইতেছে। এরূপ সুন্দরী পাইলে দেবতারাও তদ্দণ্ডে নিকা করিয়া ফেলেন, তা ভূতের কথা ছাড়িয়া দাও। চকিতের ন্যায়, তুর্ভাগা রমণীকে লুল্লু আকাশপথে কোথায় যে উড়াইয়া লইয়া গেল, তাহার আর ঠিকানা রহিল না।

আমীর, ঘরের ভিতর থাকিয়া মনে করিতেছিলেন, স্ত্রী এই আসে।

এই আসে, এই আসে করিয়া অনেকক্ষণ হইয়া গেল, তবুও তাঁহার স্ত্রী ফিরিয়া আসিলেন না। তখন তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; তখন তিনি স্ত্রীকে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়া-শব্দ পাইলেন না। বাহিরে নিবিড় অন্ধকার, নিঃশব্দ। বাহিরে আসিয়া, এখানে ওখানে চারিদিকে স্ত্রীকে খুঁজিলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না। মনে তবু এই আশা হইল, স্ত্রী বুঝি তামাশা করিয়া কোথাও লুকাইয়া আছে। তাই, পুনরায় প্রদীপ হাতে কারয়া আতিপাতি করিয়া সমস্ত বাড়ি অনুসন্ধান করিলেন, বাড়ির ভিতর স্ত্রীর নাম-গন্ধও নাই। আবার আশ্চর্যের কথা এই যে, বাড়ির দ্বার বন্ধ। সন্ধ্যাকালে নিজে তিনি যেরূপ বন্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বন্ধই রহিয়াছে। তবে তাঁহার স্ত্রী কোথায় গেলেন? পতিব্রতা সতী-সাধ্বী আমীর-রমণী বাড়ির বাহিরে কখনই পদার্পণ করিবেন না। আর যদিও-বা করেন তাহা হইলে দ্বার খুলিয়া তো যাইতে হইবে! দ্বার তো আর ফুড়িয়া যাইতে পারেন না। দারুণ কাতর হইয়া আমীর এই সব চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমীরের চক্ষু হইতে বুক বহিয়া অবিরত জল পড়িতে লাগিল। গৃহলক্ষ্মীকে গৃহে না দেখিয়া গৃহ শূন্য, জগৎ শূন্য, হৃদয় শূন্য,—আমীর সবই শূন্য দেখিতে লাগিলেন। কেবল শূন্য নয়, গ্রীষ্মকালের রৌদ্রকিরণে উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিয়া হৃদয় তাঁহার জ্বলিতে লাগিল। "আমি আমার অমূল্য নারী-রত্নকে আপন হাতেই বিলাইয়া দিলাম। আমার কথা মতো তাহাকে জিনেই লইয়া গেল, কি ভূতেই লইয়া গেল, কি স্বয়ং শয়তান আসিয়াই লইয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হায়! হায়! কী হইল!"—এইরূপে আমীর নানাপ্রকার খেদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে চক্ষু মুছিয়া, দ্বার খুলিয়া পড়া-প্রতিবাসীকে ডাকিলেন। পাড়া-প্রতিবাসীরা সকলে দৌড়িয়া আসিল। সকলেই পুনরায় তন্ন তন্ন করিয়া আমীরের গৃহে অন্বেষণ করিল। আমীরের বাড়ির পর, পাড়ার এ-ঘরে ও-ঘরে যথাবিধি অন্বেষণ হইল। গলি ঘুঁজি সকল স্থানই দেখা হইল। খুঁজিতে আর কোথাও বাকি রহিল না, কিন্তু আমীরের স্ত্রীকে কেহই খুঁজিয়া পাইলেন না।······

আমীরের হৃদয় বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি ভাবিলেন,—"দূর হউক, এ সংসারে আর থাকিব না, লোকের কাছে আর মুখ দেখাইব না, ফকিরি লইয়া দেশে দেশে বেড়াইব, যদি লায়লারূপী সেই প্রিয়তমা সাধ্বীকে পুনরায় পাই, তবেই দেশে ফিরিয়া আসিব, না হইলে মজনুর মতো এ ছার জীবন একান্তই বিসর্জন দিব।"

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, ফকিরের বেশে আমীর ঘর হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে কিছুই লইলেন না। লইলেন কেবল একটি টিনের কৌটা, একটি বাঁশের নল, আর একটি লোহার টেকো। আমীর কিছু শৌখিন পুরুষ ছিলেন। টিনের কৌটার ঢাকনের উপর কাঁচ দেওয়া ছিল, আরশির মতো তাহাতে মুখ দেখা যাইত। পান খাইয়া আমীর তাহাতে কখন কখন মুখ দেখিতেন, ঠোঁট লাল হইল কি না। বাঁশের নলটি তাঁহার বড়ই সাধের জিনিস ছিল। এক সাহেবের সঙ্গে খানসামা হইয়া একবার তিনি পাহাড়ে গিয়াছিলেন, সেইখানে এই শখের জিনিসটি ক্রয় করেন। ইহার গায়ে হিজিবিজি কালো-কালো অনেক দাগ ছিল। আমীর মনে করিতেন, নলের সেগুলি অলঙ্কার, তাই সেই হিজিবিজিগুলির বড়ই গৌরব করিতেন। আসলে কিন্তু সেগুলি অলঙ্কার নহে, সেগুলি অক্ষর,—চীনভাষার অক্ষর। তাহাতে লেখা ছিল,—"চীনদেশীয় মহাপ্রাচীরের সন্নিকট লিংটিং শহরের মোপিঙ নামক কারিগরের দ্বারা এই নলটি প্রস্তুত হইয়াছে। নল-নির্মাণ কার্য মোপিঙ অদ্বিতীয় কারিগর, জগৎ জুড়িয়া তাঁহার সুখ্যাতি। মূল্য চারি আনা। যাঁহার নলের আবশ্যক হইবে, তিনি তাঁহারই নিকট হইতে যেন ক্রয় করেন, বাজে মেকারদিগের কাছে গিয়া যেন বৃথা অর্থ নষ্ট না করেন। মোপিঙের নল ক্রয় করিয়া যদি কাহরও মনোনীত না হয়, তাহা হইলে নল ফিরাইয়া দিলে, মোপিঙ তৎক্ষণাৎ মূল্য ফিরাইয়া দিবেন।" যাহা হউক, আমীর যে-নলটি কিনিয়াছিলেন, মনের মতো হইয়াছিল তাই রক্ষা। না হইলে, মূল্য ফেরত লইতে হইত। যুধিষ্ঠির যে-পথ দিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, সেই তুষারময় হিমগিরি অতিক্রম করিয়া, তিব্বতের পর্বতময় উপত্যকা পার হইয়া, তাতারের সহস্র ক্রোশ মরুভূমি চলিয়া

চীনের উত্তরসীমায় লিংটিং শহরে আমীরকে যাইতে হইত, সেখানে গেলে তবে মোপিঙের সহিত সাক্ষাৎ হইত, মোপিঙ সিকিটি ফিরাইয়া দিতেন। তাই বলি, ধর্মে রক্ষা করিয়াছে যে, নলটি আমীরের মনোনীত হইয়াছিল। এত মনোনীত হইয়াছিল যে, প্রতিদিন ইহাতে অতি যত্নে আমীর তৈল মাখাইতেন। তেল খাইয়া খাইয়া, পাকিয়া, ইহা ঈষৎ রক্তিমবর্ণ হইয়াছিল। কৌটার ভিতর বড়ই সাধের ধন, আমীরের প্রস্তুত করা আফিম থাকিত, ইতর ভাষায় যাহাকে লোকে চণ্ডু বলে। বাঁশের নলটি দিয়া চণ্ডুর ধূম পান করিতেন। টেকো দ্বারা কৌটা হইতে আফিম তুলিয়া নলের আগায় রাখিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোজা

এই সকল সরঞ্জাম লইয়া আমীর গৃহ হইতে বাহির হইলেন। দিল্লী পার হইলেন, কত নদ-নদী গ্রাম-প্রান্তর অতিক্রম করিলেন। দিনের বেলায় ভিক্ষা করিয়া খান, সন্ধ্যা হইলে, গাছতলায় হউক, কি মাঠে হউক, পড়িয়া থাকেন। খোদা খোদা করিয়া কোনোমতে রাত্রি কাটান। এইরূপে কত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। স্ত্রীকে পুনরায় পাইবার আশা আমীরের মন হইতে ক্রমেই অন্তর্হিত হইতে লাগিল। হয় ফকিরি করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইতে হইবে, না-হয় একটা বুড়ো-হাবড়া নিকা করিয়া পুনরায় ঘরকন্না করিতে হইবে, এই ভাবিয়া শোকে তিনি নিতান্তই আকুল হইয়া পড়িলেন। একদিন তিনি একটি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একজনের বাড়ির সামনে অনেকগুলি লোক বসিয়া আছে দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সে গ্রামটি পশ্চিমের চক্রবেড়বিশেষ। যেখানে লোকেরা বসিয়াছিল, সেটি জানের বাড়ি। গৃহস্বামী একজন প্রসিদ্ধ গণৎকার। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলই প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। সংসারে তাঁহার কাছে কিছুই

গুপ্ত নাই। অদৃষ্টের লিখন তিনি জলের মতো পড়িতে পারেন। সামুদ্রিকে হনুমানের চেয়ে ব্যুৎপত্তি। ললাটে কি হাতে, যে-ভাষায় বিধাতা কেন আঁচড়-পিচড় পাড়িয়া থাকুন না,—ইংরেজীতে হউক, কি ফারসীতে হউক, দেবভাষায় হউক, কি দানবভাষায় হউক,—সকলই তিনি অবাধে পড়িতে পারেন। চুরি-জুয়াচুরি সকলই বলিয়া দিতে পারেন। অবোধ গভর্নমেণ্ট যদিও তাঁহাকে একটিও পয়সা, কি একটিও টাইটেল দেন নাই সত্য, কিন্তু দূর-দূরান্তর হইতে তাঁহার নিকট লোকেরা আসিয়া থাকে। পাঁচটি পয়সা আর পাঁচ ছটাক আটা দিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ গণাইয়া লয়। আমীর বলিলেন,—"আমিও জানের বাড়ি যাই ইন্‌শাল্লাঅলা! কে আমার বিবিকে লইয়া গিয়াছে সে গণিয়া দিবে।" আমীর গিয়া জানের বাড়ির সম্মুখে বসিলেন। অন্যান্য লোকের গণা-গাঁথা হইয়া গেলে, অতি বিনীতভাবে গণৎকারের নিকট তিনি আপনার দুঃখের কথা আগাগোড়া বলিলেন। গণৎকার ক্ষণকালের জন্য গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অবশেষে চারিখানি খাপ্‌রা হাতে লইলেন। মন্ত্র পড়িয়া সেই চারিখানি খাপ্‌রায় ফুঁ দিতে লাগিলেন। যখন মন্ত্র পড়া আর ফুঁ দেওয়া হইয়া গেল, তখন একখানি উত্তরদিকে একখানি দক্ষিণে, একখানি পূর্বদিকে, আর একখানি পশ্চিমে ছুড়িয়া ফেলিলেন। তারপর কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"ফকিরজী! আপনার স্ত্রীর সন্ধান পাইয়াছি। আপনার স্ত্রীকে ভূতে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু করিব কী! আমি ভূতের রোজা নই। ভূতের উপর আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে এতক্ষণ কোন্‌কালে আপনার স্ত্রীকে আনিয়া দিতাম। তবে আপনাকে সন্ধান বলিয়া দিলাম। আপনি এক্ষণে একটি ভাল রোজার অনুসন্ধান করুন। ভাল রোজা পাইলে নিশ্চয় আপনার স্ত্রীকে ভূতের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন।" এইরূপ আশ্বাস পাইয়া আমীরের মন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। তাঁহার স্ত্রী যে অন্য কোনোরূপ বিপদে পড়ে নাই, এ দুঃখের সময় তাহাও শান্তির কারণ হইল।

এখন রোজা চাই। কিন্তু ইংরেজের প্রভাবে আমাদের সকল ব্যবসাই একরূপ লোপ পাইয়াছে। অন্য ব্যবসার কথা দূরে থাকুক, ভূতদিগের ভূতে পাওয়া ব্যবসাটি পর্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছে। এই হতভাগা দেশের লোকগুলা এমনই ইংরেজভাবাপন্ন হইয়াছে যে, কাহাকেও ভূতে পাইলে কি ডাইনে খাইলে, বলে কি না হিষ্টিরিয়া হইয়াছে! এ-কথায় রক্তমাংসের শরীরে রাগ হয়, ভূতদেহে তো রাগ হইবেই। তাই ঘৃণায় ভূতকুল একবাক্য হইয়া বলিল,—"দূর হউক, আর কাহাকেও পাইব না।" ডাইনীকুল একবাক্য হইয়া বলিল,—"দূর হউক, আর কাহাকেও খাইব না।" ভারতের ভূতকুল ও ডাইনীকুল আজ তাই মৌনী ও ম্রিয়মাণ। শ্মশান-মশান আজ তাই নীরব! রাত্রি দুই প্রহরের সময়, জনশূন্য মাঠের মাঝখানে, আকাশপানে পা তুলিয়া জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া, চারিদিকে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সেকালে ডাইনীরা যে চাতর করিত, আজ আর সে চাতর নাই। মরি! মরি! ভারতের সকল গৌরবই একে একে লোপ পাইল! এ অবস্থায় আর রোজার ব্যবসা কী করিয়া চলিবে? তাহাও এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। নানা স্থানে কত শত গঙ্গা ময়রার ঘরে আজ অন্ন নাই। পায়ের উপর পা দিয়া, সোনা দানা পরিয়া, যাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইত, আজ তাহারা ভিখারী।

আমীর দেখিলেন, ভাল রোজা পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। আমীর কিন্তু হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। মনে করিলেন,—"যদি আমাকে পৃথিবী উলট-পালট করিয়া ফেলিতেও হয়, আমি তাহাও করিব, যেখানে পাই সেইখান থেকে ভাল রোজা নিশ্চয় বাহির করিব।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় দেশপর্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে যান, সেইখানেই সকলকে জিজ্ঞাসা করেন,—"হাঁগা! তোমাদের এখানে ভূতের ভাল রোজা আছে?" ছোট-খাট অনেক রোজার সঙ্গে দেখাও হইল। অনেক মুসলমান আসিল, যাঁহারা তাবিজ লিখিয়া ভূত-প্রেত-দানা-দৈত্যকে দূর করেন, তাঁহাদেরও সহিত সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু মনের মতো কাহাকেও পাইলেন না; বুক ফুলাইয়া কেহই বলিতে পারিল না যে—"ভূত মারিয়া

আমি তোমার স্ত্রীকে আনিয়া দিব।” অবশেষে অনেক পথ, অনেক দূর যাইয়া আমীর একটি গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন। সেই গ্রামে প্রথমেই একটি বৃদ্ধার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। আমীর যথারীতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হাঁগা! তোমাদের এখানে ভাল রোজা আছে?” বৃদ্ধা উত্তর করিল,—“হাঁ বাছা আছে। আমাদের গ্রামের মহাজনের কন্যাকে সম্প্রতি একটি দুর্দান্ত ভূতে পাইয়াছিল। মহাজনের টাকার আর অবধি নাই। সে যে কত ডাক্তার, কত বৈদ্য, কত হেকিম, কত রোজা আনিয়াছিল, তাহার আর কী বলিব, দু পা দিয়া জড়ো করিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই, কেহই সে ভূত ছাড়াইতে পারে নাই। অবশেষে এই গ্রামের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ একটি মন্ত্র পড়িয়াই তাহাকে আরোগ্য করেন। ব্রাহ্মণ পূর্বে খাইতে পাইত না, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর উদরে অন্ন ছিল না, অঙ্গে বস্ত্র ছিল না, এখন অন্ন-বস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, দ্বারে হাতী ঘোড়া, উট বাঁধা।”

তৃতীয় অধ্যায়

তাঁতি

বলা বাহুল্য, আমীর এই কথা শুনিয়া অবিলম্বে ব্রাহ্মণের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া, তাঁহাকে আদ্যোপান্ত আপনার দুঃখের কাহিনী বলিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“দেখ, ভূতে পাইলে আমি ছাড়াইতে পারি। ভূতে যদি কাহাকেও একেবারে উড়াইয়া লইয়া যায়, তাহার আমি কী করিতে পারি? পাহাড়ে লইয়া গিয়াছে, কি সমুদ্রের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা আমি কী করিয়া জানিব? ফকিরসাহেব! তোমার স্ত্রীকে আনিয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।” এই কথা শুনিয়া আমীর মাথা হেঁট্ করিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন, চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। দুর্বাসা মুনির জাতি! যেমন কঠিন, তেমনি কোমল!

সেই জলেই ব্রাহ্মণের মন ভিজিয়া একেবারে গলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"শুন ফকিরজী! তোমাকে মনের কথা বলি,—প্রকাশ করিয়ো না। তাহা হইলে রোজা বলিয়া আমার যা কিছু মান-সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি হইয়াছে, সকলই যাইবে। তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি প্রকৃত রোজা নই, ভূত ছাড়াইবার একটি মন্ত্রও জানি না। এমন কি, গায়ত্রী পর্যন্ত জানি না, আর লেখাপড়া বিষয়ে, ক খ পর্যন্ত শিখি নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি একজন পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। চৌকায় বসিয়া খাই। আজকালের ইংরেজী-পড়া বাবু ভায়াদিগের মতো নই।" আমীর বলিলেন,—"সে কি মহাশয়! তবে আপনি মহাজনকন্যার ভূত ছাড়াইলেন কী করিয়া?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—"সে-কথা [illegible] আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিতেছি। প্রকাশ করিয়ো না, তাহা হইলে আমার বড়ই মন্দ হইবে।" আমীর বলিলেন, "আল্লার কসম, আমার মুখ দিয়া এ কথা কখনই বাহির হইবে না।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"এই গ্রামে একটি তাঁতি বাস করে। তাঁতি তাঁত বুনিয়া খায়, কোনো ল্যাঠাই ছিল না। একদিন কি মতি হইল, সে তাঁত বুনিতে বুনিতে একটু গুন্ গুন্ স্বরে গান করিল। নিজের কানে সুরটি স্বরটি বড়ই সুমধুর বলিয়া লাগিল। পুনর্বার আস্তে আস্তে গাহিয়া দেখিল, বড়ই মিষ্ট বটে! তাঁতি মনে মনে ভাবিল,—'আমি একজন প্রকৃত গাইয়ে। এ গুণটি এতদিন প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বৃথা নষ্ট হইতেছিল। জগতের দশাই এই, তা না হইলে হীরা মণি মুক্তা উপরে চক্‌মক্ না করিয়া, মাটি কি জলের ভিতর কেন বৃথা পড়িয়া থাকিবে? যাহা হউক, এখন হইতে গান গাহিয়া আমি জগৎ মুগ্ধ করিব, মধুর তানে অবিরত জগতের কর্ণকুহরে সুধা ঢালিয়া দিব। আপাতত প্রতিবাসীদিগকে গুণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই।' এই বলিয়া তাঁতি ক্রমে গলা ছাড়িয়া গান আরম্ভ করিল। একদিন যায়, দুই দিন যায়, গ্রামবাসীরা শশব্যস্ত। দুই চারি দিন পরে গ্রামের লোক অস্থির হইয়া পড়িল। প্রাণ লইয়া সকলের টানাটানি। সুতরাং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে গিয়া তাঁতির দ্বারে উপস্থিত। তাঁতিকে ডাকিয়া বলিল,—'বাপু হে! পুরুষপুরুষানু-

ক্রমে বহুদিন ধরিয়া আমরা এই গ্রামে বাস করিতেছি। তোমার গানের প্রভাবে আর আমরা এখানে তিষ্ঠিতে পারি না। বলতো ঘর-দ্বার ছাড়িয়া উঠিয়া যাই, আর না হয় চুপ কর, গানে ক্ষান্ত দাও।' তাঁতি বলিল,—'না মহাশয়! সে কি কথা? গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবেন কেন? সুরবোধ নাই বলিয়া যদি আমার গান আপনাদিগের কানে ভাল না লাগে, তাহা হইলে আপনাদিগকে আর বিরক্ত করিতে চাহি না। আজ হইতে মাঠে বসিয়া আমি গান করিব। যাহার বোধাবোধ আছে, তিনি মাঠে গিয়া আমার গান শুনিবেন, আর পারিতোষিকস্বরূপ একপণ করিয়া আমি তাঁহাকে কড়ি দিব।' এইরূপ আশ্বস্ত হইয়া গ্রামের লোকে যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। তাঁতি গিয়া মাঠের মাঝখানে এক অশ্বত্থগাছের নিচে তাঁত খাটাইল। সেখানে বসিয়া মনের সুখে গান করিতে লাগিল। তবে খেদের বিষয় এই, শুনিতে কেহ যায় না, জনপ্রাণী সেদিক মাড়ায় না। কাক-পক্ষী সেদিকে ভুলিয়াও উড়িয়া যায় না।"

ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—"ফকিরজী! আমি বড়ই দরিদ্র ছিলাম। এ গ্রামের ভিতর আমার মতো দীনদুঃখী আর কেহ ছিল না। গৃহিণী ও আমি যে কত উপবাস করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। নিজের যাহা হউক, ব্রাহ্মণীর শীর্ণ দেহ, মলিন মুখ দেখিয়া সততই আমার প্রাণ কাঁদিত। কী করিব, কোনো উপায় ছিল না, মনের আগুন মনেই নিভাইতাম, চক্ষের জল চক্ষেই শুকাইতাম। ব্রাহ্মণী একদিন আমাকে বলিলেন—'আজ ঘরে আটা নাই। তাঁতি বলিয়াছে, তাহার গান শুনিলে একপণ কড়ি দিবে। যাও না, একটুখানি কেন শুনিয়া এস না? একপণ কড়ি পাইলে ঘরে অন্ন হইবে, দুই জনে খাইয়া বাঁচিব।' আমি বলিলাম—'দেখ ব্রাহ্মণী! ও কথাটি আমাকে বলিয়ো না। শূলে যাইতে বল, তা যাইতে পারি, আগুনে পুড়িয়া মরিতে বলিলেও মরিতে পারি, কিন্তু তাঁতির গান আমাকে শুনিতে বলিয়ো না, তিলেকের নিমিত্তও সে দগ্ধানি আমি সহ্য করিতে পারিব না।' এই কথা লইয়া ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার ক্রমে কিঞ্চিৎ বচসা হইল। ব্রাহ্মণী

আমাকে ঘর হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন,—'যাও একটুখানি তাঁতির গান শুনিয়া একপণ কড়ি লইয়া আইস।' পথে বাহির হইয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, কী করিব! তাঁতির গান কী করিয়া শুনি? অথচ কড়ি না লইয়া আসিলে ব্রাহ্মণী আর রক্ষা রাখিবেন না। তাঁতির গান শুনার চেয়ে মরা ভাল। এ ছার জীবনে আর কাজ নাই। গলায় দড়ি দিয়াই মরি। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া একজনের বাড়ি হইতে একগাছি দড়ি চাহিয়া লইলাম। এ মাঠে তাঁতি গান করিতেছে, অন্য দিকে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে, আর একটি অশ্বত্থগাছে দড়িটি খাটাইলাম, ফাঁসটি ঠিক করিয়া লইলাম। গলায় দিই আর কি, এমন সময় সেই গাছের ভিতর হইতে একটি ভূত বাহির হইল। ভূত আমাকে বলিল,—'ওরে বামুন, তুই করিতেছিস্ কি?' আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাহার নিকট বর্ণনা করিলাম। ভূত বলিল,—'আর ভাই! ও কথা বলিস্‌নে। যে গাছের তলায় এখন তাঁতি গান করিতেছে, যুগ-যুগান্তর হইতে ঐ গাছে আমি বাস করিতেছিলাম। গাছটি আমার বড়ই প্রিয় ছিল। কিন্তু হইলে হইবে কি, যেদিন হইতে তাঁতি উহার তলায় গান আরম্ভ করিল, সেই দিন হইতেই আমাকে ও-গাছ ও-মাঠ ছাড়িয়া পলাইতে হইল। দেখিতেছি, দুই জনেই আমরা বিপদে বিপন্ন। তা তোর আর ভাবনা নাই, তুই বাড়ি ফিরিয়া যা। তোদের গ্রামের মহাজনের কন্যাকে আমি গিয়া পাইব। কিছুতেই ছাড়িব না, কেবল তুই গিয়া যখন আমার কানে কানে বলিবি যে, আমি সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়াছি, তখনই আমি ছাড়িয়া দিব। মহাজনের অনেক টাকা আছে, আর সেই একমাত্র কন্যা। অনেক ধন-দৌলত দিয়া তোকে বিদায় করিবে, তোর দুঃখ ঘুচিবে।' ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"সেখজী! শুনিলে তো। আমি রোজা নই, আমি মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না। দৈবক্রমে আমার একটি ভূতের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা হইতেই আমার এই যা কিছু বল। মহাজনের কন্যার ভূত ছাড়িলে চারিদিকে আমার নাম বাহির হইল যে, আমার মত রোজা আর পৃথিবীতে নাই। ভূতে পাইলে সকলে আমাকে

লইয়া যায়। আমাকে আর কিছু করিতে হয় না, কেবল আমি রোগীর কানে কানে গিয়া বলি,—"শীঘ্র ছাড়িয়া যাইবে তো যাও, না হইলে এখানে তাঁতির গান দিব। তাঁতির নামে সকল ভূতই জড়সড়, পলাইতে পথ পায় না।"

চতুর্থ অধ্যায়

উদ্যোগ

আমীর বলিলেন,—"মহাশয়! তাহাই যদি সত্য, তবে চলুন না কেন? আপনার সেই ভূতটিকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া, আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়া দেন? কারণ, ভূতে ভূতে অবশ্যই আলাপ পরিচয় আছে, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে, শাদি-বিয়াতে অবশ্যই সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবে। আমার স্ত্রীকে যে-ভূতে লইয়া গিয়াছে, তাহাকে যদি তিনি দুইটি কথা বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমার অনেক উপকার হইতে পারে। না হয়, স্ত্রীকে কী করিয়া পাই, তাহার একটা-না-একটা উপায়ও তিনি বলিয়া দিতে পারেন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"এ পরামর্শ মন্দ নয়, তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি বড়ই কাতর হইয়াছি, আচ্ছা চল যাই, দেখি কি হয়।" ব্রাহ্মণ দুর্গা বলিয়া, আমীর বিস্মিল্লা বলিয়া, যাত্রা করিলেন। ক্রমে তাঁহারা যে-মাঠে ভূত থাকে, সেই মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে-গাছে ভূত থাকে সেই গাছতলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া গাছের দিকে চাহিয়া ঊর্ধ্বমুখে দুই জনে স্তুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"হে ভূত! আশ্রিত সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ আজ পুনরায় তোমার নিকট আসিয়াছে। তোমার কৃপায় তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। তোমার কৃপায় তাহার দরিদ্রতা মোচন হইয়াছে। পৃথিবীতে যত ভূত আছে, সকল ভূতের তুমি শ্রেষ্ঠ। ভূতের তুমি রাজা। কৃপা করিয়া দেখা দাও, আর একবার আবির্ভূত হও।" মুসলমান বলিল, "ভূতসাহেব! হুজুরের

নাম শুনিয়া কদম-বোসী করিতে এখানে আসিয়াছি। আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করুন। হুজুরের এই গাছতলায় কাঁচাপাকা সিন্নি চড়াইব।' এই প্রকারে নানারূপ স্তব করিতে, করিতে গাছটি দুলিতে লাগিল, গাছটির উপর যেন এক প্রবল ঝড় বহিতে লাগিল, ডালপালা মড় মড় করিতে লাগিল। তারপর গাছের ডগায়, একস্থানে সহসা অন্ধকারের আবির্ভাব হইল। বেলা দুইপ্রহরে, চারিদিকে সূর্যের কিরণ, আর সকল স্থানেই আলো, কেবল সেই স্থানটুকুতেই অন্ধকার। ক্রমে সেই অন্ধকার রাশি জমিয়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। অবশেষে তাহা এক ভীষণ প্রকাণ্ড নরমূর্তিতে পরিণত হইল। নরমূর্তি ধরিয়া ভূত গাছ হইতে নামিয়া আসিল, বৃক্ষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

এখানে এখন একটি নূতন কথা উঠিল। বিজ্ঞানবেত্তারা—বিশেষত ভূত-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা—এ বিষয়টি অনুধাবনা করিয়া দেখিবেন। এখানে স্থির হইল এই, যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, অন্ধকার জমিয়া তেমনি ভূত হয়। জল জমাইয়া বরফ করিবার কল আছে, অন্ধকার জমাইয়া ভূত করিবার কল কি সাহেবেরা করিতে পারেন না? অন্ধকারের অভাব নাই। নিশাকালে বাহিরে তো অল্প স্বল্প অন্ধকার থাকেই। তারপর মানুষের মনের ভিতর যে কত অন্ধকার আছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। কোদাল দিয়া কাটিয়া কাটিয়া ঝুড়ি পুরিয়া এই অন্ধকার কলে ফেলিলেই প্রচুর পরিমাণে ভূত প্রস্তুত হইতে পারিবে। তাহা হইলে ভূত খুব শস্তা হয়। এক পয়সা, দুই পয়সা, বড় জোর চারি পয়সা করিয়া ভূতের

সের হয়। শস্তা হইলে গরীব-দুঃখী সকলেই যার যেমন ক্ষমতা ভূত কিনিতে পারে।

গাছের পাশে দাঁড়াইয়া, কিছু রাগতভাবে ভূত বলিল,—"বামুন! আজ আবার কেন আসিয়াছিস? তোর মতো বিট্‌লে বামুন আমার অবধ্য নয়। ইচ্ছা হইলে এখনি তোর ঘাড় মুচড়াইয়া দিতে পারি। আমার অবধ্য, সেই ইংরেজী-পড়া বাবুলোক। তাঁহাদের ভয়ও করি, ভক্তিও করি! ভয় করি, পাছে মহাপ্রভুরা গায়ে টলিয়া পড়েন, কি মন করিয়া দেন। ভক্তি করি, কেননা, এটা সেটা খাইয়া তাঁহাদের নের কোঁচকা ঘুচিয়া যায়, মন সরল হইয়া যায়, এই মর্ত্যলোকেই াহারা সদাশিবত্ব প্রাপ্ত হন, অন্য লোকের মতো তাঁহাদের মন জিলেপির াকবিশিষ্ট নয়।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "প্রভু! আমি নিজের জন্য আপনার কট ভিক্ষা করিতে আসি নাই। আপনার প্রসাদে আমার আর ছুরই অভাব নাই। এই লোকটি নিদারুণ সন্তাপিত হইয়াছে, ইহার ন্যই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি।"

এই কথায় ভূতের রাগ কিছু পড়িয়া আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, —"সঙ্গে তোমার ও লোকটি কে? ব্রাহ্মণ তখন আমীরের সকল কথাই কে শুনাইলেন। শুনাইয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আপনাকে ইহার কটা উপায় করিতে হইবে, না করিলে এ লোকটি প্রাণে মরিবে। পনি দয়ার্দ্রচিত্ত, আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, ইহারও প্রাণ রক্ষা ন।" ভূত বলিল,—"ইহার স্ত্রীকে নিশ্চয় লুল্লু লইয়া গিয়াছে। সবে নূতন ভূতগিরি পাইয়াছে, ভূতগিরিতে তাহার নব অনুরাগ, সে ই দুরন্ত।" ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নূতন ভূতগিরি পাইয়াছে? শয়! সে কী প্রকার কথা?" ভূত হাসিয়া বলিল,—"এ কথা তোমরা ছুই জান না। লোকে বলে, অমুক মানুষ মরিয়া ভূত হইয়াছে। সেটি সত্য নয়। মানুষ নিজে মরিয়া ভূত হয় না। মানুষ মরিলে মরা কেহ গিয়া তাহার ভূতগিরি করি। লক্ষ লক্ষ ভূত পৃথিবীতে স্থিতি করিতেছে। কেহ-বা ভূতগিরি করিবার কর্ম পাইয়াছে, কেহ-বা ার বসিয়া আছে। আমাদের যিনি কর্তা, তিনিই ভূতদিগকে

এই কার্যে নিযুক্ত করেন। ভূতকে তিনি বলেন,—'যাও অমুক মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাক, সে মরিলে তাহার ভূত হইয়ো, তাহার ভূতগিরি তোমাকে দিলাম।' সেইদিন হইতে ভূতটি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মানুষের মাথাটি ধরিলে তাহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না; কেননা, মরিলেই তাহার ভূতগিরি করিতে পাইবে। এরূপ যে ঘটনা হয়, সে কেবল তোমাদের নিজ দোষে। দেশীয় সংবাদপত্র সকল তোমাদিগকে কত সুশিক্ষা দিয়া থাকে, যদি কায়মনচিত্তে পালন করিতে, তাহা হইলে তোমাদের এ দুর্দশা হইত না। এই দেখ, দেশ একেবারে নির্ধন হইয়া যাইতেছে, বিলাতী কাপড়ের দ্বারা বিদেশীয়েরা ধন লুটিতেছে। ভাল, কাপড় না পরিলেই তো হয়? যদি কাপড় না পর, তাহা হইলে তো আর তোমাদিগের ধন কেহ লুটিতে পারে না। রেল করিয়া বিদেশীয়েরা ধন লইয়া যাইতেছে। ভাল, রেলে না চড়িলেই তো হয়, পায়ে হাঁটিয়া কেন কাশী-বৃন্দাবন যাও না? তা যদি কর, তাহা হইলে বিদেশীয়েরা তোমাদিগের দেশে রেল করিতে কখনই আসিবে না, দেশের ধন দেশেই রহিয়া যাইবে। সেইরূপ আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করি। আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করিবার উমেদারিতে থাকি। ভাল, তোমরা যদি মরা ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে তো কেহ তোমাদের ভূতগিরি করিতে আসে না? তাই বলি, না মরিলেই তো সকল কথা ফুরাইয়া যায়। নিজে তোমরা মরিবে, আর যত দোষ আমাদের? অপরাধের মধ্যে এই যে, মরিলে আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করি।

"যাহা হউক, লুল্লু বহুদিন হইল, ভূতগিরি করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। তাহার কপালে ভাল ভূতগিরি কোথাও জুটে নাই! অবশেষে কর্তা তাহাকে দুখিরাম চণ্ডালের ভূতগিরির উমেদারিতে নিযুক্ত করেন। দুখিরাম যদিও বৃদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি তাহার শক্তি-সামর্থ্য বিলক্ষণ ছিল। কিছুতেই মরিতে চায় না। বৃদ্ধের কুব্যবহারে লুল্লু বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। আজ অল্পদিন হইল, দুখিরামের মৃত্যু হইয়াছে, লুল্লু তাহার ভূতগিরি পাইয়াছে। লুল্লু একটি সভ্য ভব্য নব্য ভূত। সে যে এতদিন পরে এখন মনের সাধে ভূতগিরি করিতেছে, তোমাদের মুখে

এ কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম।” ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“সে কি কথা মহাশয়? দুরাচার লুল্লুর কার্যে আপনি সন্তুষ্ট! আমরা যে, আপনার নিকট তাহার নামে অভিযোগ করিতে আসিয়াছি। ইহার স্ত্রীকে আপনি উদ্ধার করিয়া দিবেন, সেই প্রার্থনায় যে, আপনার কাছে আসিয়াছি!” এইরূপ অনেক বাদানুবাদের পর ভূত বলিল,—“দেখ, আমি এক্ষণে বৈরাগ্য-ধর্ম অবলম্বন করিয়াছি, সংসারের বাদবিসংবাদ ভালমন্দ কিছুতেই থাকি না। আমি জানি না লুল্লু এখন ইহার স্ত্রীকে কোথায় রাখিয়াছে। অন্বেষণ করি, এরূপ অবকাশ আমার নাই। তোমরা এক কাজ কর, এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে মাঠের মাঝখানে একটি পুরাতন কূপ আছে, সে-কূপে এখন জল নাই। তাহার ভিতর ঘ্যাঘোঁ বলিয়া একটি ভূত বাস করে। ঘ্যাঁঘোঁ সকল সংবাদ রাখিয়া থাকে। ভূতদিগের মধ্যে সে একরূপ গেজেট। তোমরা তাহার নিকট যাও, সে সকল সন্ধান বলিয়া দিবে। তবে কথা এই, আজ কিছুদিন হইল ঘ্যাঁঘোঁ মনোদুঃখে জ্বর-জ্বর হইয়াছে। মনের খেদে বিরলে সে কূপের ভিতর বসিয়া আছে। কথা কহে না, ডাকিলে উত্তর দেয় না, তাহার দেখা পাওয়া ভার। চেষ্টা করিয়া দেখ।”

পঞ্চম অধ্যায়

ঘ্যাঁঘোঁ

ব্রাহ্মণ এবং আমীর, আর করেন কি? দুই জনে ঘ্যাঁঘোঁর অনুসন্ধানে চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কূপের ধারে গিয়া ঘ্যাঘোঁকে ডাকিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ডাকিলেন,—“ঘ্যাঘোঁ মহারাজ! ঘ্যাঘোঁবাবু! ঘরে আছেন?” মুসলমান ডাকিলেন—“ঘ্যাঘোঁ-সাহেব! বাড়ি আছেন?”—ডাকিয়া দুই জনেরই গলা ভাঙ্গিয়া গেল, তবুও ঘ্যাঘোঁ কূপ হইতে বাহির হইল না, উত্তর পর্যন্ত দিল না। দুইজনে তখন ভাবিলেন, এ তো বড়ই বিপদ!

উহার আবার কী উপায় করা যায়। ব্রাহ্মণ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—"চল, আমরা তাঁতির কাছে যাই।" বিরস-বদনে দুইজনে ফিরিলেন। পুনরায় গ্রামে আসিয়া দুই জনে ফিরিলেন। পুনরায় গ্রামে আসিয়া দুইজনে তাঁতির নিকট গেলেন। ব্রাহ্মণ তাঁতিকে বলিলেন,—"ভায়া! তোমাকে একটি উপকার করিতে হইবে। ঘ্যাঘোঁ নামে একটি ভূত আছে। সে আমার পরম বন্ধু। তাহার কানের ভিতর অতিশয় পোকা হইয়াছে, সে-পোকা কিছুতেই বাহির হইতেছে না। দারুণ ক্লেশে ঘ্যাঘোঁ এখন একটি কূপের ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, তাহারই ভিতর অবস্থিতি করিতেছে। ডাকিলে উত্তর দেয় না, বাহিরেও আসে না। মনুষ্যের কানে পোকা হইলে অনেক কালোয়াতের গানে বাহির হইতে পারে, কিন্তু ভূতের কানের পোকা তোমার গান ভিন্ন কিছুতেই বাহির হইবে না। অতএব যদি একবার সেই কূপের ধারে বসিয়া একটু গান কর, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হইব।" এ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় কেহ তাঁতির গান শুনে নাই। আজ তাহাকে গান গাওয়াইবার জন্য লোকে উৎসুক। এ অহঙ্কার রাখিবার কি আর স্থান আছে? আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাঁতি বলিল,—"আমি এইক্ষণেই যাইতেছি। কাপড় পরিয়া আসি।" তাঁতি কাপড় পরিয়া তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইল। তিনজনে পুনরায় সেই কূপ অভিমুখে চলিলেন। কূপের ধারে পৌঁছিয়া, তাঁতি আসন করিয়া গান আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ ও আমীর কানে আঙ্গুল দিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন। যখন তাঁতির গান কূপের ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল, তখন ঘ্যাঘোঁ ভাবিল,—"মনের খেদে জ্বর-জ্বর হইয়া বিরলে কূপের ভিতর বসিয়া আছি, এখানে আজ আবার এ কি ভীষণ ব্যাপার! সেকালে কবির চিৎেন শুনিয়াও প্রাণ ধরিতে পারিয়াছিলাম তাহাতেও প্রাণ বাহির হয় নাই; আজ যে দেখিতেছি, মহাপ্রাণী ধড়ফড় করিয়া বাহির হয়।' ঘ্যাঘোঁ তবুও কিন্তু সহজে কূপ হইতে বাহির হয় নাই। যখন দেখিল, তাঁতির গানে নিতান্তই প্রাণ বাহির হইয়া যায়, তখন করে কি! কাজেই বাহির হইতে হইল।

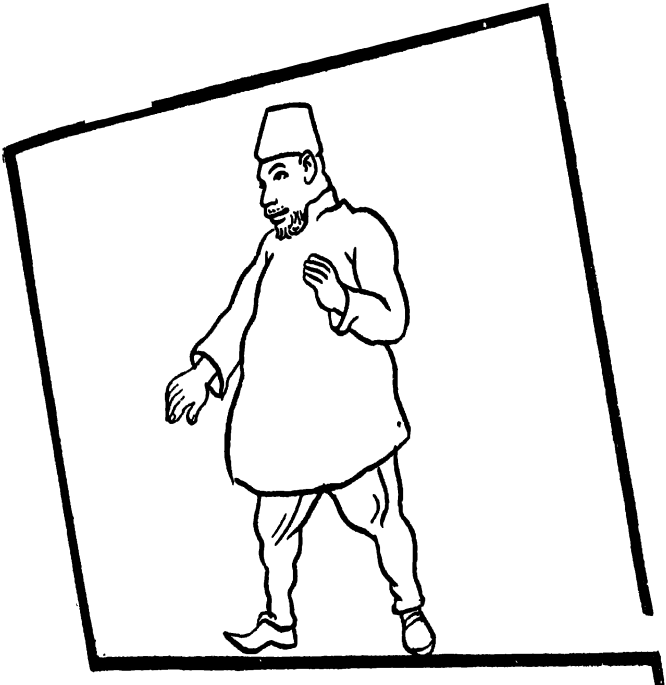

(১) আমির-ঘর হইতে বাহির হইলেন

(২) লুলু—সাহেব ভূত।

(১) ঘ্যাঁঘেঁ্যা চক্ষু ঠারিয়া হাসিতেছে।

(২) ভূত ভয় পাইয়া আমিরের নলের ভিতর প্রবেশ করিতেছে

হামাগুড়ি দিয়া কূপ হইতে বাহির হইল। ঘ্যাঘোঁ বেঁটে-খাটো, হাড়-ওঠা বুড়ো-হুড়ো ভূত। মনের খেদে দেহ তার এতই জ্বর-জ্বর হইয়াছিল যে, তাহার চক্ষু, মুখ, নাসিকা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল।

কূপ হইতে বাহির হইয়া ভূত একদিকে উর্ধ্বশ্বাসে পলাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ ও আমীর আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন,—"ঘ্যাঘোঁ, তুমি পলাইয়ো না, তোমার ভয় নাই, ঐ দেখ তাঁতিভায়া চুপ করিয়াছে। আর পলাইবে বা কোথা? যেখানে যাইবে, সেইখানে গিয়া তাঁতিভায়া গান জুড়িয়া দিবেন। তার চেয়ে, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যসত্য উত্তর দাও, আমরা তাঁতিভায়াকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাই। ঘ্যাঘোঁ ব্রাহ্মণের মুখপানে চাহিল, আমীরের মুখপানে চাহিল, তাঁতির মুখপানে চাহিল। দেখিল, গলা পরিষ্কার করিয়া তাঁতি আর-একটি গান আরম্ভ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তাহা দেখিয়াই ঘ্যাঘোঁর আত্মা-পুরুষ শুকাইয়া গেল। সে বলিল,—"আচ্ছা কী বলিবে বল, কী জিজ্ঞাসা করিবে? ব্রাহ্মণ বলিল,—"লুল্লু নামক তোমাদের যে ভূত আছে, সে এই আমীরের স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছে। কোথায় রাখিয়াছে, তুমি বলিতে পার? আর, কী করিয়াই-বা তাহার উদ্ধার হয়?" ঘ্যাঘোঁ বলিল,— "অনেক দিন ধরিয়া ঘোর দুঃখে জ্বর-জ্বর হইয়া আমি এই কূপের ভিতর বসিয়া আছি। সংসারের সংবাদ বড় কিছু রাখি নাই। তবে তাঁতির গান যদি আর না শুনাও, তাহা হইলে অনুসন্ধান করিয়া বলিতে পারি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"অনুসন্ধান করিতে যাই বলিয়া তুমি পলাইয়া যাইবে, শেষে আর তোমার দেখা পাইব না। আমরা তেমন বোকা নই যে, তোমাকে ছাড়িয়া দিব।" ঘ্যাঘোঁ উত্তর করিল,—"পলাইয়া আর কোথায় যাইব? যেখানে যাইব, সেইখানে গিয়া তোমরা তাঁতির গান জুড়িয়ে দিবে। তাছাড়া আমীরের স্ত্রী কোথায়, অনুসন্ধান না করিয়াই-বা আমি কী করিয়া বলি?" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"সত্য কর যে, শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে?" ঘ্যাঘোঁ বলিল—"আমি সত্য বলিতেছি,

শীঘ্র ফিরিয়া আসিব।” তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“আচ্ছা, তবে যাও, শীঘ্র আসিয়ো, আমরা এখানে বসিয়া রহিলাম।” ঘ্যাঘোঁ বলিলেন—“রও, আমি আমার বড় নাগরা জুতাজোড়াটি পায়ে দিয়া আসি। সে জুতাটি পায়ে দিলে আমি বাতাসের উপর উত্তম চলিতে পারি। মুহূর্তের মধ্যে সমুদয় ভারতভূমি ভ্রমণ করিতে পারি।” এই বলিয়া ঘ্যাঘোঁ পুনরায় কূপের ভিতর গেল, নাগরা জুতা পায়ে দিয়া বাহিরে আসিল, বাতাসের উপর উঠিয়া হন্ হন্ করিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। শীঘ্রই অদৃশ্য হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ, আমীর ও তাঁতি সেইখানে বসিয়া রহিলেন। ঘ্যাঘোঁ ফিরিয়া আসে কি না, এই কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। সকলেই একদৃষ্টে আকাশপানে চাহিয়া রহিলেন। ‘কখন্ আসে কখন্ আসে’—এই কথা সকলেই মনে মনে করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমীর বলিয়া উঠিলেন—“ঐ আসিতেছে, ঐ যেন উত্তর দিকে কালো দাগটির মতো কি দেখা যাইতেছে।” নিকটবর্তী হইলে সকলেই বলিয়া উটিলেন—“ঘ্যাঘোঁ বটে, নাগরা জুতা পরিয়া ঘ্যাঘোঁ আসিতেছে।” ঘ্যাঘোঁ নিকটে আসিলে সকলেই তাহার মহা সমাদর করিলেন। সকলেই বলিলেন—“ঘ্যাঘোঁ। তুমি সত্যবাদী বটে! মনোদুঃখে জ্বর-জ্বর হইয়াও তুমি আপনার সত্য রক্ষা করিয়াছ। এখন বল, সংবাদ মঙ্গল তো?” ঘ্যাঘোঁ বলিল,—“সু-সমাচার বটে, আমীরের স্ত্রীর আমি সন্ধান পাইয়াছি।” সকলে বলিলেন,—“তবে শীঘ্র বল, আমীরের স্ত্রী এক্ষণে কোথায়? সে ভাল আছে তো?”

ঘ্যাঘোঁ বলিল,—“হিমালয়-প্রদেশে ভীমতাল নামক একটি হ্রদ আছে। হ্রদের ভিতর পাহাড়ের গায় লুল্লু একটি ঘর খুদিয়াছে। জলে ডুব দিয়া তবে সে-ঘরের ভিতর যাইতে পারা যায়, অন্য পথ নাই। তাহার ভিতর লুল্লু আমীরের স্ত্রীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেই ‘সে’-বিহনে অশোক বনে সীতা যেরূপ কাঁদিয়াছিলেন, সেই ঘরের ভিতর একাকিনী বসিয়া আমীরের রমণীও সেইরূপ কাঁদিতেছেন। কেন যে কাঁদিতেছেন, তাহা বলিতে পারি না। লুল্লু আমাদের একটি সভ্য ভব্য

ব্য ভূত। সে লইয়া গিয়াছে, তাহাতে আবার কান্না কি? লুল্লু
াহাকে এক বৎসরকাল সময় দিয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে যদি শাস্ত
ইয়া তাহাকে নিকা না করে, তাহা হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলিবে।
থা এই, মানুষের সাধ্য নাই যে হ্রদের ভিতর প্রবেশ করে, প্রবেশ
রিয়া লুল্লুর ঘরের ভিতরে যায়। আমরা ভূত হইয়া ভূতের বিপক্ষতা
রিতে পারি না; তাহা হইলে ভূত-সমাজে আর মুখ দেখাইবার যো
কিবে না। তবে এই মাত্র বলিয়া দিতে পারি যে, যদি তোমরা
কটি হৃষ্ট-পুষ্ট ভূত ধরিয়া তাহার তেল বাহির করিতে-পার, আর যদি
ই তেল মাখিয়া জলে প্রবেশ কর, তাহা হইলে লুল্লুর ঘরে পৌঁছিতে
ারিবে। তারপর কৌশল করিয়া আমীরের স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়ো।
াই বলিয়া যেন আমাকে ধরিয়া তেল বাহির করিয়ো না। মনের খেদে
র-জ্বর আছিই, তার উপর আবার তাঁতির গান শুনিয়া আমার শরীর
ার শরীর নাই, একবিন্দুও তেল বাহির হইবে না। তবে এক কাজ
র, এই মাঠের প্রান্তভাগে একটি গাছ আছে। সেই গাছে গোঁগোঁ
মে একটি গলায়-দড়ি ভূত বাস করে। নিকটে গ্রামের লোককে
লায় দড়ি দিয়া মরিতে সে প্রবৃত্তি দিয়া থাকে। যে কেহ তাহার
লোভনে পতিত হয়, সে এই গাছে আসিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরে।
্র শীঘ্র মৃত্যু হইবে বলিয়া, এই ভূত তখন তাহাদের পা ধরিয়া ঝুলিয়া
ড়ে। তোমরা যদি এই ভূতটিকে ধরিয়া তেল বাহির কর, তাহা
লে আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করি। কারণ, সে দুরাচার আমার
ম শত্রু। আমার যেখানে বিবাহের সম্বন্ধ হয়, সে গিয়া ভাংচি দিয়া
সে। প্রেতিনী শঙ্খচূর্ণী, চূড়েল প্রভৃতি নানাপ্রকার ভূতিনীদিগের
হত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। দুই এক স্থানে কন্যাও
খিতে গিয়াছিলাম, কন্যা দেখিয়া মনও মোহিত হইয়াছিল, কিন্তু এই
াচার গিয়া কন্যার পিতামাতার কাছে আমার নানারূপ কুৎসা করে।
জন্য—দুঃখের কথা বলিব কি! ভূতগিরি করিতে করিতে বুড়া হইয়া
লাম, আজ পর্যন্ত আমার বিবাহ হয় নাই। সংসারে আমি আধখানা
য়া আছি, পুরা ঘ্যাঘোঁ হইতে পারিলাম না। আর কত লোক

দশটা কুড়িটা বিবাহ করিয়া ষোল্ আনার চেয়ে বেশি হইয়া পড়ে। যে
যাহা হউক, মনুষ্যের দ্বারা ভূত ধরা কিছু সহজ কথা নয়। সেকালে
মতো এখন আর রোজা নাই যে, ভূত ধরিয়া পাল্কির বেহারা করিবে
কি গাড়িতে জুড়িয়া দিবে। কৌশল করিয়া ধরিয়ো। বিবাহে
কথা মনে করিয়া আমার প্রাণ এখন বড়ই হু হু করিতেছে। একা
পরম রূপবতী ভূতিনীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হইয়াছিল
তাহার রূপের কথা আর বলিব কি? তাহার নাকটি দেখিয়াই আমা
মন একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিল। ওহো নাকেশ্বরি! তোমাকে না দেখিয়
প্রাণ যে আর ধরিতে পারি না! একবার তোমার ছবিখানি দেখিয়
প্রাণ শান্ত করি। আমিও দেখি, তোমরাও দেখ, দেখিয়া চ
জুড়াও।"

ষষ্ঠ অধ্যায়
ভূতের তেল

নাকেশ্বরীর ছবি দেখিয়া ঘ্যাঁঘোঁর প্রাণ কিঞ্চিৎ শান্ত হইল। যে
একে একে সকলের করমর্দন করিয়া প্রস্থান করিল। তখন আমীর,—
ব্রাহ্মণ ও তাঁতিকে বলিলেন,—"আপনাদিগকে আমি অনেক ক
দিয়াছি। ঘর-সংসার ছাড়িয়া আপনারা আমার সঙ্গে ঘুরিতেছেন
আর আপনাদিগকে আমি ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করি না। আপনারা
বাড়ি ফিরিয়া, যান, আমার কপালে যাহা আছে, তাহা হইবে।" কি
ব্রাহ্মণ ও তাঁতি কিছুতেই আমীরকে একলা ফেলিয়া যাইতে চাহিলে
না। আমীরের অনেক অনুনয় বিনয়ে শেষে স্বীকৃত হইয়া তাঁহার নিক
বিদায় লইয়া, বিরসবদনে দুইজনে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহা
চলিয়া গেলে ঘ্যাঁঘোঁর কূপের ধারে বসিয়া আমীর অনেকক্ষণ কাঁদিতে
লাগিলেন। তারপর মনকে প্রবোধ দিয়া ভাবিলেন,—"কাঁদিলে ক
হইবে? এখন ভূত ধরিবার উপায় চিন্তা করি, তবে তো স্ত্রীর উদ্ধা
হইবে।" অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আমীর মাথা হইতে পাগড়ি

ুলিলেন। পাগড়িটি উত্তমরূপে পাকাইলেন, আর তাহার একপাশে ৷কটি ফাঁস করিলেন। এইরূপে সুসজ্জিত হইয়া, যে-আমগাছে গোঁগোঁ ামক গলায়-দড়ি ভূত থাকে, সেইদিকে চলিলেন। গাছের নিকট ৃপস্থিত হইয়া গাছের উপর উঠিতে লাগিলেন। অনেক দূর উঠিয়া াছের ডালে পাগড়ির অন্য পাশ বাঁধিয়া ফাঁসটি গলায় দিতে উদ্যত ইলেন। ফাঁসটি গলায় দেন আর কি, এমন সময় চাহিয়া দেখেন যে, সই গলায়দড়ি ভূত সহাস্যবদনে তাঁহার সম্মুখে আর একটি ডালে িসিয়া রহিয়াছে।

ভূত বলিল,—"নে নে, শীঘ্র শীঘ্র গলায় ফাঁস পরিয়া ঝুলিয়া পড়, ীচে হইতে আমিও সেই সময় তোর পা ধরিয়া টানিব এখন, তাহা ইলে সত্বর তোর মৃত্যু হইবে, তাহা হইলে আমার বেকার নাতি-জামাই তার ভূতগিরি করিতে পাইবে।" আমীর কোনো কথা না কহিয়া আস্তে াস্তে জেব হইতে আফিমের কৌটাটি বাহির করিলেন। কৌটাটির াকন ভূতের সম্মুখে ধরিলেন। ভূত তাহাতে উঁকিঝুকি মারিয়া জিজ্ঞাসা ৷রিল,—"ওর ভিতর ও-কে?" আমীর বলিলেন,—"একটি ভূত।" গাঁগোঁ বলিল,—"ভূত! কৈ, ভাল করিয়া দেখি।" খুব ভাল করিয়া দখিয়া গোঁগোঁর নিশ্চয় বিশ্বাস হইল যে, ভূত বটে। সে জিজ্ঞাসা ৷রিল,—"উহার ভিতর তুই ভূত ধরিয়া রাখিয়াছিস কেন?" আমীর ালিলেন,—"আমি একখানি খবরের কাগজ খুলিবার বাসনা করিয়াছি। ম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন। ডিবের ভিতর যে ভূতটি িরিয়া রাখিয়াছি, তাহাকে সহকারী-সম্পাদক করিব। আর তোরে ানে করিয়াছি, সম্পাদক করিব।" গোঁগোঁ বলিল,—"আমি যে লখাপড়া জানি না।" আমীর বলিলেন,—"পাগল আর কি! লখাপড়া জানার আবশ্যক কি? গালি দিতে জানিস তো?" গোঁগোঁ ালিল,—"ভূতদিগের মধ্যে যে-সকল গালি প্রচলিত আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।" আমীর বলিলেন—"তবে আর কি! আবার চাই কি? একদিন লোকে মানুষ ধরিয়া সম্পাদক করিতেছিল, কিন্তু মানুষে াহা কিছু গালি জানে, মায় অশ্লীল ভাষা পর্যন্ত, সব খরচ হইয়া

গিয়াছে ; সব বাসি হইয়া গিয়াছে। এখন দেশশুদ্ধ লোককে ভূতে
গালি দিব। আমার অনেক পয়সা হইবে।" ভূত বলিল—"তবে কি
তুমি গলায় দড়ি দিয়া মরিবে না ? ঐ যে পাগড়ি ? ঐ যে ফাঁস ?"
আমীর বলিলেন,—"আমি তো আর ক্ষেপি নাই যে, গলায় দড়ি দিয়া
মরিব। পাগড়ি আর ফাঁস হইতেছে টোপ, ওরে বেটা! তোকে
ধরিবার জন্য টোপ। যদি এ ফন্দি না করিতাম, তাহা হইলে তুই কি
গাছের ভিতর হইতে বাহির হইতিস ? এখন চল, ইহার ভিতর প্রবেশ
কর্।" এই বলিয়া আমীর তাহাকে চঙুর নলটি দেখাইলেন! ভূত
জিজ্ঞাসা করিল, "ও আবার কি ?" আমীর বলিলেন, "ইহার নাম
বাম্বু। নে, শীঘ্র ইহার ভিতর প্রবেশ কর্।" ভূত ইতস্ততঃ করিতেছে
দেখিয়া আমীর টেকোটি বাহির করিয়া বলিলেন,—"দেখিতেছিস ?"
ভূত জিজ্ঞাসা করিল,—"ও আবার কি ?" আমীর বলিলেন,—"এ
নাম আটখিল্লে। সাধু ভাষায় ইহাকে থক্ বলে। নলের ভিতর
যদি-না প্রবেশ করিস, তাহা হইলে ইহা দিয়া তোর চক্ষু উপড়াইয়া
লইব।" বাস্তবিক থক্‌টি তখন যেরূপ চক্‌চক্ করিতে লাগিল, তাহাতে
বোধ হইল যেন সে আজন্মকাল ভূতের চক্ষু তুলিয়া আসিতেছে, যেন
ভূতের চক্ষু না তুলিয়া থক্ কখনও জলগ্রহণ করে না। আর যেন
আমীর যদি নাও উপড়ান তো থক্ নিজে গিয়া সেই মুহূর্তে ভূতের চক্ষু
তুলিয়া ফেলিবে। টেকোর এই প্রকট মূর্তি দেখিয়া ভূত বড়ই ভয়
পাইল। ভয়ে তাহার সর্বশরীর থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।
মনে করিল,—কাজ নাই বাপু! পরের চাকর হইয়া, এডিটারি করিয়া
না হয় খাইব, তাই বলিয়া অন্ধ হইয়া থাকিতে পারিব না।' এই
ভাবিয়া সে আপনার কলেবর হ্রাস করিল, আর সুড়সুড় করিয়া নলের
ভিতর প্রবেশ করিল। নলের ছিদ্রে ভাল করিয়া সোলা আঁটিয়া
দিয়া, আমীর গাছ হইতে নামিয়া আসিলেন।

আমীরের মনে এখন কিঞ্চিৎ স্ফূর্তির উদয় হইল। শিস দিতে দিতে
তিনি গ্রামাভিমুখে চলিলেন, গ্রামে উপস্থিত হইয়া লোককে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—"তোমাদের এ গ্রামে কলুর বাড়ি আছে ?" লোকে বলিল

"হাঁ আছে।" কলুর বাড়িতে উপস্থিত হইয়া আমীর কলুকে বলিলেন,—"কলু ভায়া! আমার একটি বিশেষ উপকার করিতে হইবে। এই বাঁশের নলটির ভিতর আমি একটি ভূত ধরিয়া আনিয়াছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া সেই ভূতটিকে ঘানিতে মাড়িয়া তেল বাহির করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার বড়ই উপকার হয়।" কলু বলিল,—"তার বাধা কি! এখনই দিব। তিল, সরিষা, তিসি, পোস্তা, কত কি পিষিয়া তেল বাহির করিলাম, আজ একটু ভূতের তেল বাহির করিয়া দিব, সে আর এমন কি বড় কথা! কৈ, লইয়া এস।" দুই জনে ঘানিগাছের কাছে গেলেন। আমীর নল হইতে ভূতটিকে আস্তে আস্তে বাহির করিয়া ঘানিগাছের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কলু তৎক্ষণাৎ ঘানি চালাইয়া দিল। কলুর বলদ মৃদুমন্দ গতিতে ঘুরিতে লাগিল। ভূতের হাড় মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। ভূত,—"ত্রাহি মধুসূদন! ত্রাহি মধুসূদন!"—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আর বলিতে লাগিল,—"এই বুঝি তোমার এডিটারির পদ? এই বুঝি খবরের কাগজের সম্পাদকতা করা?" আমীর হাসিয়া বলিলেন,—"জান না ভায়া! সম্পাদক হইতে আমি এইরূপেই প্রবন্ধ বাহির করিয়া থাকি। কেমন! উত্তম উত্তম গালি, ভাল ভাল প্রবন্ধ, এখন মনে উদয় হইতেছে তো? গোঁ গোঁ ভায়া! সেকালের হরিণের গল্পটাও কি ছাই শুন নাই? যাহতে কথা আছে,—ওহে ভাই শশধর! আগে এ দায়ে তো তর, তারপর কাজকাম কর আর না কর।" ঘানি হইতে ক্রমে টপ্ টপ্ করিয়া তেল পড়িতে লাগিল। প্রায় এক শিশি তেল প্রস্তুত হইল। যখন ভূতের দেহ একবারে তেলশূন্য শুষ্ক হইয়া গেল, তখন বলদ থামিল, ঘানিগাছ আর ঘুরিল না। আমীর সেই ছোবড়ারূপ ভূতকে বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, ভূত না হইয়া যদি মানুষ হইত, তাহা হইলে কোন্‌কালে মরিয়া যাইত।

সপ্তম অধ্যায়

উদ্দেশ

তেলের শিশিটি পকেটে লইয়া আমীর পুনর্বার চলিলেন। যাইতে যাইতে কত পথ চলিয়া অবশেষে হিমালয়ের তলভাগে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হিমালয়ের উপর উঠিয়া কত চড়াই-উতরাইয়ের পর ভীমতাল দেখিতে পাইলেন। ভীমতালের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘ্যাঘোঁ যেরূপ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল, সেই স্থানটিতে গিয়া বসিলেন। জানিলেন, সেই স্থানটিতে ডুব মারিতে হইবে, তাহার নিচেতেই লুল্লুর ঘর। সেই স্থানে বসিয়া, শিশিটি বাহির করিয়া উত্তমরূপে সর্ব শরীরে ভূতের তেল মর্দন করিলেন। তেল মাখিয়া তাঁহার শরীরে যে কেবল আসুরিক বল হইল তাহা নহে, দেহ এত লঘু হইল, যেন তিনি পাখির মতো উড়িতে পারেন। তেল মাখা হইলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আর 'বিসমিল্লা' বলিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। জলে ডুব দিয়া ক্রমেই নিচে যাইতে লাগিলেন। পাতাল পর্যন্ত অত দূর যাইতে হয় নাই, কিন্তু অনেক, অনেক দূর গিয়া পাহাড়ের গায়ে একটি ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্রের ভিতর প্রবেশ করিতেই একেবারে শুষ্ক ভূমিতে পদার্পণ করিলেন। সেখানে আলোর অভাব ছিল না। দিনের উত্তম আলো ছিল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বাসস্থানের মতো পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি গর্ত দেখিতে পাইলেন। কিন্তু কি মনুষ্য, কি ভূত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন,—'এখনও দিন রহিয়াছে, এত প্রকাশ্যভাবে এখানে বিচরণ করা ভাল নয়। রাত্রি হইলে সকল সন্ধান লইব।'—এই মনে করিয়া একটি ছোট গর্তে লুকাইয়া রহিলেন।

জলে ডুব দিয়া যে শুষ্ক ঘরের ভিতর প্রবেশ করা যায়, এ কথা শুনিয়া কেহ যেন অবাক্ হইবেন না। লোক পাছে ভাবেন যে, আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা অলীক গল্পকথা, সেজন্য আমাকে ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতে হইল। আকবরের সময় একজন মিস্ত্রি লাহোরে এরূপ একটি ঘর নির্মাণ করিয়াছিল যে, নিকটস্থ একটি জলাশয়ের জলে ডুব না দিয়া সে-ঘরে যাইবার আর অন্য পথ ছিল না। আগ্রাতে জাহাঙ্গীর

বাদশাহও এইরূপ একটি ঘর দেখিয়াছিলেন। ওয়াকিয়াত-ই-জাহাঙ্গীরি নামক পুস্তকে জাহাঙ্গীর লিখিয়াছেন,—"আমার পিতার সময় লাহোর নগরে যেরূপ একটি জলগৃহ নির্মিত হইয়াছিল, সেইরূপ একটি জলগৃহ দেখিতে রবিবার দিন হাকিম আলির বাড়িতে গিয়াছিলাম। আমার সহিত কতকগুলি পারিষদও ছিল, যাহারা এরূপ গৃহ কখনও দেখে নাই। জলাশয়টি দীর্ঘে প্রস্থে প্রায় ছয় গজ, ইহার পাশে একটি কামরা, যাহাতে উত্তমরূপ আলো ছিল, এবং যাহার ভিতর যাইতে হইলে এই জলের ভিতর দিয়া ভিন্ন অন্য পথ ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই কামরায় দশ-বার জন লোক বসিতে পারে! ইহাব ভিতর হাকিম আমাকে টাকা ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপঢৌকন দিলেন। কামরা দেখিয়া আমি বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। হাকিমকে পুরস্কার স্বরূপ দুহাজারীর পদে নিযুক্ত করিলাম।" এক্ষণে ইতিহাস দ্বারাও গল্পটি সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল। পৃথিবীতে যে কত অদ্ভুত বিষয় আছে, তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়।

আমীর পাহাড়ের গর্তে লুকাইয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, যখন কতক রাত্রি গত হইয়া গেল, তখন সেই গিরিগহ্বরের সহসা তুমুল ঝড় উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জলের ভিতরেও ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। আমীর কান পাতিয়া শুনিলেন, কে যেন জল ফুঁড়িয়া উপরে যাইতেছে। ভাবিলেন,—'রাত্রি হইয়াছে, এইবার ভূত বুঝি চরিতে যাইতেছে।' যখন পুনরায় সে-স্থান নিঃশব্দ হইল, তখন আমীর আস্তে আস্তে গর্ত হইতে বাহির হইলেন। অতি সাবধানে, এ-ঘর সে-ঘর, অর্থাৎ কি না এ-গর্ত সে-গর্ত খুঁজিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে অতি দূরে একটি সামান্য আলো তাঁহার নয়ন-গোচর হইল। সেই দিক্ পানে গিয়া দেখিলেন, অপেক্ষাকৃত এক বৃহৎ ঘরের ভিতর একটি প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপের কাছে গালে হাত দিয়া, মস্তক অবনত করিয়া, এক মলিনা-বসনা বিরস-বদনা ললনা বসিয়া রহিয়াছেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আমীর চিনিতে পারিলেন যে, এই রমণী তাঁহারই স্ত্রী। স্ত্রীকে দেখিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে যেন হাতুড়ির ঘা পড়িতে লাগিল।

এমনি হৃদয়ের আবেগ উপস্থিত হইল যে, মনে করিলেন. এখনি দৌড়িয়া গিয়া বলি,—'আর ভয় নাই, আমি আসিয়াছি, আমি তোমার আমীর, আসিয়াছি।' কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিলেন, মনে করিলেন,—'ভয় নাই কিসে ? এখনও তো আমরা ভূতের হাতে ! এখনও তো স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে পারি নাই ! স্ত্রীর দেখিতেছি, শীর্ণ দেহ, মলিন মুখ। বোধ হয়, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে। একবারে দেখা দেওয়া হইবে না। আমি যে এখানে আসিয়াছি, ক্রমে জানিতে দিব।'—এই ভাবিয়া কিছু-ক্ষণের জন্য আমীর একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমীর-রমণী কাঁদিতেছিলেন। অবিরল ধারায় অশ্রুস্রোত তাঁহার নয়নযুগল হইতে বহিতেছিল। মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন, এক-একবার চক্ষু মুছিতেছিলেন, কখনও কখনও অপরিস্ফুট ভাষায় খেদোক্তিও করিতে-ছিলেন। বলিতেছিলেন,—"হায়। আমার দশা কি হইল ! শয়তানের হাতে পড়িয়া আমার জাতিকুল যাইতে বসিল। ধর্ম বিনা স্ত্রীলোকের পৃথিবীতে আর আছে কি ? ভূতই হউক আর শয়তানই হউক, এ ধর্ম আমি তাহাকে কখনই বিনাশ করিতে দিব না। সে দুর্বৃত্ত অঙ্গীকার করিয়াছে, এক বৎসর কাল আমাকে কিছু বলিবে না। এই এক বৎসরের মধ্যে দুর্বলের বল, নিঃসহায়ের সহায়, ঈশ্বর কি আমায় পাপিষ্ঠের হাত হইতে মুক্ত করিবেন না ? আমীর ! আমীর !! একবার আসিয়া দেখ, আমার কী দশা হইয়াছে।" আমীর আস্তে আস্তে বলিলেন, —"ভয় নাই, ঈশ্বর তোমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, আমি আসিয়াছি।" আমীর রমণী চমকিত হইয়া মুখ তুলিলেন। তখন তাঁহার দুই চোখ জলে প্লাবিত ছিল, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, মনের ভ্রান্তিবশতই তিনি এরূপ শব্দ শুনিলেন। তবুও মনে একটু আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু সহসা চক্ষু মুছিতে সাহস করিতেছিলেন না ; পাছে সত্য সত্যই ভ্রান্তি হইয়া পড়ে, পাছে সে আশাকণাটুকুও উড়িয়া যায়। আমীর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন, বলিলেন,—"চাহিয়া দেখ ! সত্য সত্যই আমি আসিয়াছি। ভয় নাই, ঈশ্বরের কৃপায় নিশ্চয় এ ঘোর বিপদ হইতে আমরা মুক্ত হইব।"—এই বলিয়া একেবারে

স্ত্রীর নিকটে গেলেন। দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পর আমীর চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—"আর কাঁদিয়ো না। এখন এখানকার সকল কথা আমাকে বল। ভূত তোমাকে কী করিয়া ধরিয়া আনিল।" আমীর-রমণী বলিলেন,—"তাহার আমি কিছুই জানি না। ঘরের ভিতর হইতে যেই বাহিরে আসিয়া পা দিলাম, সেই সময়ে তুমি ভিতর হইতে কী যেন বলিলে, শুনিতে পাইলাম। তারপর যেন একটা ঝড় আসিয়া আমাকে একেবারে ভূমি হইতে উঠাইয়া লইল, একেবারে শূন্যে তুলিয়া ফেলিল, একেবারে উড়াইয়া লইয়া চলিল। আমি অজ্ঞান সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম, বলিতে পারি না। যখন প্রভাত হইল, চক্ষু মেলিয়া দেখি, দিন হইয়াছে, সম্মুখে এক বিকটমূর্তি বিষমদেহ নরাকার রাক্ষস। তাহাকে দেখিয়া পুনর্বার অজ্ঞান হইয়া গেলাম। তারপর পুনরায় যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, রাত্রি হইয়াছে, ঘরে আর কেহ নাই, একেলা পড়িয়া আছি। এই প্রদীপটি মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে, নানারূপ আহার্য দ্রব্য ঘরে রহিয়াছে। আমি কিন্তু কিছুই খাইলাম না। মনে করিলাম, অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব। তাহার পরদিবস প্রাতঃকালে সেই বিকটমূর্তি আবার আমার কাছে আসিল। এবার আমি তাহাকে দেখিয়া অজ্ঞান হই নাই। বড়ই ভয় হইয়াছিল সত্য, অজ্ঞান হইবার উপক্রমও হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সাহস করিয়া বুক বাঁধিলাম। মনে করিলাম, শুনিতে হইবে সে কে, আর কেনই বা আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে? সেই বিকট মূর্তি আমার নিকট আসিয়া বলিল,—'সুন্দরি! এক্ষণে আর তুমি আমীরের রমণী নও, এক্ষণে তুমি আমার গৃহিণী। তোমার স্বামী নিজে তোমায় আমাকে দান করিয়াছে। এখন আমার এই সমুদয় ঘরকন্না তোমার। অনুমতি হইলেই এইক্ষণেই আমাদের কাজীকে ডাকিয়া আনি, তিনি আমার সহিত তোমার নিকা দিয়া দিবেন।' সাহসের উপর ভর করিয়া আমি বলিলাম,—'তুমি কে? স্বামী আমায় তোমাকে কী করিয়া দিলেন?'

সে বলিল,—'আমি ভূত। আমার নাম লুল্লু। আমি সামান্য ভূত নই, আমি একজন সভ্য ভব্য নব্য ভূত। আর, এই ধনসম্পত্তি, এই গিরিগহ্বর আমার। আমি দুখিরাম চণ্ডালের ভূতগিরি করিতেছি। ভূত-সমাজে আমি অতি প্রবল-পরাক্রান্ত বলিয়া পরিচিত, আমার মান-মর্যাদা রাখিতে আর স্থান নাই।' আমি বলিলাম,—'স্বামী আমায় তোমাকে দিয়াছেন, এ-কথা একেবারেই মিথ্যা। তারপর মানবী হইয়া ভূতের রমণী কবে কে হইয়াছে? দেখ, আমরা খোদা-পরস্ত মুসলমান, বুতপরস্তদিগের মতো শয়তানের শাগ্‌রেদ নই। আমার প্রতি অত্যাচার করিলে খোদা তোমাকে দণ্ড দিবেন।'

"এইরূপ প্রতিদিন ভূতের সহিত বাদানুবাদ হয়। ভূত কিন্তু আমার গায়ে হাত দিতে সাহস করে নাই। প্রথম কয়েক দিন আমি আহার-নিদ্রা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। তারপর যখন দেখিলাম যে, আপাতত ভূত আমার প্রতি বিশেষ কোনোরূপ অত্যাচার করিতে সাহস করিতেছে না, তখন আহার করিতে লাগিলাম। মনে ভাবিলাম, ভূতশাসন করিবার নিমিত্ত নানারূপ তাবিজ আছে। আমিলদিগের নিকট হইতে তাহা আনিয়া নিশ্চয় তুমি আমায় উদ্ধার করিবে। ভূত প্রতিদিন আসে আর বলে,—কেমন, আজ কাজী আনি? প্রতিদিন দেখিয়া দেখিয়া, এখন তাহাকে দেখিলে আর আমার বড় ভয় হয় না, পূর্বেকার চেয়ে মনে সাহসও অনেক হইয়াছে। নিকা করিবার কথা বলিলে, এখন তাহাকে একপ্রকার দূর দূর করিয়া দিই। একদিন কিন্তু সে ভয়ানক রাগিয়া গেল। শরীর ফুলিয়া দ্বিগুণ হইল, ভূত না হইলে হয় তো ফাটিয়া মরিয়া যাইত। সমুদয় শরীর হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল। রাগে নিজের হাতটি খুলিয়া লইল, অপর হাত দিয়া ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরাইতে লাগিল। পা দুইটা খুলিয়া লইল, আর সেইরূপ ঘুরাইল। দুইটি হাত, দুইটি পা ঘুরান হইলে, চক্ষু-কোটর হইতে চক্ষু দুইটি বাহির করিয়া লইল, আর যেরূপ লোকে ভাঁটা লুফিয়া থাকে, সেইরূপ দুই হাতে লুফিতে লাগিল। তারপর সমস্ত মুণ্ডটি খুলিয়া লইল, হাতে লইয়া বলিল, 'সুন্দরি! যদি তুমি আমাকে বিবাহ না কর, তাহা হইলে

তোমার সাক্ষাতে আমি এই আপনার মুণ্ডটি আপনি চিবাইয়া খাইব।' কী করিয়া নিজের মুণ্ড নিজে খাইবে, তাহা কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, আমি বলিলাম,—'তুমি নিজের মুণ্ড নিজেই খাও, আর পরেই খা'ক, আমি কেন ভূতকে বিবাহ করিতে যাইব? ভাল চাও তো আমাকে ঘরে রাখিয়া এস।' তখন সে বলিল,—'আচ্ছা! আজ আমি তোমাকে কিছু বলিলাম না, আজ হইতে এক বৎসর কাল তোমাকে কিছু বলিব না। এক বৎসর পরে আমাকে নিকা কর ভালই, না কর তোমাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিব। তোমার স্বামী তোমায় আমাকে দিয়াছে, আমি তোমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিব। মনে করিয়ো না আর কখনও তোমার স্বামীকে তোমায় ফিরাইয়া দিব।' সেইদিন হইতে আর আমাকে বিরক্ত করে না। রাত্রি হইলে চরিতে যায়, সকাল হইলে বাড়ি আসে, পরে ঐ বড় গর্তটিতে শুইয়া সমস্ত দিন নিদ্রা যায়। মেঘগর্জনের ন্যায় নাকডাকার শব্দ শুনিতে পাই, আমার কাছে বড় আসে না। কেবল তিন চার দিন অন্তর একবার আসিয়া আহার্য সামগ্রী দিয়া যায়, আর জিজ্ঞাসা করে,—'কেমন, এখন তোমার মন শান্ত হইয়াছে তো? কাজী আনিব কি?' গতবার আসিয়া বলিল,—'দেখ, এখন আমি সাবাং মাখিতে আরম্ভ করিয়াছি। রোজ সাবাং মাখি। রং অনেক ফর্‌সা হইয়া আসিয়াছে। আর কিছুদিন পরে লোকে আমাকে আর চিনিতে পারিবে না। যেখানে যাইব সকলে বলিবে, লুল্লু নয়, এ সাহেবভূত; কোন লর্ডের ছেলে হইবে। তখন তুমি আর আমাকে বিবাহ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। তখন তুমি বলিবে 'আমার লুল্লু কই? আমার লুল্লু কোথা গেল?' তখন তুমি বলিবে, 'আর বিলম্ব সহে না, শীঘ্র কাজী ডাক, শীঘ্র আমাকে নিকা কর।' কিন্তু তা আমি করিব না। তখন আমি টালবাহানা করিব। নিকা করিবার জন্য তুমি আমার সাধ্য-সাধনা করিবে, তা দেখিয়া আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করিব। মনে করিব, এ আমাকে বড়ই ভালবাসে, আমি ইহার জীবনসর্বস্ব। সকল ভূতেই বলে যে, লুল্লু সভ্য ভব্য নব্য ভূত। আমি আর আমার গেঁটে দাদা, দুই জনেই সভ্য ভব্য নব্য। দেখিতে পাও

তো, ভোর না হইলে কখনও বাড়ি আসি না। যাই, এখন সাবাং মাখিগে।' এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গিয়াছে দুই-এক দিনের মধ্যে আবার বোধ হয় আসিবে।"

আমীর জিজ্ঞাস করিলেন,—"ইহা কি ভূতের মেস্, না মুফলিসের বাড়ি? অর্থাৎ কিনা, এখানে অপরাপর ভূত থাকে, না লুল্লু একেলা থাকে?" আমীর-রমণী বলিলেন যে,—"এখানে লুল্লু ভিন্ন আর কোনো ভূতকে দেখি নাই! লুল্লু একেলা থাকে, এই আমার বিশ্বাস।" আমীর বলিলেন,—"এখন সকল কথা বুঝিলাম, ঈশ্বর আমাদের প্রতি কৃপা করিবেন। কিন্তু কিরূপে যে বিপদ হইতে উদ্ধার হইব, তাহা জানি না। আপাতত আমার বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে। যদি কিছু খাবার থাকে তাহা আমাকে দাও।" আমীর-রমণী বলিলেন,—"খাবারের এখানে কিছুমাত্র অভাব নাই। ভূত প্রচুর পরিমাণে সে সকল আনিয়া দেয়।" এই বলিয়া তিনি পোলাও, কালিয়া, কোর্মা, কোপ্তা, কাবার, কারি আনিয়া স্বামীকে উত্তমরূপ আহার করাইলেন।

অষ্টম অধ্যায়

চণ্ডু-মাহাত্ম্য

আহারান্তে বিছানায় শুইয়া আমীর নল দ্বারা চণ্ডুধূম পান করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন,—কী করিয়া স্ত্রীকে ভূতের হাত হইতে উদ্ধার করি। ধূমপান করিতে করিতে স্ত্রীকে বলিলেন, —"এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি, তুমি কী বল? লুল্লু সভ্য ভব্য নব্য ভূত। ভূতের তেল মাখিয়া যদিচ অমার শরীরে ভূতের বল হইয়াছে, তথাপি তাহার সহিত বোধহয় সম্মুখ-সংগ্রামে আমি জয়লাভ করিতে পারিব না। বিশেষত ঘ্যাঘোঁ আমাকে বলিয়া দিয়াছে—কৌশল করিয়া স্ত্রীরে উদ্ধার করিয়ো।' সেজন্য তুমি একটি কাজ কর। লুল্লুকে অল্প অল্প প্রশ্রয় দাও। দিনকতকাল তাহাকে

চণ্ডুর ধূম পান করাও। তারপর কী হয় বুঝা যাইবে।…চণ্ডুর নেশায় তুমি তাহাকে আবদ্ধ কর। আমার সমুদয় সরঞ্জাম তোমার নিকট রাখিয়া যাইব। দিনকতকাল কাঁচা আফিম খাইয়া না হয়, কষ্টে-শ্রেষ্ঠে কাল কাটাইব।" আমীর-রমণী বলিলেন,—"এ পরামর্শ মন্দ নয়।"

এইরূপ কথোপকথনে নিশা অবসান-প্রায় হইল। তখন আমীর-রমণী বলিলেন,—"আর তুমি এখানে থাকিয়ো না। ভূতের আসিবার সময় হইয়াছে। ভূত চরিতে গেলে, কাল আবার রাত্রিতে আসিয়ো। চণ্ডুর আসবাব রাখিয়া যাও। দেখি, কী করিতে পারি। কিছু খাবার-দাবার সঙ্গে লইয়া যাও, দিনের বেলায় খাইবে।" আমীর, স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় সেই গর্তে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন।

প্রাত:কাল হইতে-না-হইতে ভূত বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াই, প্রথমে আপনার গর্তে গিয়া শুইল। ঘোরতর নাক ডাকাইয়া অনেক্ষণ নিদ্রা গেল তারপর উঠিয়া হ্রদের জলে গেল স্নান করিতে। পাথর দিয়া, ঝামা দিয়া, বালি দিয়া সাবাং দিয়া উত্তমরূপে গা মাজিল। শরীরের নানাস্থানে রক্ত ফুটিয়া পড়িতে লাগিল। আপনা আপনি বলিল,—ক্রমে এইবার দুধে-আলতার রং হইয়া আসিতেছে! তারপর সাজগোজ করিয়া আমীর-রমণীর নিকট গমন করিল। বলিল,—"কি সুন্দরি! দেখিতেছ? দিন দিন কী হইতেছি? দুধে আল্‌তার রং!" আমীর-রমণী বলিলেন —"তাই তো! তোমাকে যে আর চেনা যায় না।" ভূত বলিল,—"পাথর, ঝামা, বালি, সাবাং!" আমীর-রমণী বলিলেন, —"সত্য সত্যই তুমি সভ্য ভব্য নব্য ভূত।" ভূত বলিল,—"তবে কাজী ডাকি?" আমীর-রমণী বলিলেন, "কাজী ডাকায় আমার কিছু আপত্তি নাই, তবে কি জান, তুমি হইলে ভূত, আমি হইলাম মানুষ, দুই জনে মিলিবে কী করিয়া তাই ভাবিতেছি। মানুষের মতো একটু আধটু যদি তোমার ব্যবহার দেখি, তাহা হইলে বুঝি, হাঁ দুই জনে পরিণয় হইতে পারিবে। এই দেখ এত খাদ্যদ্রব্য তুমি আমাকে আনিয়া দাও, নিজে কিন্তু একদিনের জন্যেও একটু খুঁটিয়া মুখে দাও না। কি খাও, কি না খাও, তাহাও জানি না। সাপ খাও, কি ব্যাং খাও,—কিছুই বলিতে পারি

না। হয়তো কোন্ দিন পচা মড়া খাইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবে। মুখের গন্ধে আমার প্রাণ বাহির হইবে। তারপর দেখ, মানুষে পান খায়, তামাক খায়, গ্যাঁজা খায় আরও কত কি খায়। আহা! আমার স্বামী আমীর কেমন চণ্ডু খাইতেন! কাছে বসিয়া মনের সাধে কেমন তাঁহাকে আমি চণ্ডু খাওয়াইতাম। যখন চণ্ডুর ধূম আমার নাকে প্রবেশ করিত, তখন কেমন আমি স্বর্গসুখ লাভ করিতাম। তাঁহার চণ্ডুর আসবাবগুলি আমি আমার কাঁধে ঝুলি করিয়া রাখিয়াছিলাম। শয়নে উপবেশনে সর্বদাই আমার নিকট রাখিতাম। আহা! আজ পর্যন্ত সেই ঝুলিটি আমার কাঁধেই রহিয়াছে।" ভূত বলিল,—"বটে! তা, আমিও চণ্ডু খাইব, নিয়ে এস, এখনি খাইব।" আমীর-রমণী বলিলেন,—"তাহা যদি করিতে পার তো বড় ভালই হয়। ভূত-ভূতিনীদিগের কাছে তুমি সভ্য ভব্য নব্য ভূত বটে, কিন্তু আমাদের নাকে তোমাদের গায়ের একটু গন্ধ লাগে, একটু বোট্‌কা বোট্‌কা। রীতিমত চণ্ডুটি খাওয়া অভ্যাস করিতে পারিলে, আর তোমার গায়ে সে-গন্ধ থাকিবে না, মানুষ-মানুষ গন্ধ হইবে। ভূত বলিল,—"তা দাও, খাইব।" আমীর-রমণী বলিলেন, —"কাঁচা আফিম হউক, কি গুলি হউক, কি চণ্ডু হউক, অল্প অল্প করিয়া খাইতে অভ্যাস করিতে হয়। একেবারে অধিক খাইলে অসুখ করে। তোমার অসুখ করিলে প্রাণে আমি বড়ই ব্যথা পাইব। ···যাহা হউক, চণ্ডু শুইয়া খাইতে হয়। মূর্খ লোকের বিশ্বাস এই যে, চণ্ডু একবার টানিলেই অচেতন হইয়া পড়ে বলিয়া সকলে ইহা শুইয়া খায়। তাহা নহে, শুইয়া খাইতে মৌজ হয় বলিয়া খায়।" এই বলিয়া আমীর-রমণী চণ্ডুর আসবাব বাহির করিয়া দিলেন। প্রদীপের নিকট ঘরে এক পার্শ্বে মাটিতে শুইয়া তাহাকে ধূমপান করিতে বলিলেন। কী করিয়া খাইতে হয়, তাহাও বলিয়া দিলেন। সে অল্প অল্প ধূমপান করিলে, আমীর-রমণী বলিলেন,—"এখন আর নয়, চরিতে যাইবার পূর্বে পুনরায় ও-বেলা আসিয়া খাইও। কিছু কি টের পাইতেছ?" ভূত বলিল, —"আর কিছু টের পাইতেছি না, কেবল গা চুলকাইতেছে, আর একটু বমি বমি করিতেছে।" আমীর-রমণী বলিল, —"ঐটুকুই এর আয়েস,

একেই নেশা বলে।” ভূত তখন চলিয়া গেল। পুনরায় সন্ধ্যাবেলা আসিয়া আর একবার চণ্ডু খাইল। রাত্রি হইলে যথানিয়মে চরিতে গেল। তখন আমীর আসিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলেন।

নবম অধ্যায়

উদ্ধার

ভূতের চণ্ডু খাওয়ার বিবরণ স্ত্রীর নিকট আদ্যোপান্ত শুনিয়া আমীর বড়ই আনন্দলাভ করিলেন। পূর্বেকার মতো কথোপকথনে দুইজনে একত্রে রাত্রি কাটাইলেন। প্রভাত হইতে-না-হইতেই আপনার গর্তে ফিরিয়া গেলেন। এইরূপ কিছুদিন চলিতে লাগিল। ভূত দিনে দুইবেলা আসিয়া চণ্ডু খায়। আমীর রাত্রিতে স্ত্রীর নিকট থাকেন। আমীর যখন দেখিলেন, চণ্ডুপানে ভূতের বিলক্ষণ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, আর ছাড়িবার যো নাই, তখন তিনি একদিন স্ত্রীকে বলিলেন,—“কাল তুমি ভূতকে আর চণ্ডু দিয়ো না ; বলিয়ো, চণ্ডু ফুরাইয়া গিয়াছে, মনুষ্যালয় হইতে চণ্ডু আনিতে বলিবে।” তার পরদিন প্রাতঃকালে যখন ভূত চণ্ডু খাইতে আসিল, আমীর-রমণী তাহাকে বলিলেন,—“দেখ, সঙ্গে করিয়া যাহা কিছু চণ্ডু আনিয়াছিলাম, সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছে, আজ তোমাকে খাইতে দিই এমন আর নাই, তুমি লোকালয় হইতে চণ্ডু লইয়া আইস।” এই কথা শুনিয়া ভূতের মন বড়ই উদাস হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনও সে জানিতে পারে নাই, কি সর্বনাশের কথা সে শুনিল! বিরসবদনে আপনার ঘরে ফিরিয়া গেল। যত বেলা হইতে লাগিল, শরীরে ও মনে ততই ক্লেশ হইতে লাগিল। প্রথম আকর্ণ পূরিয়া হাই উঠিতে লাগিল, তারপর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, গা-ভাঙ্গিতে লাগিল। সর্বশরীরে ঘোর বেদনা হইল, প্রাণ আই-ঢাই করিতে লাগিল। সেদিন আর নিদ্রা হইল না। বৈকাল বেলা খালি নলটি লইয়া প্রদীপের শীষের কাছে ধরিয়া একবার টানিল। কিন্তু তাহাতে কিছু মাত্র ক্লেশ দূর হইল না। একান্তমনে সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল, কখন সন্ধ্যা হইবে যে,

লোকালয়ে যাইয়া চণ্ডু আনিয়া প্রাণ রক্ষা করিবে। সেদিন যেই সন্ধ্যা হইল, অমনি ভূত ঘর হইতে বাহির হইল। ভীমতালের জল ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। উপরে গিয়া আর সব চিন্তা ছাড়িয়া, কেবল চণ্ডুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। এ-গ্রাম সে-গ্রাম, এ-নগর সে-নগর, এ-দেশ সে-দেশ, সমস্ত ভারতভূমি ঘুরিল, চণ্ডু কোথাও পাইল না। আবগারির এমনই কড়া নিয়ম যে, সন্ধ্যা না হইতেই সকল দোকান বন্ধ হইয়া যায়। এদিকে চণ্ডু বিনা প্রাণ বাহির হয়। উদরেরও বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। শরীর আর বয় না, আর উড়িতে বা চলিতেও পারে না। তখন ভাবিল,—বৃথা আর ঘুরিয়া কী হইবে? মরি তো ঘরে গিয়া মরি, প্রিয়তমার মুখ দেখিতে দেখিতে মরিব! তাহাকে বলিব, 'দেখ, তোমার জন্যই আমি এই প্রাণ বিসর্জন করিলাম।' হয়তো সে আমাকে বাঁচাইবার জন্য ইহার একটা উপায়ও করিতে পারে। অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া, ঘোরতর যাতনায় ব্যথিত হইয়া, ভূত সেদিন সকাল সকাল বাড়ি ফিরিয়া আসিল। আমীর জানিতেন, কি ঘটনা ঘটিবে, তাই তিনিও সেদিন স্ত্রীর নিকট হইতে সকাল সকাল বিদায় লইয়া আপনার ঘরে গিয়াছিলেন। ভূত কিন্তু আপনার ঘরে আসিয়াই সেইখানে শুইয়া পড়িল। শরীর এতই বিকল হইয়াছিল যে, সেখান হইতে নড়িতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সেইখানে পড়িয়া ক্রমাগত উঃ আঃ করিতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত শরীর হিমাঙ্গ হইয়া গেল। সমুদয় গ্রন্থি শিথিল হইতে লাগিল, লিগেমেণ্ট সমস্ত আলগা হইল শরীরে জয়েণ্ট সব একেবারে খুলিয়া গেল, হাড়ের সন্ধি সমুদয় একে একে খসিয়া গেল, যাবতীয় অস্থি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়িল। উত্থানশক্তি-রহিত। ঘোর বেদনায়, ঘোর যাতনায় লুলু পড়িয়া রহিল। প্রভাত হইলে, হাসিতে হাসিতে হাত ধরাধরি করিয়া, আমীর ও আমীর-রমণী আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। আমীর বলিলেন,—"কি হে বাপু! সভ্য ভব্য নব্য ভূত! পুরাতন কথাটা কি কখনও শুন নাই?" —'থোড়া থোড়া কর্‌কে খাও মুঝে, ময় লণ্ডু কড়ুয়া। আর জরু বেচো, গরু বেচো, মুঝকো লাও ভেড়ুয়া।'

ইহার অর্থ এই, আফিম বলিতেছেন, "অল্প অল্প করিয়া আমাকে প্রথম খাও ; কেননা, আমি তিত লাগি। এখন ভেড়ুয়া। স্ত্রী বিক্রয় কর, কি গরু বিক্রয় কর, বিক্রয় করিয়া যেখান হইতে পাও আমাকে লইয়া আইস।" ভূত চিঁচিঁ করিয়া বলিল, —"এ বিপদের সময় মুখনাড়া দিচ্ছিস তুই আবার কে ?" আমীর বলিলেন—"আমি আমীর, এই রমণীর স্বামী, যাহাকে তুই নিদারুণ ক্লেশ দিয়াছিস। তাই, আজ তোর যাতনা দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিতেছি।" ভূত বলিল, —"তোমার জরু তুমি ফিরিয়া লও, অমন জরুতে আমার কাজ নাই, বাবা! ওতো জরু নয়! সুখে স্বচ্ছন্দে ভূতগিরি করিতেছিলাম, এ কি বাপু! ভূতের আবার চণ্ডু খাওয়া কি ? ঐতো আমাকে চণ্ডুতে মজাইল। এখন তোমার কাছে যদি আফিম কি চণ্ডু থাকে তো দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। ধড়ে প্রাণ আসিলে তোমার স্ত্রীকে এবং তোমাকে ঘরে লইয়া যাইব। কেবল ঘরে রাখিয়া আসিব না, এখন দেখিতেছি আমাকে চিরকাল তোমার গোলামি করিতে হইবে। চণ্ডু না পাইলে তো আর বাঁচিব না। সুতরাং, চণ্ডুর জন্যই তোমার গোলামি করিতে হইবে। দুইবেলা চণ্ডু দিয়ো। যাহা বলিবে তাহাই করিব, তোমার সংসারে ভূতের মতো খাটিব।" আফিমের মহিমা আমীর ভালরূপেই জানিতেন। তিনি বুঝিলেন, লুল্লু যাহা বলিতেছে তাহা প্রকৃত কথা। প্রতারণা ইহাতে কিছুই নাই। পকেট হইতে বাহির করিয়া প্রথমে তাহাকে একটু কাঁচা আফিম খাইতে দিলেন। ইহাতে ভূতের শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। শরীরের অস্থিসমুদয় পুনরায় যে যাহার স্থানে গিয়া জোড়া লাগিল। তখন সে উঠিয়া বসিল। তারপর আমীর তাহাকে চণ্ডু পান করিতে দিলেন। তাহাতে তাহার দেহে পুনরায় প্রাণ-সঞ্চার হইল, শরীর স্বচ্ছন্দতা লাভ করিল। লুল্লু তখন আমীরের পদতলে পড়িয়া বলিল,—"মহাশয়! আপনার নিকট আমি ঘোর অপরাধে অপরাধী, বড়ই দোষ করিয়াছি, কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মার্জনা করুন। বড়ই নিদারুণ ক্লেশ হইতে আপনি আমাকে মুক্ত করিলেন। আপনার ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না। চিরকাল দাসানুদাস হইয়া আপনার এবং এই

বিবিজীর সেবা করিব। এখন সকাল সকাল্ আহারাদি করিয়া লউন। আজই রাত্রিতে আপনাদিগকে ঘরে লইয়া যাইব।” আমীর ও আমীরের রমণী তখন সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যার পর ভূত অসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইল। দুই জনে লুল্লুর পিঠে বসিলেন। জল হইতে বাহির হইয়া লুল্লু আকাশ-পথে উঠিল। তড়িৎবগে আকাশ-পথে চলিতে লাগিল। প্রায় রাত্রি দুই প্রহরের সময় সকলে দিল্লী নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। আমীরের ছাদে গিয়া ভূত ইঁহাদিগকে নামাইয়া দিল। আমীর ফকির-বেশে গৃহত্যাগ করিবার সময় ঘরে চাবি দিয়া গিয়াছিলেন। চাবি খুলিয়া স্ত্রী-পুরুষে ঘরে প্রবেশ করিলেন। লুল্লুর জন্য একটি ঘর নির্দেশ করিয়া বলিলেন’ “লুল্লু! এই ঘরটি তোমার, তুমি এই ঘরে থাকিবে। আফিম কি চণ্ডু যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে দিব।” লুল্লু বলিল—“হঁা, এ জনমে আপনাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।” পরদিন প্রাতঃকালে আমীর প্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা তাঁহাদিগকে শুনাইলে। আমীর বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া সকলে সুখী হইলেন।

দশম অধ্যায়

লুচি

যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেলে লুল্লু ও আমীর দুইজনে একসঙ্গে শুইয়া মনের সুখে অনেক্ষণ ধরিয়া চণ্ডুপান করিলেন। এইরূপে ভূতে মানুষে ক্রমে বড়ই ভাব হইল। একদিন চণ্ডু খাইতে খাইতে আমীর বলিলেন,—“হে লুল্লু! হে চণ্ডুসেবক-কুল-তিলক! আমার বড় সাধ হইতেছে যে, পুনরায় বন্ধুদিগের সহিত একবার সাক্ষাৎ করি,—যাঁহারা স্ত্রী-উদ্ধার-বিষয়ে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন তুমি আমার শত্রু ছিলে, এখন কিরূপ প্রাণের মিত্র হইয়াছ, তাহাও তাঁহারা একবার অসিয়া দেখুন। প্রথম হইতেছেন সেই জান্, যিনি

বলিয়া দিয়াছেন যে, তুমি আমার স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছ। তারপর সেই ব্রহ্মণ, যাঁহার মত রোজা এ ধামে কখনও হয় নাই, হবে না। তারপর আমাদের তাঁতি-ভায়া, যাঁর মতো সঙ্গীত-বিদ্যা বিশারদ পৃথিবীতে হয় নাই, হবে না। তারপর সেই কলুর পো, যাঁর মতো তৈলণিষ্পীড়ক জগতে হয় নাই, হবে না। আর যদি ভূতদিগকে আনিতে পার, তাহা হইলে তো বড়ই সন্তুষ্ট হই। সেই ভূত তত্ত্ববিৎ মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণের ভূত, সেই অমানুষিক অভৌতিক প্রেমিক ঘ্যাঘোঁ, আর সেই ভাবী সম্পাদক তৈলপ্রদায়ক গোঁগাঁ! তোমার গেটে দাদার সহিত আলাপ পরিচয় করিতেও আমার বড়ই ইচ্ছা। আর একটি কথা—আহা! ঘ্যাঘোঁর বিবাহ হয় নাই, তাহার সেই নাকেশ্বরীকে আনিয়া যদি দুই জনে মিলন করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড়ই সন্তুষ্ট হই।"

লুল্লু বলিল,—"আপনার সমুদয় আদেশ পালন করিতে আমি সমর্থ। আমি এই রাত্রিতেই সকলকে এখানে আনিতেছি।"সন্ধ্যার সময় ভূত ঘর হইতে বাহির হইল। রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে জান্, ব্রাহ্মণ, তাঁতি ও কলুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমীর সকলকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন! তিনি আপনার বিবিকে পাইয়াছেন শুনিয়া সকলে পরম সুখী হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লুল্লু পুনর্বার আকাশ-পথে যাত্রা করিয়া ব্রাহ্মণের ভূত, ঘ্যাঘোঁ, গোঁগাঁ ও সভ্য ভব্য নব্য গেঁটে দাদাকে লইয়া আসিল। ঘ্যাঘোঁর মনোহর নাক-ধারিণী বিশ্ব বিমোহিনী সেই ভূতিনীকেও আনিয়া দিল। ভূতিনী অন্তঃপুরে আমীর-পত্নীর নিকট অন্দরে গমন করিলেন। পুরুষমানুষ ও পুরুষ-ভূত সকলে বৈঠকখানায় উপবেশন করিলেন। পরস্পরে আলাপ পরিচয় হইলে, আমীর অনুনয়-বিনয় করিয়া সকলকে বলিলেন, —'মহোদয়গণ! আজ রাত্রিতে আমার এ গরীব-খানাতে পদার্পণ করিয়া আপনারা বড়ই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমার মনে একটি বাসনা বড়ই প্রবল হইয়াছে, আপনারা তাহা শ্রবণ করুন। বড় ইচ্ছা, নাকেশ্বরীর সহিত ঘ্যাঘোঁর বিবাহকার্য আজ রাত্রিতেই সমাধা করি। গোঁগাঁ যে ঘ্যাঘোঁর নামে মিথ্যা কুৎসা করিয়াছিল, তাহা আমার পত্নী, নাকেশ্বরীর মাসীরে উত্তমরূপে

বুঝাইয়া দিয়াছেন। গোঁগাঁও এ কথা এখন স্বীকার করিতেছে। নাকেশ্বরীর মাসী বিবাহে সম্মতিদান করিয়াছেন, এখন আপনাদিগের কী মত? সকলেই একবাক্য হইয়া বলিলেন,—"তথাস্তু, শুভকার্যে বিলম্বে প্রয়োজন নাই।" তখন আমীর,— লুল্লু প্রভৃতি ভূতদিগকে পৃথিবীর সমস্ত ভূত নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে বলিলেন। কিন্তু উপস্থিত ভূতগণ সকলেই মৌন হইয়া রহিল। আমীরের আদেশ পালনে কেহই তৎপর হইল না। আমীর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অমি কি তোমাদিগকে কোন দুঃসাধ্য কার্য করিতে অনুরোধ করিয়াছি? পৃথিবীর সমস্ত ভূত নিমন্ত্রণ করা কি তোমাদের অভিপ্রেত নয়?" লুল্লু উত্তর করিল,— "মহাশয়! আপনি যেরূপ সদাশয় লোক, তাহাতে আপনার সমস্ত অদেশই আমাদের শিরোধার্য। তবে কি না, আমরা ভারতীয় ভূত, ভারতের বাহিরে আমরা যাইতে পারি না। সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকুল ভ্রষ্ট হইব। আমাদের ধর্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা। যেরূপ অপক্ক মৃত্তিকাভাণ্ড জলস্পর্শে গলিয়া যায়, সেইরূপ সমুদ্র-পারের বায়ু লাগিলেই আমাদের ধর্ম ফুস করিয়া গলিয়া যায়, তাহার আর চিহ্নমাত্র থাকে না, ধর্মের গন্ধটি পর্যন্ত আমাদের গায়ে লাগিয়া থাকে না। কেবল তাহা নহে, পরে আমদের বাতাস যাঁহার গায়ে লাগিবে, দেবতা হউন কি ভূত হউন, নর হউন, কি বানর হউন, তিনিও জাতিভ্রষ্ট হইবেন। যার পক্ষে যেরূপ ব্যবস্থা,—দিবারাত্রতাঁহাদিগকে পঞ্চামৃত খাইতে হইবে, কিংবা কল্‌মা পড়িতে হইবে, তবে তাঁহাদের ধর্মটা টায়টোয়ে বজায় থাকিবে। আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, এখন যেরূপ অনুমতি হয়।" আমীর বলিলেন,—"তবে আর অত আড়ম্বরের আবশ্যক নাই। ভারতীয় ভূত-সমাজকেই কেবল নিমন্ত্রণ কর।"

নানাবিধ চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পান-ভোজনের সামগ্রীরও আয়োজন হইল। মুহূর্তের মধ্যে ভূতেরা অনেক লুচি, অনেক সন্দেশ, অনেক দধি জমা করিয়া ফেলিল। নগরবাসী অনেক লোককে আমীর সেই রাত্রিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমাগত হইলে, আহার্য

দ্রব্যসামগ্রীর সমুদয় আয়োজন হইলে মহাসমারোহে নাকেশ্বরীর সহিত ঘ্যাঘোঁর বিবাহ-কার্য সমাধা হইল। আমীর নিজে কন্যাদান করিলেন, ব্রাহ্মণটি পুরোহিত হইলেন। বিবাহে মন্ত্র তিনি জানিতেন না সত্য কিন্তু একটি দীর্ঘ ফোঁটা কাটিয়া ওঁ আং করিয়া কোন রকমে সে-রাত্রির কার্য সারিলেন। পূর্ণযৌবনা ভূতকামিনী ঘ্যাঁঘোঁপত্নীর রূপমাধুরী দেখিয়া সকলেরই মন বিমোহিত হইল। একমনে অনিমিষনয়নে সকলে সেই রূপ দেখিতে লাগিলেন।...বরকে সকলে বলিলেন,—ঘ্যাঁঘোঁ! তুমি অতি ভাগ্যবান্ পুরুষ যে, এরূপ অমূল্য কন্যারত্নকে লাভ করিলে।" ঘ্যাঁঘোঁ চক্ষু ঠারিয়া ঈষৎ হাসিলেন। বর কিনা! অধিক কথা তোআর কহিতে পারেন না। তবে সেই ঠার, সেই হাসির অর্থ এই— "আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম, ও রূপ দেখিয়া কার প্রাণ সুস্থির থাকিতে পরে? নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আহারাদি-ক্রিয়াও উত্তমরূপে সমাধা হইল। যিনি যত পারিলেন, লুচি ও সন্দেশ তুলিলেন, ও পুঁটলি বাঁধিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। সভাস্থলেই বাসর-ঘর হইল। বাসর ঘরে গান গাহিবার জন্য সকলে একবাক্য হইয়া তাঁতিকে অনুরোধ করিলেন। পুলকে পুলকিত হইয়া, সহস্র সহস্র শ্রোতার সম্মুখে তাঁতি সেই রাত্রিতে মনের সুখে গান করিলেন। শ্রোতারা একদৃষ্টে তাঁহার মুখভঙ্গিমা দেখিয়াই আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন। গানের কণামাত্র কাহারও কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল না। আমীরের অনুরোধে দিল্লীর আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সেইরাত্রিতে সাবধান হইয়াছিলেন। তূলা দিয়া সকলেই কান একেবারে বন্ধ করিয়াছিলেন। সেই রাত্রিতে নৃত্যেরও অভাব হয় নাই, ভূতিনীরা দলে দলে কতই যে নাচিল, তা আর কী বলিব। প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে মজলিস ভাঙ্গিল। তখন লুল্লু—জান্, ব্রাহ্মণ, তাঁতি ও কলুকে ঘরে রাখিয়া আসিলেন। নগরবাসীরা যে যাহার ঘরে চলিয়া গেলেন।

একাদশ অধ্যায়

লেখকদল সাবধান

ভূত ও ভূতিনী সকল বিদায় হইবার পূর্বে আমীরকে তাহারা বলিল,—"মহাশয়! আপনার সদাচারে আমরা বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। যদি কোনো বিষয়ে আপনার উপকার করিতে পারি তো বলুন, আমরা বড়ই সুখি হইব।" আমীর বলিলেন,—"আমার উপকার করিতে যদি নিতান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাদের বাসনা আমি পূর্ণ করিব। এখান হইতে চারি ক্রোশ দূরে যমুনার কূলে আমার অনেক ভূমি ছিল; তাহার আয় হইতে পুরুষ-পুরুষানুক্রমে আমাদিগের রাজার হালে চলিত। সেই ভূমি এক্ষণে যমুনার জলপ্লাবনে একেবারে বালুকাময় হইয়া গিয়াছে। তাহা হইতে তোমরা যদি বালুকা সব তুলিয়া ফেলিতে পার, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হয়।" ভূতেরা বলিল,—"যে আজ্ঞে, আমরা এই ক্ষণেই করিতেছি। এই বলিয়া যত ভূত সেই মুহূর্ত ভূমির নিকট গেল এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সমুদয় বালি উঠাইয়া ফেলিল। ভূমি পূর্বের মত উর্বর ও ফলশালী হইল। তখন তাহারা আমীরের গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বিদায় লইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। আমীর কিন্তু গোঁগাঁকে যাইতে নিষেধ করিলেন। তাহাকে বলিলেন,—"গোঁগাঁ! তুমি যাইয়ো না। তোমার অস্থিমজ্জা সমুদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আফিম আর দুধ, এই দুই বস্তু নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে তেমার শরীর পুনর্গঠিত হইতে পারে। যেহেতু আফিম অতি অপূর্ব পদার্থ, ইহা সেবন করিলে মানুষ যে বয়সে খায়, সেই বয়সেই চিরকাল থাকে, শরীরের কোষ সমুদয় ধ্বংস হয় না, ম্যালেরিয়া-বিষ-জনিত জ্বর ইহার নিকটে আসে না। কি মনুষ্যের, কি ভূতের, ইহা সেবন করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। অতএব, তুমি লুল্লুর নিকট অবস্থিতি কর। চণ্ডুপান করিতে অভ্যাস কর।" গোঁগা তাহাই স্বীকার করিল। এইরূপে আমীর স্ত্রীকে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই লুল্লু গণ্যমান্য সকলের নিকট প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। একটু আধটু যাঁহারা নেশা করিতেন, সকলেই তাঁহার প্রতি মুগ্ধ। স্ত্রীলোক দেখিলে তিনি 'মা' বলিয়া ভিন্ন কথা কহিতেন না। চণ্ডুর মোহিনী শক্তি প্রভাবে তাঁহার বিকৃত আকার ক্রমে সুঠাম হইয়া উঠিল। নব্য না হউন, সত্য সত্যই তিনি একজন সভ্য ভূত হইলেন। চণ্ডুর সহিত দুধ-ঘি খাইয়া তাঁহার রং যথার্থই ফরসা হইয়া উঠিল। তবে তাঁহার দোষ এই, নেশাখোর ভিন্ন অপরের সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতেন না। যাহা হউক, এত পোষ মানিয়াছিলেন যে, আমীর-রমণী তাঁহাকে দেখিয়া আর কিছু মাত্র লজ্জা বা ভয় করিতেন না। আমীরের অবস্থা ভাল হইলেও, লুল্লু তাঁহাকে গাড়ি করিতে দেন নাই। তাঁহার যেখানে যাইবার আবশ্যক হইত, তিনি পিঠে করিয়া লইয়া যাইতেন। তাহার পিঠে চড়িয়া আমীর-রমণী কতবার বাপের বাড়ি গিয়াছেন। লুল্লুকে সর্বদা এখানে-সেখানে যাইতে হইত বলিয়া তিনি স্বর্ণকারের দ্বারা দুইখানি পাখা গড়াইয়া লইয়াছিলেন কোথাও যাইতে হইলে ঐ দুইখানি পাখা পরিয়া উড়িয়া যাইতেন, তাহাতে তাহাকে দেখাইত ভাল, আর তাহা পরিয়া অনেক দূরে গেলেও শ্রম হইত না। একবার সমুদ্র দেখিতে আমীর-রমণীর বড়ই সাধ হইয়াছিল। লুল্লু এ কথা শুনিয়া বলিলেন —"তার ভাবনা কি? আমার পিঠে চড়। আমার মাথাটি ভাল করিয়া ধর, আমি সমুদ্র দেখিইয়া আনিতেছি।" এই প্রকারে তিনি আমীররমণীকে সমুদ্র দেখাইয়া আনিলেন।

কিছুদিন পরে গোঁগাঁর শরীর পুনরায় সবল হইলেই আমীর তাহাকে বলিলেন, —"গোঁগা! আমি তোমার কাছে যাহা স্বীকার করিয়াছি' তাহা করিব। একখানি খবরের কাগজ খুলিব, তাহার সম্পাদক হইবে তুমি।" যথাসময়ে আমীর একখানি সংবাদপত্র বাহির করিলেন। একে ভূত সম্পাদক. তাতে আবার চণ্ডুখোর ভূত —গুলির চৌদ্দপুরুষ। সে-সংবাদপত্রের সুখ্যাতি রাখিতে পৃথিবীতে আর স্থান রহিলনা। সংবাদপত্রখানি উত্তমরূপে চলিতে লাগিল, তাহা হইতেও আমীরের বিলক্ষণ দুই পয়সা লাভ হইল।

গোঁগাঁ যে কেবল আপনার সংবাদপত্রটি লিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা নহে। সকল সংবাদপত্র আফিসেই তাঁহার অদৃশ্যভাবে যাতায়াত আছে। অন্যান্য কাগজের লেখকেরা যখন প্রবন্ধ লিখিতে বসেন, তখন ইচ্ছা হইলে কখনও কখনও গোঁগাঁ তাঁহাদিগের ঘাড়ে চাপেন। ভূত গ্রস্ত হইয়া লেখকেরা কত কী যে লিখিয়া ফেলেন, তাহার কথা আর কী বলিব। তাই বলি, লেখকদল! সাবধান!

নয়নচাঁদের ব্যবসা

প্রথম পর্ব

আঠারো

নয়ন-চাঁদের বাড়ি ফরাশডাঙ্গা। নয়নচাঁদ গুলি খাইয়া থাকেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা, নয়ন, লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বন্ধুগণ আড্ডায় বসিয়া নিত্য-ক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। ক্রিয়াটির গুণ এই যে, মাঝে মাঝে মজার মজার কথা চাই। তাহা না হইলে, প্রাণে ততটা আয়েস হয় না।

তাই, লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নয়ন! আজকাল তোমার কিছু সুখ সাওয়াল দেখিতেছি। চিনির জলে আব সে তোমার সোলা নাই। এখন সন্দেশটুকু রসগোল্লাটুকু এ না হইলে আর তোমার চা'ট হয় না। মুখে একটু তোমার কান্তি বাহির হইয়াছে, শরীর লাবণ্য দেখা দিয়াছে, গায়ে তোমার তেলা মারিয়াছে। যকের টাকা পাইয়াছ না কি?"

আর সকলেও বলিয়া উঠিলেন,—"সত্যি হে! ব্যাপারখানা কী, বল দেখি নয়ান! গুলিখোর বলিয়া তোমাকে আর চেনা যায় না। স্বয়ং মা লক্ষ্মীকে বাঁটিয়া যেন তুমি মুখে মাখিয়াছ। নয়ান! কিসে তোমার কপাল ফিরিল, তাহা বল।"

নয়ন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বিশেষ চিন্তা করিয়া, অবশেষে, বাজখাঁই স্বরে বলিলেন,—"আড্ডাধারী মহাশয়! ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, ইঁহারা হিন্দু কি মুসলমান?"

গগন বলিলেন'—"ধান ভানিতে শিবের গীত। কোথাকার কথা কোথা! মুসলমান কেন আমরা হইতে গেলাম? কবে তুমি কাকে কাছা খুলিয়া নামাজ পড়িতে দেখিয়াছ যে, ফট্ করিয়া এমন কথা জিজ্ঞাসা করিলে? নয়ান! আজ তুমি আর অধিক ছিটে টানিও না, তোমার হেড খারাপ হইয়া গিয়াছে।"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"চট কেন ছাই। কথাটা যখন বলিলাম, তখন অবশ্য তাহার মানে আছে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিলে যে, আমার সংসার সচ্ছল কিসে হইল? যদি সব কথা খুলিয়া বলি, হয় তো তোমরা হাসিয়া উঠিবে। তাহার চেয়ে না বলাই ভাল। আজকাল আমার হইল ধর্মগত প্রাণ। বন্ধু হইলে কি হয়? তোমাদের মতিগতি অন্যরূপ। কিসে আমার দু পয়সা হইল, তাহা আমি তোমাদিগকে বলিতে চাই না! আর তোমরাও জিজ্ঞাসা করিয়ো না।"

নয়নের কথায় সকলের ঘোরতর কুতূহল জন্মিল। কিসে নয়নের পয়সা হইল, এ-কথাটি শুনিবার জন্য সকলের প্রাণ বড়ই উৎসুক হইল। বলিবার জন্য নয়নকে সকলে বার বার অনুরোধ করিলেন। নয়ন কিছুতেই বলেন না। অবশেষে স্বয়ং আড্ডাধারী মহাশয় আসিয়া অনুরোধ করিলে, নয়ন বলিতে লাগিলেন।

নয়ন বলিলেন,—"আমি বলি। কিন্তু যাহা বলিব, তাহা শুনিয়া যদি হাসো, কি ঠাট্টা-বিদ্রূপ কর, তাহা হইলে জানিব যে, তোমরা বন্ধু নও, তোমরা মুসলমান, নাস্তিক, শাক্ত, কৃষ্টান, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী,—আর কি নাম করিতে বাকি রহিল, আড্ডাধারী মহাশয়?

আড্ডাধারী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"আর কি বাকি আছে? বাকি আর কিছুই নাই। সে যে-ব্রাহ্মণ-দেবতা বলিয়াছিলেন,—'ওরে আঁটকুড়োর বেটারা। যদি সতেরো পর্যন্ত বলিলি, তবে আর আঠার-র বাকি কি রাখিলি?' ছেলেরা কেবল সতেরো পর্যন্ত বলিয়াছিল: তা নয়ান। তুমি সতেরো ছাড়িয়ে উনিশ পর্যন্ত উঠিয়াছ। বাকি আর কিছু রাখ নাই। হিন্দু, ব্রহ্মজ্ঞানী, কৃষ্টান যা কিছু আছে সব বলিয়াছ।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন'—"ব্রাহ্মণ কারে গালি দিয়াছিল, আর এ সতরো, আঠারোর মানে কি?"

আড্ডাধারী মহাশয় উত্তর করিলেন,—"এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আঠারো বলিলে খেপিতেন। দেখা পাইলেই ছেলেরা তাই তাঁকে আঠারো বলিয়া খেপাইত। গালি তো যা মুখে আসিত তা দিতেন, তাছাড়া ইট পাটকেল, যাহা কিছু সম্মুখে পাইতেন তাহা ছুড়িয়া সেই

ব্রাহ্মণদেবতা ছেলেদের মারিতেন। একদিন এক পুষ্করিণীতে ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন। কতকগুলি ছেলেও সেই পুকুরে স্নান করিতেছিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আঠারো বলিবার নিমিত্ত ছেলেদের মুখ চুলকাইয়া উঠিল। কিন্তু ভয়! ছেলের গন্ধ পাইয়াই রাগে ব্রাহ্মণের গা গশ গশ করিতেছিল, জবাফুলের মতো চক্ষু করিয়া মাঝে মাঝে তিনি কট্‌মট্‌ করিয়া ছেলেদের পানে চাহিতেছিলেন। একবার আঠারো বলিলে হয়! মনে মনে ভাবটা তাঁর এইরূপ। বড়ই বিপদ! আঠারো না বলিলেও নয়, ও-দিকে ব্রাহ্মণের এইরূপ উগ্রশর্ম মূর্তি। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একজন বালক হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—'ভাই! এ পুকুরপাড়ে কয়টা তালগাছ আছে? এই কথা বলিতেই অপর সব বালকেরা গুণিতে আরম্ভ করিল—এক, দুই ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭।—এতক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। ছেলেরা যেই সতেরো বলিল, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ একেবারে রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—'তবে রে আঁটকুড়োর বেটারা। আর বাকি রইলো কি? যদি সতেরো পর্যন্ত বলিলি তবে আর আঠারোর বাকি রাখিলি কি? এই বলিয়া নানারূপ গালি দিয়া ব্রাহ্মণ ছেলেদের মারিতে দৌড়িলেন। ছেলেরা পুষ্করিণী হইতে উঠিয়া যে যেদিকে পারিল, ছুটিয়া পলাইল। তাই বলিতেছি, নয়ান! তুমি আমাদিগকে কৃষ্টান বলিলে, শাক্ত বলিলে, বৈষ্ণব বলিলে, মায় ব্রহ্মজ্ঞানী পর্যন্ত বলিলে। বাকি আর কী রহিল? আঠারো ছাড়িয়া উনিশ, বিশ পর্যন্ত হইয়া গেল!"

নয়ন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। নয়নের মন কিছু নরম হইল। নয়ন বলিলেন,—না, না, তোমাদের আমি ওসব কথা বলি নাই। শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, কৃষ্টান কি তোমাদের আমি বলিতে পারি? আমি বলিয়াছি যে, যে আমার কথা বিশ্বাস না করিবে, সে তাই।"

দ্বিতীয় পর্ব

কপাৎ

নয়ন বলিলেন,—"মনের মিল থাকে, তবে বলি ইয়ার। তোমারা হিন্দু হও, আমিও তাই। মুসলমান হও, আমিও তাই। তোমরা যে ঠাকুরগুলি মানিবে, আমিও সেগুলিকে মানিব, আমিও যে ঠাকুরগুলিকে মানিব, তোমাদেরও সেগুলিকে মানিতে হইবে। তা না হইলে মনের মিল রহিল কোথায়?"

সকলেই বলিলেন—ঠিক! ঠিক! নয়ান বলিতেছে ভাল। আমাদেরও ঐ মত।"

নয়ন বলিলেন,—"আমি হক্ কথা বলিব। আজ আমার অবস্থা একটু ফিরিয়াছে বলিয়া, পুরাতন বন্ধুদের আমি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিব না; তবে দেশের হাওয়া বুঝিয়া আমি তোমাদিগকে কাজ করিতে বলি। আজকাল দেশে যেরূপ হাওয়া বহিতেছে তাতে সেকালের মতো আর হাবড়হাটি ব্রহ্মজ্ঞানী তেত্রিশ কোটি দেবতার পায় তেল দিলে চলিবে না উহারই মধ্যে দুই-চারিটি মাথালো মাথালো দেবতা বাছিয়া লইতে হইবে। পূজা দিতে হয়, সেই দুই-চারটি দেবতার দাও। আর সব দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া থাকেন, থাকুন! ঘরের ভাত বেশি করিয়া খাবেন।"

সকলেই বলিলেন,—"ঠিক! ঠিক! কথা! হাবড়তাবড় তেত্রিশ কোটির চাল-কলা যোগায় কে হে, বাপু! পূজা না পাইয়া মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাকে, থাক! বেচারি গুলিখোরদের যে পুঁটি মাছের প্রাণ, সে-টি তো বুঝিতে হবে? উহার মধ্যে দু-একটি বাছিয়া লও, লইয়া বকি সব না-মঞ্জুর করিয়া দাও।"

নয়ন বলিলেন,—"আমারও ঠিক ঐ মত ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি দুইটি দেবতা বাহির করিয়াছি, এক গেলেন, কাটিগঙ্গা, আর এক হইলেন ফণীমনসা বাকী সব না-মঞ্জুর।"

সকলেই একবাক্য হইয়া সায় দিলেন। সকলেই স্বীকার করিলেন

যে, এই দুইটি দেবতাই অতি চমৎকার দেবতা। আর সমুদয় দেবতাকে না-মঞ্জুর করিয়া, মাটিতে মাথা ঠুকিয়া, এই দুইটি দেবতাকে সকলে প্রণাম করিতে লাগিলেন। মাটিতে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে সকলে বলিলেন,—"হে মা কাটিগঙ্গা! হে বাবা ফণীমনসা! তোমাদের পায়ে গড়। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ।'

নয়ন পুনরায় বলিলেন,—"কিন্তু এখনও আসল দেবতাটির কথা বলা হয় নাই। শেষে বলিব, তাই মনে করিয়া সেটি বাকি রাখিয়াছি, সে-দেবতাটি, মা শীতলা। তাঁরই বরে আমার সুখ, সম্পত্তি, আর আমার ঐশ্বর্য। সাবধান! কাঁচা-খাওয়া দেবতা!"

সকলেই বলিলেন,—"সাবধান! কাঁচা খাওয়া দেবতা!"

নয়ন বলিলেন, —"এ বাপু ঘেঁটু নয়, 'পেঁচো নয়' তোমার মাণিকপীর নয়। এ মা শীতলা! ইংরেজী খবরের কাগজে পর্যন্ত মার নাম বাহির হইয়াছে। মার বরে আমার সব।"

শীতলার নাম শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত। ভয়ে সকলের প্রাণ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। আর-একটু আগে তেত্রিশ কোটি দেবতা না-মঞ্জুর হইয়া গিয়াছিল। আড়াল হইতে পাছে শীতলা সে-কথাটি শুনিয়া থাকেন, এইভয়ে সকলের মনে ঘোরতর আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে গগন একটু সাহসী পুরুষ ছিলেন। অতি সাহসে ভর করিয়া গগন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী করিয়া হইল, ভাই? তুমি আট পয়সার চিনি-জলে সোলা ফেলিয়া, সেই সোলাটি চুষিয়া চা'ট করিতে। তা ঘুচিয়া আজ তোমার সন্দেশ-রসগোল্লা কী করিয়া হইল, ভাই?

নয়ন বলিলেন,—"হাঁ! এখন পথে এস! পূজা মানো তো সব কথা খুলিয়া বলি, তা না হইলে নয়ান এই চুপ!"

এই কথা বলিযা নয়ন "কপাৎ" করিয়া মুখ বুজিলেন। যার যেমন ক্ষমতা সকলে শীতলার পূজা মানিলেন। নয়ন তখন পুনরায় মুখে চাবি খুলিয়া আপনার কথা আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় পর্ব

এই কিল তো এই কিল!

নয়ন বলিতেছেন,—"এবার আমার বড়ই দুর্বৎ-সর পড়িয়াছিল। খাওয়া কোনোদিন হয়, কোনোদিন হয় না। ভাগ্যক্রমে এমন সময় কলিকাতায় বসন্তের হিড়িকটি পড়িল। পরে যিনি যা করুন্, কিন্তু ফিকিরটি আমিই প্রথমে বাহির করি। জলা হইতে দিব্য একটু এঁটেল মাটি লইয়া আসিলাম। তাই দিয়া চমৎকার একটি শীতলা গড়িলাম। শীতলা গড়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। গোল করিয়া মাটির একটি চাবড়া করিলেই হইল। তাহার উপর উত্তমরূপে সিন্দুর মাখাইলাম। টানাটানা লম্বা লম্বা দুইটি চক্ষু করিলাম। পুরাতন রাঙতা দিয়া শীতলাটি ছোট বড় বসন্তে ছাইয়া ফেলিলাম। শীতলাটি হাতে করিয়া গিন্নীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় চলিলাম।

"সেখানে উপস্থিত হইয়া একস্থানে শুনিলাম যে, একজন শীতলার পাণ্ডা ছিল। বসন্তরোগে তাহার তিনটি ছেলে মরিয়া গিয়াছে। রাগ করিয়া লাঠি দিয়া সে তাহার শীতলা ভাঙ্গিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। সন্ধান করিয়া সে যে খোলার ঘরে থাকিত, আমি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার সেই ঘরটি ভাড়া করিলাম। বাড়িওয়ালী ও আশে পাশের লোককে বলিলাম যে, মা আমাকে স্বপ্ন দিয়াছেন। যে, ঐ যে, পাণ্ডা ছিল, সে ভাল করিয়া মা'র পূজা করিত না। লোকে পূজা দিলে, সে আগে থাকিতে নৈবিদ্যির মাথার মণ্ডাটি খাইয়া ফেলিত। মা তার উপর কুপিত হইয়া তাহাকে নির্বংশ করিয়াছেন। সেই দুরাচারের পরিবর্তে আমাকে সেবাদাস নিযুক্ত করিয়াছেন। তখন চারিদিকে খুব ডামাডোল খুব মহামারী, লোক মরিয়া উড়কুড় উঠিতেছে। ভয়ে লোক কাঁটা হইয়া রহিয়াছে। আমাকে পাইয়া সকলের প্রাণটা আশ্বস্ত হইল। সকলেই বলিল যে,—মা জাগ্রত বটে! একজন পাণ্ডা যাইতে-না-যাইতে, কোথা হইতে শীতলা হাতে করিয়া আর-একটি পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইল। আর আমাদের কোনো ভয় নাই।'

"পাড়ায় আমার বিলক্ষণ পসার-প্রতিপত্তি হইল। পাড়ার পূজাতেই অনায়াসে আমার সব খরচ নির্বাহ হইতে পারিত। কিন্তু অভিপ্রায় আমার তো আর তা নয়! আমার অভিপ্রায় যে, মরসুম থাকিতে থাকিতে দু-পয়সা রোজগার করিয়া পুনরায় ইয়ার-বক্সির কাছে ফিরিয়া আসি। কলিকাতার আড্ডাগুলি সাহেবেরা সব উঠাইয়া দিয়াছেন। সেখানে আমার মন টিকে না। তাই, শীতলাটি হাতে করিয়া প্রতিদিন ভিক্ষায়ও বাহির হইতাম। তাই কি ছাই শীতলাগান জানি! কিন্তু চিরকাল হইতে আমি দশকর্মা; যে-কাজে দাও, সেই কাজে আছি, সব কাজে হুনহর। নিজেই একটি শীতলার ছড়া বাঁধিলাম, কতকটা বলি, শুন—

"শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই।
ছেলে বুড়ো আণ্ডা বাচ্ছা টপ্ টপ্ খাই॥
চৌষট্টি হাজার এই বসন্তের দল।
গৃহস্থের ঘরে গিয়া দেয় রসাতল॥
বড় বসন্ত ছোট বসন্ত বসন্তের নাতি।
কারো ঘরে নাহি রাখে বংশে দিতে বাতি॥
ডেকে বলে যত ঐ কাল বসন্তের পাল।
পাঁটা ছাড়া করে ছাড়াই লোকের গায়ের ছাল॥
ফাটা বসন্ত বলে আমরা কেও-কেটা নই।
ফেটে মরে মানুষ যেন তপ্ত খোলার খই॥
নেচে নেচে বলে ওই ধসা বসন্ত যত।
মাংস পচা গন্ধে প্রাণ করি ওষ্ঠাগত॥
পাতাল-মুখো বসন্ত বলে নীচে করে মুখ।
হাড় মাস খেয়ে আমরা প্রাণে পাই সুখ॥
খুদে বসন্ত বলে তোমরা মিছে কর গোল।
আমার চোটে লোকের গা ফুলে হয় ঢোল॥
হাড়ভাঙ্গা বসন্ত বলে যারে যেথা পাই।
ছেলে বুড়ো সব আমরা কাঁচা ধরে খাই॥

শীতলা বলেন আমি চা'ল পয়সা চাই।
না দিলে ছেলের মার আর রক্ষা নাই॥
চা'ল পয়সা আনো হবে পূজার বাজার।
বসন্ত ধরিবে নয় তো চৌষট্টি হাজার॥"

বলিব কি ভাই আর রোজগারের কথা! ধামা ধামা চা'ল আর গণ্ডা গণ্ডা পয়সা। ধামায় যেন পয়সা বৃষ্টি হইতে লাগিল। সে-সময় যদি কেহ বলিত যে,—"নয়ান! হাইকোর্টের জজগিরি খালি হইয়াছে, তুমি সেই জজগিরিটি কর।" আমি তাতেও রাজী হইতাম না। প্রথম দিনের রোজগারটি আনিয়া গিন্নীকে বলিলাম,—"গিন্নি! একবার বাহির হইয়া দেখ দেখি বাপ-ধন! ব্যাপারখানা কি? বড় যে গুলিখোর বলিয়া মুখঝামটা দাও! গুলিখোর না হইলে এরূপ ফিকির বাহির করে কে, বাপ-ধন? এরূপ বুদ্ধি জোগায় কার?"

"কিন্তু, দেখ লম্বোদর ভায়া! তোমাদের আমি একটি জ্ঞানের কথা বলি। সাদাচোখোদের যে কখনও বিশ্বাস করিবে না, সে-কথা বলা বাহুল্য। সাদাচোখোদের মনটি সদাই জিলেপির পাক। সত্য কথা কারে বলে, তারা একেবারে জানে না। প্রমাণ চাও? আচ্ছা প্রমাণও করিয়া দিই। এই দেখ ছিঁচকে-চোর বলিয়া তাহারা আমাদের মিথ্যা অপবাদ রটায়। আচ্ছা তাহারা তামা, তুলসী, গঙ্গাজল হাতে করিয়া বলুক,—কবে কার ছিঁচকে কোন্ গুলিখোর চুরি করিয়াছে? আড্ডাধারী মহাশয়! আপনিও বলুন—ছিঁটের জন্য কবে কোন্ গুলিখোর আপনার নিকট ছিঁচকে আনিয়াছে? ঘটি-চোর বল, বাটি-চোর বল, ঘাড় হেঁট করিয়া মানিয়া লই। তোমাদের হুঁকড়ার ছিঁটকে কে কবে চুরি করে বাপু তাই বলি, হে সাদাচোখোগণ! ভুলিয়াও কি তোমরা কখনোও সত্যকথা বলিতে শিখিবে না?"

লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ। সাদাচোখোদের বিশ্বাস নাই। সাদাচোখদের ছায়া মাড়াইলেও নাইতে হয়।"

নয়ন বলিলেন—"আর বিশ্বাস করিয়ো না, এই পেশাদার মাতালদের। মনতাহাদের সাদা বটে, কিন্তু কখন কিভাবে থাকে, তাহার

ঠিক নাই। সাত ঘাটের জল এক করিয়া তুমি চারিটি পয়সা জোগাড় করিলে, আড্ডায় আসিয়া সেই চারি পয়সার ছিঁটে টানিলে, নেশাটি করিয়া তুমি আড্ডা হইতে বাহির হইলে, আর হয় তো কোথা হইতে একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল। তোমার নেশাটি চটিয়া গেল। শীতকাল, মেঘ করিয়াছে, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, ফুর ফুর করিয়া বাতাস বহিতেছে। সহজেই নেশাটি বজায় রাখা ভার, তাহার উপর কোথা হইতে হয়তো একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ে হড়-হড় বমি করিয়া দিল। তোমার নেশাটির দফা একেবারে রফা হইয়া গেল। পেশাদার মাতালেরা এইরূপ লোকের মর্মান্তিক করে। পাল-পার্বণে পেট ভরিয়া মদটুকু খাওয়া গেল, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকা গেল, মৌজ হইল, একথা বুঝি তা নয়, সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, দিন নাই, ক্ষণ নাই, অষ্টপ্রহর তুমি মদ খাইয়া তর্ হইয়া থাকিবে! মেজাজটি গরম করিয়া রাখিবে! ঠাকুর দেবতা লইয়া তোমার বাড়িতে লোকে গান করিতে আসিবে, আর লাঠি লইয়া তুমি তাহাদের মারিতে দৌড়িবে। এ কি বাপু! এরে কি ভাল কাজ বলে? না এরে হিন্দুধর্ম বলে? থুঃ! ছি!"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এইরূপ কোনো একটা মাতালের পাল্লায় পড়িয়াছিলে না কি?"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"হাঁ ভাই! তবে ভাগ্যে আমার শীতলাটি জাগ্রত, হেলাফেলা গুড়ুক তামাকের শীতলা নয়, ভাই সে যাত্রা আমি রক্ষা পাইয়াছিলাম।"

সকলেই অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপারখানা কী বল দেখি?"

নয়ন বলিলেন,—"ভাই! এক দিন প্রাতঃকালে শীতলাটি হাতে করিয়া এক মাতালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। জানি কি ছাই যে, সেটা মাতালের বাড়ি? তাহা হইলে আর যাইতাম? তাহার বাড়িতে গিয়া মন্দিরেটি বাজাইয়া সবে মাত্র আরম্ভ করিয়াছি,—'শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই'—আর মিনসে করিল কি জান ভাই!

এক না কম্বল-মুড়ি দিয়া, 'আঁ আঁ' শব্দ করিতে করিতে, ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে দৌড়িয়া আসিল। তাহার সেই বিকট 'আঁ আঁ' শব্দ শুনিয়াই পেটের পিলে আমার চমকিয়া গেল। শশব্যস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া আমি পালাইবার উদ্যোগ করিলাম। তা ভাই! পালাইতে-না-পালাইতে বেটা যেন ঠিক কেঁদো বাঘের মতো আসিয়া আমার পিঠের উপর পড়িল। তারপর দুঃখের কথা বলিব কি ভাই, এই কিল! এই কিল, তো এই কিল! আর সে কিল তো নয়! এক-একটি কিলে মনে হইল যেন পিঠের সব জয়েন খুলিয়া গেল। ভাবিলাম,—হায় হায়! কেন মরিতে শীতলার ব্যবসা করিতে গিয়াছিলাম! শীতলার ব্যবসা করিতে গিয়া, এমন যে শখের প্রাণটি, সে-প্রাণটি আজ হারাইলাম!"

চতুর্থ পর্ব

বসিয়া আছে দুইটি ভূত

যাহা হউক, মনের সাধে কিল মারিয়া মিন্‌সে আমার শীতলাটি কাড়িয়া লইল। আমি পালাইলাম। প্রাণটা যে রক্ষা পাইল, তাই ঢের। পথে যাইতে যাইতে, মনে মনে শীতলাকে বলিলাম—মা! আর তোমার গান করিতে আমি চাই না, তোমার চা'ল-পয়সা আর চাই না। পিঠের হাড়গুলি যে চুরমার হইয়া গিয়াছে, এখন তাই তুমি রক্ষা কর, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাই।

গগন বলিলেন,—"ইশ্! তাই তো! এ যে ঠিক সেই সুবল ঘোষের কথা।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুবলের কী হইয়াছিল?"

গগন বলিলেন,—"দুধ বেচিয়া সুবলের পিসি কিছু টাকা করিয়াছিলেন। পিসি মরিয়া গেলে সুবল সেই টাকাগুলি পাইলেন। টাকা পাইয়া সুবল মনে করিলেন যে, দুর্গোৎসবটি করি। ঠাকুরগড়া হইল, পূজার দিন আসিল। সিঙ্গি, চোরা, ময়ূর, গণেশের শুঁড় এই সব দেখিয়া সুবলের মনে বড় আনন্দ হইল, হাড়ে হাড়ে তাঁর ভক্তি বিঁধিয়া গেল।

পূজার কয়দিন স্বয়ং নিজে ক্রমাগত শাঁখ বাজাইলেন। প্রাণপণ চিক্কুড়ে শাঁখে ফুঁ দিলেন। কোঁৎ পাড়িয়া শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে এখন গোগ্‌গোলটি বাহির হইয়া পড়িল। তারপর সেই গোগ্‌গোলের জ্বালায় অস্থির! গোগ্‌গোলের জ্বালায় অস্থির হইয়া বিসর্জনের সময় গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গলায় কাপড় দিয়া, হাত জোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,—

ধন চাই না, মা! মান চাই না, মা!
চাই না পুত্তুর বর।
এখন শঙ্খ বাজাইতে গিয়া এই বেরিয়েছে
গোগ্‌গোল তাই রক্ষা কর॥

নয়ানেরও ঠিক তাই হইয়াছিল। চা'ল চাই না মা! পয়সা চাই না মা! এখন এই হাড়গুলি জোড়া লাগাইয়া দাও। কেমন হে নয়ান! ঠিক নয়?"

নয়ন বলিলেন,—"হাঁ ভাই, ঠিক তাই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা বলিব কি, ভাই! পাঁচ-সাত দিন পরে আমার নামে এক চিঠি! যে শীতলা কাড়িয়া লইয়াছিল, তাহার চিঠি! ডাকে সেই খোলার ঘরে গিয়া চিঠি উপস্থিত। মাতালটা আমার ঠিকানা জানিল কী করিয়া? চিঠিতে লেখা ছিল যে, শীঘ্র আসিয়া তোমার শীতলা লইয়া যাইবে। তোমার এ জাগ্রত শীতলা। এ শীতলা লইয়া আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। তোমার কোনো ভয় নাই। শীঘ্র তোমার শীতলা লইয়া যাইবে।

'যাই কি না যাই?' এই কথা লইয়া মনে মনে অনেক তোলা-পাড়া করিতে লাগিলাম। গিন্নী রাগিয়া বলিলেন,—'যাও-ই-না ছাই! তোমায় সে কি খাইয়া ফেলিবে?'

আমি বলিলাম,—"তুমি তো বলিলে, যাও-ই-না ছাই! কিন্তু সে কিলের স্বাদ তো আর তুমি জান না? মনে করিতে গেলে এখনও আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। চুন-হলুদ বাটিয়া হাতে তোমার কড়া পড়িয়া গেল, তবু বল, যাও-ই-না ছাই। এঁটেল মাটি দিয়া আর একটি

শীতলা গড়িতে পারিব, প্রাণটি তো আর এঁটেল মাটি দিয়া গড়িতে পারিব না!"

"যাহা হউক, অবশেষে যাওয়াই স্থির করিলাম। সন্ধ্যার পর, ভয়ে ভয়ে, কাঁপিতে কাঁপিতে, প্রাণটি হাতে করিয়া সেই মাতালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ন জনঃ ন মানবঃ। কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। বাহিরের ঘরের দরজার কাছে গিয়া একটু উঁকি মারিয়া দেখিলাম, বাপু রে! বলিতে এখনও সর্বশরীর শিহরিয়া উঠে! বাহিরের ঘরের ভিতরে দেখি না, বসিয়া আছে দুইটি ভূত!"

লম্বোদর বলিলেন,—"সত্যি?"

নয়ন বলিলেন,—"সত্যি ভাই! দেখিলাম যে, ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন দুইটি ভূত।"

"সর্বশরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পা যেন মাটিতে পুতিয়া গেল! টাকরা পর্যন্ত ধূলি মাড়িয়া গেল! পলাইতে পা উঠে না, চেঁচাইতে রা সরে না। অজ্ঞান হতজ্ঞান হইয়া আমি সেইখানে

দ্বিতীয় ভূত বলিলেন,—'আহা! ইহাকে তুমি অনেক কিল মারিয়াছ, তাড়াতাড়ি বিদায় করিও না। ইহার শীতলা কেন যে জাগ্রত, সে-কথাগুলি ইহাকে খুলিয়া বল। লোকের কাছে গিয়া এ গল্প করিবে। তাহা হইলে লোকে আরও ভক্তিভাবে ইহার শীতলাকে পূজা দিবে। ইহার দুপয়সা রোজগার হইবে। পেটে খাইলে পিঠে সয়! পিঠে বিলক্ষণ হইয়াছে! এখন পেটে খাইবার সুবিধা করিয়া দাও।'

কর্তা-ভূত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কেমন হে! সব কথা শুনিতে চাও? কিসে বৈকুণ্ঠটি আমার কানের কাছ দিয়া গিয়াছে, সে কথা শুনিতে চাও?

ভূতেদের কথা শুনিয়া আমার মনে অনেকটা সাহস হইয়াছিল, ধড়ে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল। আমি বলিলাম,—'আজ্ঞে হাঁ, শুনিতে চাই বই কি? তবে মহাশয়ের কিলের কথা মনে হইলে, আর জ্ঞান থাকে না।'

কর্তা-ভূত হাসিয়া বলিলেন,—'না না, আর কিল মারিব না। তোমার ঘাড়ও মটকাইয়া দিব না। কেন তোমার শীতলাকে জাগ্রত বলিতেছি, এখন সে-সকল কথা শুন।'

আড্ডাধারী মহাশয় ও লম্বোদর গগন প্রভৃতি বলিয়া উঠিলেন,—"নয়ান! তোমার সাহস তো কম নয়! স্বচ্ছন্দে বসিয়া ভূতেদের সঙ্গে তুমি গল্পগাছা করিলে? বুকের পাটা তো তোমার কম নয়?"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"বেঁধে মারে সয় ভাল। করি কি? ভূতের খপ্‌পরে গিয়া পড়িয়াছি, পলাইবার তো যো ছিল না, কাজেই কাদায় গুণ ফেলিয়া পড়িয়া থাকিতে হইল। তা না হইলে সর্বক্ষণই ভয় হইতেছিল। কি জানি? ভূতের মরজি! যদি বলিয়া বসে যে, তোমার পিঠ দেখিয়া আমাদের হাত সুড়-সুড় করিতেছে; এস দুইটি কিল মারি। তোমার ঘাড় দেখিয়া আমাদের হাত নিশ্‌-পিশ্‌ করিতেছে, এস ভাঙ্গিয়া দিই! তাহা হইলে কী করিতাম! যাহা হউক, সেরূপ কোনো বিপদ ঘটে নাই। ভূতগুলি দেখিলাম, ভালমানুষ ভূত। সেই কর্তা-ভূতের এখন আশ্চর্য কাহিনী শুন।"

পঞ্চম পর্ব

কর্তা-ভুত বলিতেছেন

কর্তা-ভূত বলিতেছেন,—"তোমার শীতলাটি কাড়িয়া মনে মনে আমার বড়ই আনন্দ হইল। কারণ, একরূপ কাজে যেরূপ আমার আনন্দ হইত, এমন আর কোনোও কাজে নয়। কিন্তু তোমার শীতলাটি জাগ্রত শীতলা, মরা শীতলা নয়। ভাল এঁটেল মাটি, ভাল সিন্দুর, ভাল রাঙ্গতা দিয়া গড়া। বেলে মাটি নয়, মেটে সিন্দুর নয়, জাল রাঙ্গতা নয়। তাই দুই দিন পরেই আমার বসন্ত হইল। তোমার সেই চৌষট্টি হাজার বসন্তে আমায় ছাইয়া ধরিল। চুলের ডগা, পায়ের কড়ে আঙ্গুলের আগা পর্যন্ত, তিল রাখিবার স্থান ছিল না। বৈদ্য আসিয়া মহাদেব-চূর্ণ ও গৌরচন্দ্রিকা ঘৃতের ব্যবস্থা করিলেন। মহাদেব-চূর্ণ খাইতে দিলেন, আর গৌরচন্দ্রিকা ঘৃত গায়ে মাখিতে বলিলেন। ঔষধের ব্যবস্থা দেখিয়াই বুঝিলাম যে, এবার গতিক বড় ভাল নয়। তিনদিন পরে রাত্রিকালে যমদূতেরা আমাকে লইতে আসিল। চারিটি যমদূত আসিয়াছিল। সব বিকটমূর্তি, দেখিলে প্রাণ শুকাইয়া যায়।

"যমদূতেরা আসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া টিকিটি খুঁজিতে লাগিল, ইচ্ছা যে, টিকিটি ধরিয়া আমাকে যমপুরে লইয়া যায়। কিন্তু আগে থাকিতে আমি একটি বুদ্ধির কাজ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেইদিন প্রাতঃকালে, রোগের বে-গতিক দেখিয়া মনে মনে ঠিক করিলাম যে, পৃথিবীতে আসিয়া আমি কখনো কোনো একটি পুণ্যকর্ম করি নাই। চিরকাল পাপ করিয়াছি। নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, চুরি, জাল প্রভৃতি যাহা কিছু পাপকর্ম, সকলই করিয়াছি। ভাল কাজ একটিও কখনো করি নাই। এখন তো দেখিতেছি মৃত্যু উপস্থিত। যমকে গিয়া জবাব দিব কি? তাই মনে করিলাম যে, অন্তিমকালে একটি পুণ্যকাজ করি। আমি চান্দ্রায়ণটি করিলাম! গোয়ালে আমার একটি এঁড়ে বাছুর ছিল। আমি মিস্তির-জা! আমার গোয়ালের

এঁড়ে-বাছুর কেমন তা বুঝিয়া লও। একফোঁটা দুধ থাকিতে গাইকে আমি কখনো ছাড়ি নাই। মা'র দুধ কারে বলে বাছুরটি তা কখনো চক্ষে দেখে নাই। অন্য খাওয়া-দাওয়াও তদ্রূপ। সুতরাং না খাইয়া খাইয়া বাছুরটি অস্থিচর্মসার হইয়াছিল। মরো-মরো হইয়াছিল। সেই এঁড়ে-বাছুরটি একজন ব্রাহ্মণকে দান করিলাম। দড়ি ধরিয়া বাছুরটিকে ব্রাহ্মণ লইয়া চলিলেন। আমার বাড়ির বাহির হইয়াই রাস্তার উপর বাছুর শুইয়া পড়িল, সেইখানেই মরিয়া গেল।

"চান্দ্রায়ণ করিতে মাথাটি নেড়া হইয়াছিলাম। মাথাটি ঠিক বোম্বাই গুলের মত হইয়াছিল। যমদূতেরা টিকি ধরিয়া আমাকে যমের বাড়ি লইয়া যাইবেন, তার যো ছিল না। অন্ধকারে যমদূতেরা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দেখিল যে, টিকি নাই। যমদূতেরা ফাঁপরে পড়িল। কী ধরিয়া আমাকে লইয়া যায়? অবশেষে চিন্তা করিয়া তাহারা আমার হাত ধরিল। গৌরচন্দ্রিকা-ঘৃতে আর বসন্তের রসে আমার গা হড়হড়ে হইয়াছিল। অনায়াসেই আমি হাতটি ছাড়াইয়া লইলাম। পা ধরিল, হড়াৎ করিয়া পা-টিও ছাড়াইয়া লইলাম। যেখানে ধরে আর আমি পিছলাইয়া সরিয়া বসি। কখনো তক্তাপোশের উপর, কখনও তক্তাপোশের নিচে, কখনো ঘরের মাঝখানে, কখনও পাশে, এ-কোণে, সে-কোণে যমদূতদিগের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে আমি এইরূপ পেছলা-পিছলি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহারা হইল চারিজন, আমি হইলাম একা। কতক্ষণ আর পেছলা-পেছলি করিব? ভোরের দিকে তাহারা হাতে ছাই আর মাটি মাখিয়া আসিল। সুতরাং আর আমি পিছলাইয়া যাইতে পারিলাম না। আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

"উত্তমরূপে বাঁধিয়া, যমদূতেরা আমাকে কাঁটাবন দিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিল। আমি পাপী কিনা? কাঁটা ফুটিয়া, ছড়িয়া গিয়া, শরীর হইতে আমার দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। অবশ্য জীয়ন্ত অবস্থায় যে শরীরে আমি মিত্তির-জা ছিলাম, সে শরীর নয়। যে-শরীর যমালয়ে যায়, সেই শরীর; ঠিক বুড়ো আঙ্গুলের মতো। সকাল হইল। প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিবার জন্য যমদূতেরা একটি পুকুরের শানবাঁধানো

ঘাটে গিয়া বসিল। একটি যমদূত আমার নিকট পাহারা রহিল, বাকি তিনজন মাঠে ঘাটে গেল।

"আমার নিকট যে-যমদূতটি ছিল, সে আমাকে বলিল,—'খুব মজার লোক তো তুমি! এত লোককে আমরা লইয়া যাই, কিন্তু সমস্ত রাত্রি পেছলা-পিছলি কাহারও সঙ্গে কখনও করিতে হয় নাই। আচ্ছা ভাল, তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার মাথায় তো টিকি দেখিলাম না। টিকি না পাইলে আমাদের বড়ই অসুবিধা হয়। তা আমাদের অসুবিধা হয় হউক, তাহাতে বড় ক্ষতি নাই। কিন্তু কথাটা জিজ্ঞাসা করি এই যে, এই যাহাদের মাথায় টিকি না থাকে তাহাদের সঙ্গে লোকের ঝগড়া হইলে, লোকেরা কী ধরিয়া তাহাদের দুই গালে দুই থাবড়া মারে?'

আমি উত্তর করিলাম,—'চড় খাইতে সুবিধা হইবে বলিয়া কি লোকে মাথায় টিকি রাখে?'

যমদূত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি জন্যে? আমরা ভাল করিয়া ধরিতে পারিব, সেই জন্যে?"

আমি উত্তর করিলাম,—'তাও নয়।' এই যে তারের খবর আসে, সেই টুক্-টুক্ করিয়া শব্দ হয়? টিকি না থাকিলে মাথা দিয়া সেই তারের খবর বাহির হইয়া যায়। সেইজন্য লোকে মাথায় টিকি রাখে।'

যমদূত বলিলেন,—'ওঃ! বটে। সেই জন্যে? এখন বুঝিলাম।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যমদূত বলিলেন,—'তোমার পাড়ার নেই-আঁকুড়ে দাদাকে জানিতে?'

আমি বলিলাম,—'জানিতাম বই কি, আজ কয় বৎসর তিনি মরিয়া গিয়াছেন, শুনিয়াছি, মরিয়া ভূত হইয়াছেন।'

যমদূত বলিলেন,—'হাঁ! তিনি ভূত হইয়াছেন। ভগিনীকে যমযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, তিনি বলিয়াছিলেন, এই পুষ্করিণীটি আমার।'

আমি বলিলাম,—'এ পুষ্করিণী তাঁর কেন হবে? এ পুকুর যে রাম গাঙ্গুলির।'

যমদূত বলিলেন,—'হাঁ এ পুষ্করিণী রাঘব গাঙ্গুলির বটে, তবে নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিয়াছেন যে, আমার—সে কেবল ভগিনীকে যমের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি হইয়াছিল, বলিবেন?'

যমদূত বলিলেন,—'বলিব না কেন, বলিব! তবে তুমি যে মহিরাবণের বেটা অহিরাবণের মতো পেছলা-পিছলি কর, সেজন্য তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। যাই হউক, শুন।'

ষষ্ঠ পর্ব

নেই-আঁকুড়ে দাদা

যমদূত বলিতেছেন,—নেই-আঁকুড়ে দাদার একটি বিধবা ভগিনী ছিলেন। একাদশীর দিন বৈকাল বেলা বাড়ির নিকটে বাগানে বেড়াইতে গিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি কলাগাছে দিব্য একখানি আগুটপাতা হইয়া রহিয়াছে! মনে মনে ঠিক করিলেন যে, কা'ল এই আগুটপাতা খানিতে আমি ভাত খাইব। দৈবের কর্ম সেই রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হইল। বিধবা অতি পুণ্যবতী ছিলেন। সেইজন্য বিষ্ণুদূতেরা তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে আসিল। এদিকে আবার একাদশীর দিন খাইবার বাসনা করিয়াছিলেন, সুতরাং আমরাও তাঁহাকে লইতে গেলাম। বিধবাকে লইয়া বিষ্ণুদূতে ও যমদূতে কাড়াকাড়ি উপস্থিত হইল। ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়াইল। সেই ঘরের ভিতর, সেই রাত্রিতে বিষ্ণুদূতে আর যমদূতে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অবশেষে আমরা জিতিলাম। বিষ্ণুদূতদিগকে তাড়াইয়া দিলাম। যেমন তোমাকে লইয়া যাইতেছি, সেইরূপ বিধবাকেও কাঁটাবন দিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম। যমপুরীতে উপস্থিত করিলাম। বিধবার মাথায় ক্রমাগত ডাঙ্গস মারিতে যম হুকুম দিলেন। ডাঙ্গসের প্রহারে জর-জর হইয়া বিধবা পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল,—'হায় রে!

যদি আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, কী করিয়া যম আমায় এরূপ সাজা দিত?' যমের কানে সেই কথাটি প্রবেশ করিল। যম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিধবা কী বলিতেছে?' আমরা বলিলাম,—'বিধবা বলিতেছে যে, আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা যদি এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, যম কি করিয়া আমায় এরূপ সাজা দিত।' শুনিয়া যমের রাগ হইল। যম বলিলেন,—'নিয়ে আয় তো রে ওর নেই-আঁকুড়ে দাদাকে! দেখি কী করিয়া আপনার বোন্‌কে বাঁচায়?' নেই-আঁকুড়ে দাদাকে আনিতে আমরা দৌড়িলাম। নেই-আঁকুড়ে দাদা ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ভগিনী যে মরিয়াছে, ভগিনীর যে এরূপ দুর্দশা হইয়াছে, তাহার তিনি কিছুই জানিতেন না। আমরা তাঁহাকে উঠাইলাম। আমরা বলিলাম—'চলুন, যম আপনাকে ডাকিতেছেন।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমার কি সময় হইয়াছে?' আমরা বলিলাম,—'না, আপনার এখনও সময় হয় নাই, এই শরীরেই আপনাকে একবার যমের বাড়ি যাইতে হইবে। একটা কথার মীমাংসা করিয়া আপনি ফিরিয়া আসিবেন।' নেই-আঁকুড়ে দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কথাটা কী? শুনিতে পাই না?' যমের বাড়ি গিয়া তাহার ভগিনী কী বলিয়াছিলেন, আমরা সে-সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিলেন,—'বটে। আচ্ছা, চল যাই।' পথে যাইতে যাইতে নেই-আঁকুড়ে দাদা ক্রমাগত বলিতে বলিতে চলিলেন,— 'দেখ, এই জায়গায় আমি একটি দেবালয় করিব মানস করিয়াছি।' আবার খানিক দূর গিয়া, 'সাধারণে জল পান করিবে বলিয়া এই জলাশয়টি আমি করিয়া দিয়াছি।'—এইরূপ স্কুল, কলেজ, ডাক্তারখানা, রাস্তা-ঘাট করিবার কথা আমাদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া চলিতে লাগিলেন। অবশেষে আমরা যমপুরীতে উপস্থিত হইলাম। যমের সম্মুখে নেই-আঁকুড়ে দাদাকে খাড়া করিয়া দিলাম। যম বলিলেন,—'নেই-আঁকুড়ে শোন্, তোর বোন ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। একাদশীর দিন আঙট-পাতে ভাত খাইবার মানস করিয়াছিল। সেই পাপের জন্য আমি তাহার মাথায় ডাঙ্গস মারিতে হুকুম দিয়াছি। সে বলে, আমার

নেই-আঁকুড়ে দাদা থাকিলে যম আমায় এরূপ সাজা দিতে পারিত না। তার আস্পর্ধার কথা শুনিয়া তোরে আমি এখানে আনিয়াছি। কী করিয়া বোনকে বাঁচাইবি, বাঁচা!' নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিলেন,—'আমার পুণ্যের অর্ধেক আমি আমার ভগিনীকে দিলাম। সেই পুণ্য লইয়া আমার ভগিনীকে আপনি খালাস দিন।' নেই-আঁকুড়ের কী পুণ্য আছে দেখিবার জন্য যম চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন। খাতা-পত্র দেখিয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন যে, নেই-আঁকুড়ের পুণ্য কিছুই নাই। রাগিয়া যম বলিলেন,—'শুন্‌লি তো নেই-আঁকুড়ে, তোর এক ছটাকও পুণ্য নাই! বোন্‌কে তার আবার ভাগ দিবি কি?' নেই-আঁকুড়ে উত্তর করিলেন,—'পুণ্য আছে কি না আছে, আপনার এই যমদূতদিগকে জিজ্ঞাসা করুন!' যম আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা বলিলাম,—"হাঁ মহাশয়! পথে আসিতে আসিতে, 'এখানে দেবালয় করিবার মানস আছে, এখানে স্কুল করিবার মানস আছে', নেই-আঁকুড়ে এইরূপ নানা কথা বলিয়াছিলেন।" যম আরও রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—'ভণ্ড! সে-সকল কাজ তো তুই করিস্ নাই, কেবল মনে মনে মানস করিলে কী হইবে?' নেই-আঁকুড়ে উত্তর করিলেন,—'আমার ভগিনী আণ্ডটপাতে ভাত খাইয়াছিলেন, না কেবল মানস করিয়াছিলেন?' যম বলিলেন,—'মানস করিয়াছিল।' নেই-আঁকুড়ে বলিলেন,—'তবে?' যম বুঝিলেন। যম বুঝিলেন যে, কেবল মানস করিলে যদি পাপের শাস্তি দিতে হয়, তাহা হইলে পুণ্যের ফল দিতে হয়। বে-আইনী করিয়া তিনি যে বিধবার মাথায় ডাঙ্গস মারিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যম এখন তাহা বুঝিলেন। বিধবাকে মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। বিষ্ণুদূতেরা আসিয়া বিধবাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল। নেই-আঁকুড়ে দাদা আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার কিছুদিন পরে নেই-আঁকুড়ের মৃত্যু হইল। তাঁহার গতি হয় নাই। ভূত হইয়া তিনি এখন লোকের উপর উপদ্রব করিতেছেন।

সপ্তম পর্ব

এঁড়ে গরু

কর্তা-ভূত অর্থাৎ মিত্তির-জা বলিতেছেন,—'যমদূতদিগের কাজ সারা হইলে পুনরায় তাহারা আমাকে যমালয় অভিমুখে লইয়া চলিল। অনেকক্ষণ পরে যমপুরীতে গিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম। যমদূতেরা যমের সম্মুখে আমাকে খাড়া করিয়া দিল। যম সিংহাসনে বসিয়া আছেন। পাশে খাতাপত্র লইয়া চিত্রগুপ্ত। চারিদিকে শত শত বিকটমূর্তি যমদূত। কাহারও হাতে মুগুর, কাহারও হাতে ডাঙ্গস, কাহারও হাতে সাঁড়াশী। আমার পাপপুণ্যের হিসাব দেখিতে যম চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন। অনেক খাতাপত্র উল্টাইয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন,— 'মহাশয়! ইহার পুণ্য তো কিছুই দেখিতে পাই না, সকলই পাপ। অতি উৎকট উৎকট পাপ। ইহার মতো মহাপাতকী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ছিল না। মরিবার সময় এ যে চান্দ্রায়ণটি করে, তাও সব ফাঁকি। যমদূতদিগকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত কেবল মাথাটি নেড়া হইয়াছিল। পুণ্য ইহার কিছুমাত্র নাই, কেবল পাপ। তবে একবিন্দু পুণ্য আছে এই যে, মৃত্যু হইবার পূর্বে একজন ব্রাহ্মণকে একটি মর-মর এঁড়ে গরু দান করিয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণকে বাছুরটি ঘরে লইয়া যাইতে হয় নাই। বাছুরটি পথেই শুইল, আর মরিল। মরিয়া সেই এঁড়ে-বাছুরটি এখন যমপুরীতে আসিয়াছে।'

আমাকে সম্বোধন করিয়া যম বলিলেন,—'কেমন হে মিত্তির-জা! চিত্রগুপ্তের মুখে তোমার হিসাব শুনিলে তো! এখন তুমি কী করিতে চাও! তোমার যে রত্তিমাত্র পুণ্যটুকু আছে, আগে তাহার ফল ভোগ করিয়া লইতে চাও, না আগে পাপের ভোগ ভুগিতে চাও?'

আমি উত্তর করিলাম,—'মহাশয়! আপনার এখানে কিরূপ দস্তুর, কিরূপ আইনকানুন, তা তো আমি জানি না। আমাকে একটু বুঝাইয়া বলুন, আমার পুণ্যের ফল কিরূপ হইবে, আর পাপের ভোগই বা কি প্রকার হইবে? তারপর আমি আপনাকে বলিব, আগে আমি কোন্‌টি চাই।'

যম উত্তর করিলেন,—'সমস্ত জীবন তুমি উৎকট উৎকট মহাপাপ

করিয়াছ। সেজন্য চিরকাল তোমাকে রৌরব প্রভৃতি নরকে বাস করিতে হইবে। তোমার গলিত দেহে কৃমি প্রভৃতি নানারূপ ভয়াবহ কীট দংশন করিবে, অগ্নিতে তোমাকে পুড়িতে হইবে। অষ্টপ্রহর যমদূত তোমার মাথায় ডাঙ্গস মারিবে। সাঁড়াশী দিয়া যমদূতেরা তোমার গায়ের মাংস ছিঁড়িবে। বিধিমত তোমার যন্ত্রণা হইবে, যাতনায় তুমি চিৎকার করিবে। চিরকাল তোমাকে এইরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তবে সেই যে, সামান্য একটু নামমাত্র পুণ্য করিয়াছিলে, মরিবার পূর্বে সেই যে মর-মর এঁড়ে বাছুরটি ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলে, কেবলমাত্র একদিনের জন্য সেই পুণ্যটুকুর ফল ভোগ করিতে পাইবে। সেই এঁড়ে গোরুটি এখন এখানে আসিয়াছে। এক দিনের জন্য তাহারে তুমি যা আনিয়া দিতে বলিবে, তাহাই সে আনিয়া দিবে। যাহা করিতে বলিবে তাহাই সে করিবে। তোমার পুণ্যের ফল এই।'

আমি বলিলাম,—'পুণ্যের ফলটি আমি প্রথমে ভোগ করিয়া লইব। পাপের দণ্ড যাহা হয়, তাহার পর আপনি করিবেন।'

যম আজ্ঞা করিলেন,—'ওরে! মিত্তির-জার সেই এঁড়ে গরুটা আন্‌তো!'

এঁড়ে গরু আনিতে যমদূতরা সব দৌড়িল। এঁড়ে গরু আনিয়া যমের দরবারে হাজির করিল। আমি দেখিলাম, এখন আর সে অস্থিচর্ম-সার এঁড়ে বাছুর নাই! আমার ঘরে খাবার কষ্ট ছিল, যমের ঘরে তো আর সে কষ্ট ছিল না! যমপুরীতে অনেক খোলভূষি খাইয়া বাছুরটি এখন বিরাট এক ষাঁড় হইয়াছে। লম্বা লম্বা প্রকাণ্ড দুই সিং! দেখিলে হরিভক্তি উড়িয়া যায়। চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ। রাগে আস্ফালন করিয়া ফোঁশ ফোঁশ করিতেছে। রাগে পা দিয়া মাটি চষিয়া ফেলিতেছে। কারে গুঁতাই, কারে মারি, সদাই এই মন! দুই দিকে দুই দড়ি ধরিয়া চারিজন যমদূতে টানিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

যম বলিলেন—'মিত্তির-জা! এই তোমার সেই এঁড়ে গরু। তুমি ইহাকে যাহা বলিবে, এই এঁড়ে গরু আজ সমস্ত দিন তাহাই করিবে।'

এঁড়ে গরুকে ছাড়িয়া দিবার জন্য যম আদেশ করিলেন। চক্ষু

রক্তবর্ণ করিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, শিং নিচে করিয়া, এঁড়ে গরু আসিয়া আমার কাছে দাঁড়াইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কেমন হে এঁড়ে গোরু আজ আমি তোমাকে যাহা বলিব, তাহাই তুমি করিবে তো?'

এঁড়ে গরু উত্তর করিল,—'আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ সমস্ত দিন আপনি যাহা করিতে হুকুম করিবেন, আমি তাহাই করিব।'

আমি বলিলাম,—'এঁড়ে গরু! তবে তুমি এক কাজ কর। তোমার একটি শিং যমের নাভিকুণ্ডলে প্রবিষ্ট করিয়া দাও, আর একটি সিং চিত্রগুপ্তের নাভিকুণ্ডলে দিয়া, আজ সমস্ত দিন এই দুই জনকে ঘুরাও, সমস্ত দিন দুই জনকে বন্ বন্ করিয়া চরকির পাক খাওয়াও।'

লম্বোদর, গগন, আড্ডাধারী মহাশয়, সকলেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন,—'বাহবা! বাহবা, মিত্তির-জা! তুমি একজন লোক বটে! কিন্তু নয়ান, মিত্তির-জা তোমাকে ঠিক কথা বলেন নাই। নাভিকুণ্ডলে মিত্তির-জা যে শিং দিতে বলিবেন, মিত্তির-জা তেমন পাত্র নন। শরীরের অন্যস্থানে শিং দিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু কথাটি ভদ্রসমাজে বলিবার যোগ্য নয়। সেই জন্য বোধহয় মিত্তির-জা তোমার নিকট আসল কথাটি গোপন করিয়াছিলেন।'

নয়ন উত্তর করিলেন,—'আমারও মনে সে সন্দেহটি উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, যখন এই নাভিকুণ্ডলের কথাটি বলেন, তখন মিত্তির-জা-ভূতের মুখে ঈষৎ একটু হাসির রেখা দেখিয়াছিল। যাহা হউক, মিত্তির-জা-ভূত কী বলিতেছেন, তাহা শুন।'

'মিত্তির-জা-ভূত বলিলেন,—আমার আদেশ পাইয়া এঁড়ে গরু, যম ও চিত্তগুপ্তকে তাড়া করিল। ভয়ে দুই জনের প্রাণ উড়িয়া গেল। সিংহাসন হইতে যম লাফাইয়া পড়িলেন। খাতাপত্র ফেলিয়া চিত্তগুপ্তও লাফাইয়া পড়িলেন। তারপর, দৌড়! দৌড়! প্রাণপণে লম্বা দৌড়।

'কিন্তু দৌড়িয়া যাবেন কোথায়? এঁড়ে গরু নাছোড়-বান্দা! যেখানে দৌড়িয়া পলান, শিং বাগাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই আমার এঁড়ে গরু গিয়া উপস্থিত হয়।'

অষ্টম পর্ব

মিত্তিরজার পুণ্য

কঙ্কাল-ভূত বলিতেছেন,—যমপুরীর ভিতর কোনো জায়গায় পলাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত নিস্তার পাইলেন না। যেখানে তাঁহারা যান, আরক্তঘূর্ণিত নয়নে এঁড়ে গোরুও সেই স্থলে গিয়া তাঁহাদিগকে তাড়া করে। যমপুরী ছাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে দুইজনে ইন্দ্রের ইন্দ্রলোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানেও এঁড়ে গোরু সঙ্গে সঙ্গে। শিবের শিবলোকে গেলেন সেখানেও এঁড়ে গোরু! ব্রহ্মার ব্রহ্মলোকে, সেখানেও এঁড়ে গোরু! পরিত্রাণ আর কোথাও পান না। অবশেষে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দুইজনে বৈকুণ্ঠে গিয়া উপস্থিত। যেখানে নারায়ণ শুইয়া ছিলেন, আর লক্ষ্মী পা টিপিতেছিলেন, গলদঘর্ম মুমূর্ষুপ্রায় যম ও চিত্রগুপ্ত গিয়া উপস্থিত। বৈকুণ্ঠের দ্বারে সুদর্শন চক্র ঘুরিতেছিল। এঁড়ে সেইখানে বৈকুণ্ঠের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। সিং পাতিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। যম ও চিত্রগুপ্ত বাহির হইলেই তাঁহাদিগকে সিঙে লইয়া ঘুরাইবে।

"যম ও চিত্রগুপ্তের দুরবস্থা দেখিয়া, নারায়ণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নারায়ণকে তাঁহারা আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনাইলেন। নারায়ণ বলিলেন,—এ মানুষটি দেখিতেছি, সাধারণ মানুষ নয়। ইহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া বশ করিতে হইবে। তা না হইলে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, শিবের শিবত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, আমার নারায়ণত্ব, এ সব কাড়িয়া লইবে। দেশে দেশে আমাদিগকে ফকির হইয়া বেড়াইতে হইবে। চল, আমরা এখন সকলে সেই মানুষটির কাছে যাই।

"যম বলিলেন,—"দ্বারে সেই এঁড়ে গোরু দাঁড়াইয়া আছে। বাহির হইলেই আমাদের সে নিগ্রহ করিবে। আপনি গিয়া সেই মিত্তিরজাকে সান্ত্বনা করুন, আমরা এই স্থলে বসিয়া থাকি।'

"নারায়ণ বলিলেন,—'তোমাদের ভয় নাই, তোমরা আমার সহিত এস। আমি এঁড়ে গোরুকে বুঝাইয়া বলিব, সে তোমাদের প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করিবে না।"

"এইরূপ আশ্বাস পাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত ভয়ে ভয়ে নারায়ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, নারায়ণ আগে আগে চলিলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে এঁড়ে গোরু সিং পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

"নারায়ণকে দেখিয়া এঁড়ে গোরু বলিল,—'মহাশয়! আপনার বাড়িতে যম ও চিত্রগুপ্ত গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। শীঘ্র তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিন। তাহাদিগকে সিঙে লইয়া আমি ঘুরাইব। মিত্তির-জা আমাকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন।'

"সুমিষ্টভাবে নারায়ণ বলিলেন,—"এঁড়ে গোরু! তুমি ব্যস্ত হইয়ো না। যম ও চিত্রগুপ্ত পলায় নাই। ঐ দেখ, আমার পশ্চাৎ আসিতেছে। তাহাদিগকে সিঙে লইয়া ঘুরাইতে মিত্তির-জা তোমাকে বলিয়াছেন। আচ্ছা মিত্তির-জা যদি যম ও চিত্রগুপ্তকে অব্যাহতি দেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহার কথা শুনিবে তো?"

"এঁড়ে গোরু উত্তর করিল,—মিত্তির-জা আমাকে হুকুম দিয়াছেন। মিত্তির-জা যদি পুনরায় বলেন,—না, ইহাদিগকে সিঙে করিয়া ঘুরাইতে হইবে না,—তাহা হইলে তাঁহার কথা শুনিব না কেন? অবশ্য শুনিব।"

"নারায়ণ বলিলেন,—"তবে আমার সঙ্গে এস! সকলে চল, মিত্তিব-জার কাছে যাই।"

"নারায়ণ আগে, তাঁহার পশ্চাতে এঁড়ে গোরু, তাহার পশ্চাতে যম ও চিত্রগুপ্ত। এইরূপে সকলে পুনরায় যমপুরীর দিকে চলিলেন। এঁড়ে গোরু দুই চারি পা যায়, আর মাঝে মাঝে পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখে, পাছে যম ও চিত্রগুপ্ত পলায়।

"মিত্তির-জা-ভূত বলিলেন,—আমার নিকট হইতে পলাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত কী করিয়াছিলেন, কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা আমি চক্ষে দেখি নাই। পরে নারায়ণের নিকট যাহা আমি শুনিয়াছিলাম, তাহাই তোমাকে বলিলাম। জাগ্রত-শীতলার পাণ্ডা! তুমি মনে করিয়ো না যে, আমি—মিত্তির-জা, এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলাম। যম যেই সিংহাসন ফেলিয়া পালাইলেন, আর টুপ করিয়া আমি সেই খালি সিংহাসনে গিয়া বসিলাম। সিংহাসনে বসিয়া যমদূতদিগকে হুকুম দিলাম,—

'যমপুরীতে যত পাপী আছে, এই মুহূর্তে তোমরা তাদের সকলকে খালাস কর।"

যমপুরীতে তৎক্ষণাৎ মহা-সমারোহ পড়িয়া গেল। শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, পাপী খালাস পাইতে লাগিল। দুর্গন্ধ পূতিময় নরক হইতে উঠাইয়া পাপীদের স্নান করাইতে লাগিলাম, সুগন্ধ আতর গোলাপ তাহাদিগের দেহে সিঞ্চন করিতে লাগিলাম। অগ্নিময় জ্বলন্ত নরক হইতে উঠাইয়া সুস্নিগ্ধ জলে পাপীদের শরীর সুশীতল করিতে লাগিলাম। শত শত কর্মকার আনাইয়া পাপীদের হাতে পায়ের শিকল কাটাইতে লাগিলাম। মর্মভেদী কান্নার ধ্বনি বিলুপ্ত হইয়া যমপুরীর চারিদিকে তখন আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। সহস্র সহস্র পাপী গললবস্ত্র হইয়া জোড়হাতে আমার সিংহাসনে সম্মুখে দাঁড়াইল। সকলে বলিতে লাগিল,—'ধন্য মিত্তির-জা! শুভক্ষণে আপনার মা আপনাকে গর্ভে ধরিয়াছিলেন। আজ আপনার কৃপায় যমযন্ত্রণা হইতে আমরা রক্ষা পাইলাম। না হইলে, নির্দয় যম আরও কতকাল আমাদিগকে পীড়ন করিত, তাহা বলিতে পারি না।'

সম্মুখে দাঁড়াইয়া জোড়হাতে পাপীরা এইরূপে আমার স্তবস্তুতি করিতেছে, এমন সময় নারায়ণ, এঁড়ে গোরু, যম ও চিত্রগুপ্ত সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভক্তিভাবে তাঁহার পায়ে গিয়া পড়িলাম।

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মিত্তির-জা! এ কী বল দেখি? যমের উপর তোমার এত রাগ কেন?'

আমি উত্তর করিলাম,—'আজ্ঞে না! যমের উপর আর আমার আড়ি কি? তবে রসিকতা করিয়া যম বলিলেন, চিরকাল আমাকে নরকভোগ করিতে হইবে, কেবল একটি দিন আমি পুণ্যের ফল ভোগ করিতে পাইব। তাই যা! সে যাহা হউক; এখন আর আমার পাপ কোথায়? এই সাক্ষাতে দেখুন লক্ষ লক্ষ পাপীদের আমি উদ্ধার করিয়াছি। যে লোক লক্ষ লক্ষ পাপীকে উদ্ধার করে, তাহার আবার পাপ কোথায়? তারপর,—আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন

করিলাম, যে পাদপদ্ম ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ধ্যানে পায় না, আজ সেই শ্রীপাদপদ্ম আমি স্পর্শ করিলাম। তবে আর আমার পাপ কোথায় রহিল ?'

নারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"না মিত্তির-জা! তোমার আর কিছুমাত্র পাপ নাই, তুমি আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠে চল। এঁড়ে গোরুকে মানা করিয়া দাও, যেন যম ও চিত্রগুপ্তের প্রতি সে কোনোরূপ অত্যাচার না করে।"

এঁড়ে গোরুকে আমি মানা করিয়া দিলাম। এঁড়ে গোরু নিজের গোয়ালে চলিয়া গেল। নারায়ণের সঙ্গে আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম। যাইবার পূর্বে জোড় হাতে নারায়ণের নিকট একটি প্রার্থনা করিলাম যে, এই পাপীগুলিকে যেন সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি। সুপ্রসন্ন হইয়া নারায়ণ অনুমতি করিলেন। সেই লক্ষ লক্ষ পাপীকে সঙ্গে করিয়া নারায়ণের সঙ্গে আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম।

ক্রমে সকলে বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া, সুদর্শন চক্র কিন্তু ফোঁশ করিয়া উঠিল। আর সকলকে ভিতরে যাইতে দিবে, কেবল আমাকে ভিতরে যাইতে দিবে না। নারায়ণের পায়ে পুনরায় কাঁদিয়া পড়িলাম।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নারায়ণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নয়নচাঁদ বলিয়া এক ব্যক্তির শীতলা কি তুমি কাড়িয়া লইয়াছিলে ?"

আমি উত্তর করিলাম,—"হাঁ মহাশয়! মৃত্যুর পূর্বে আমি সে কাজটি করিয়াছিলাম।"

নারায়ণ বলিলেন,—"ঈশ! করিয়াছ কী! সে যে ভারি জাগ্রত শীতলা! এমন কাজও করে! আর সব পাপ আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু সে শীতলা-কাড়া পাপটি আমি ক্ষমা করিতে পারি না। যাও শীঘ্র ভূত হইয়া তুমি মর্তে ফিরিয়া যাও। নয়ন চাঁদের শীতলাটি ফিরাইয়া দাও। আর, সকলকে গিয়া বল, যেন নয়নচাঁদের শীতলাকে সকলে পূজা করে।' "কী করিব ? কাজেই ভূত হইয়া আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। এখন তোমার শীতলাটি লইয়া যাও, পুনরায়

আমি বৈকুণ্ঠে গমন করি।"—এই বলিয়া মিত্তির-জা ভূত আমার শীতলাটি আমাকে ফিরাইয়া দিলেন।

নবম পর্ব্ব

পরিশেষ

আড্ডাধারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা নয়ান! নেই যে আর একটি ভূত সেখানে বসিয়াছিল, সে-ভূতটি কে? তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"হঁা, করিয়াছিলাম! শুনি যে, সেটি নেই-আঁকুড়ে দাদার ভূত। মর্ত্তে আসিবার পূর্বে তাহাকেও উদ্ধার করিবার জন্য মিত্তির-জা নারায়ণের অনুমতি পাইয়াছিলেন।"

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর কী হইল?"

নয়ন বলিলেন,—"শীতলাটি হাতে করিয়া আমি বাহিরে দাঁড়াইলাম। ভূত দুইটি সরু সরু বাঁশের সলার মতো লম্বা হইল। তাহার পর হাউর-বাজির মতো একে একে সেঁা সেঁা করিয়া আকাশে উঠিল। বৈকুণ্ঠ চলিয়া গেল।"

সকলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেম,—"তাহার পর তুমি কী করিলে?"

নয়ন বলিলেন,—"আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আগে যদি একগুণ পসার ছিল, এখন দশগুণ পসার হইল। কলেজের সেই যাহারা এম এ পাস দিয়েছে, সভা করিয়া তাহারা আমার শীতলার বক্তৃতা করিল। খবরের কাগজে আমার শীতলার নাম উঠিল। ফিরিঙ্গিরা আসিয়া আমার শীতলার পূজা দিতে আরম্ভ করিল। একদিন লোকসব হঁাড়ি-চড়ানো বন্ধ করিয়া খই-কলা খাইয়া রহিল। আমার বুজরুকি চারিদিকে খুব জাহির হইল। ক্রমে আমি বসন্তর

ডাক্তার হইলাম। টাকাকড়ি ঘরে ধরে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মরসুমটি কমিয়া গেল। সাহেবরা গণিয়া বলিয়াছেন যে, আবার পাঁচ বৎসর পরে সেইরূপ হিড়িক পড়িবে। তখন তোমাদেরও এক-একটি শীতলা বানাইয়া দিব। রাত্রি হইয়াছে। আজ আর নয়। এস,

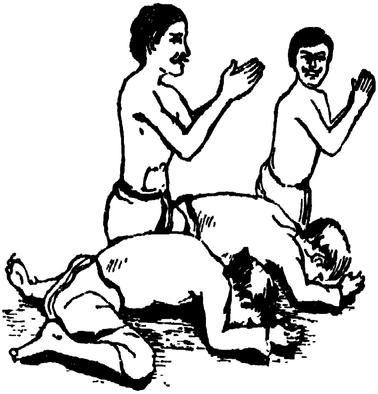

একবার সাধের দেবতাগুলিকে নমস্কার করিয়া নিজেদের ঘরে যাই।"

সকলে মাটিতে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন। আর বলিতে লাগিলেন,—"হে মা কাটি-গঙ্গা! হে বাবা ফণীমনসা! তোমাদের পায়ে গড়, ওঁ নমঃ ওঁ নমঃ, নমঃ।"

বীরবালা

[পাঠক, গল্পটি বুঝিয়া পড়িবেন]

প্রথম অধ্যায়

বীর হনুমান

গল্পটি এ দেশের নয়,—পশ্চিমের, বাঙ্গালীর নয়, হিন্দুস্থানীর। ব্রাহ্মণ কায়েতের নয়,—রাজপুতের। দেবীসিংহ, জাতিতে রাজপুত; নিবাস অযোধ্যায়; বয়স ২০ বৎসর; দেখিতে সুন্দর! শিশুবেলায় দেবীসিংহের পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। সংসারে তাঁহার আর কেহ নাই, কেবল্ বৃদ্ধা পিতামহী। তিনিই দেবীসিংহকে প্রতিপালন করিয়াছেন।

পিতামহী বলিলেন,—"দেবী! সকাল সকাল আহার করিয়া সরযুর ঘাটে গিয়া বসিয়া থাক। নৌকা করিয়া তাঁহারা আসিবেন। বরাবর তাঁহারিগকে গৃহে লইয়া আসিবে। পাণ্ডাদিগের বাড়িতে বাসা করিতে দিবে না।"

দেবীসিংহের যখন এগার বৎসর বয়স, তখন পাঁচ বৎসরের একটি বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার শ্বশুর-বাড়ি অনেক দূর। বিবাহের পর আর তিনি শ্বশুর-বাড়ি যান নাই? শ্বশুর-শাশুড়ি তাঁহার মনে পড়ে না। শুভদৃষ্টির পর স্ত্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। আজ দেবীসিংহের শ্বশুর সপরিবারে অযোধ্যায় তীর্থ করিতে আসিতেছেন। আজ সরযুর ঘাটে আসিয়া পৌঁছিবেন। তাই পিতামহী বলিলেন,—"দেবী! সকাল সকাল আহার করিয়া ঘাটে গিয়া বসিয়া থাক। তোমার শ্বশুর-শাশুড়িকে আমাদের গৃহে লইয়া আইস। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। দেবী! আজ আমি পুত্রবধুর মুখ দেখিয়া জন্ম সার্থক করিব।"

সরযুর ঘাটে গিয়া দেবী বসিয়া রহিলেন। অশ্বত্থ বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া দেবী ভাবিতে লাগিলেন—তাঁহার শ্বশুর কিরূপ? তাঁহার নাম কী? তাঁহার স্ত্রী এখন কত বড় হইয়াছে? দেখিতে

কিরূপ ? নাম কি ? শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে এইরূপ নানা কথা দেবী ভাবিতে লাগিলেন। দিন অতীত হইল, সন্ধ্যা হইল, তবুও তাঁহারা আসিলেন না। দেবী মনে করিলেন,—"আজ বুঝি তাঁহারা আর আসিলেন না। যাই হউক, রাত্রি নয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখি, তাহার পর বাড়ি ফিরিয়া যাইব।"

অশ্বত্থমূলে ঠেশ দিয়া দেবীসিংহ বসিলেন,—বসিয়া পুনরায় শ্বশুরবাড়ির কথা ভাবিতে লাগিলেন। সরযূকুল এখন জনমানবশূন্য, নীরব। রাখালগণ গরু-মহিষের পাল লইয়া ঘরে গিয়াছে। পলাশ-কেশর-রঞ্জিত পীত-বসনা অঙ্গনাগণ এখন আর সরযূর ঘাটে নাই। পাণ্ডাদিগের কোলাহল-ধ্বনি একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সরযূর জল কুল কুল শব্দে বহিয়া যাইতেছে। নক্ষত্ররাশি সরযূর ঈষৎ তরঙ্গ-হিল্লোলে নাচিতেছে। দেবী তাই দেখিতেছেন, তাই শুনিতেছেন, আর শ্বশুরবাড়ির কথা মনে মনে ভাবিতেছেন। এমন সময় কী হইল ?—ভয়ানক "উপ" করিয়া প্রকাণ্ড এক হনুমান অশ্বত্থ গাছ হইতে লাফ দিয়া দেবীসিংহের সম্মুখে পড়িল। পাছে কামড়াইয়া দেয়, সেই ভয়ে পালাইবার উদ্যোগ করিলেন। পালাইতে-না-পালাইতে বীর হনুমান তাঁহাকে বলিলেন,—"আমার গাছতলা তুমি অপবিত্র করিলে কেন ? তোমার কী কুস্তানি মতলব ?

দেবীসিংহ উত্তর করিলেন, —"আজ্ঞা, না মহাশয় ! কুস্তানি মতলব কেন হইবে ? এই দেখুন, আমার মাথায় শিখা রহিয়াছে !"

বীর হনুমান বলিলে,—"কৈ দেখি ?"

দেবীসিংহ, বীর হনুমানের দিকে মস্তক অবনত করিলেন। টিকির মর্যাদারক্ষক বীর হনুমান বাম হাত দিয়া টিকিটি ধরিলেন ; ধরিয়া একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া টান মারিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—"বেশ টিকিটি ! বাঃ দিব্য টিকিটি !"

কিন্তু টিকিটি ভাল হইলে কী হইবে, দেবীসিংহের এদিকে প্রাণ বাহির হইতে লাগিল, মুণ্ডটি ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। দেবীসিংহের চক্ষে জল আসিল। টিকির টানে একবার তাঁহার ঘাড়

খট্ করিয়া উঠিল। ঘাড়টি যেই খুট্ করিল, আর দেবীসিংহ জ্ঞান হারাইলেন। তাহার পর কী হইল, তিনি কিছুই জানেন না।

যখন পুনরায় জ্ঞান হইল, তখন দেবীসিংহ দেখিলেন যে, মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছেন। একটি স্ত্রীলোকের কোলে তাঁহার মাথা রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটি কাঁদিতেছেন. সেই চক্ষু-জলের দুই এক ফোঁটা তাঁহার গায়ে পড়িতেছে। আশে-পাশে অনেকগুলি পুরুষ-মানুষ, মেয়ে-মানুষ, বালক-বালিকা—সব দাঁড়াইয়া আছে। সকলেই অপরিচিত। দেবীসিংহ যেই চক্ষু চাহিলেন, আর চারিদিকে আনন্দধ্বনি হইল। সকলে বলিল,—"আর কোনো ভয় নাই। ধর্মদত্ত এইবার প্রাণ পাইল।

ধর্মের মা! আর কাঁদিয়ো না, আর কোনো ভয় নাই। বাছাকে লইয়া এখন ঘরে যাও।"

যে-স্ত্রীলোকটির কোলে তাঁহার মাথা ছিল, তিনি অতি স্নেহের সহিত দেবীসিংহের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন.—"ধর্মদত্ত! বাবা আমার! এখন একটু কী ভাল হইয়াছ?"

দেবীসিংহ উত্তর করিলেন,—"তুমি কে? আমি তো তোমাকে চিনি না! আমার নাম তো ধর্মদত্ত নয়! আমার নাম যে দেবীসিং!"

স্ত্রীলোকটি কাতরস্বরে বলিলেন,—"কৈ গা। আমার ধর্মের তো এখনও জ্ঞান হয় নাই! আমার ধর্মদত্ত তো কৈ এখনও ভাল হয় নাই। সে কি বাবা ধর্ম! দশমাস দশ দিন তোমাকে গর্ভে ধরিলাম, আজ এগার বৎসর ধরিয়া প্রতিপালন করিলাম, আমাকে তুমি চিনিতে পার না?"

সকলে বলিলেন,—"ধর্মের মা! ভাবিয়ো না, জলে ডুবিয়া গেলে ওরূপ হয়। এখনি জ্ঞান হইবে, সকল কথা মনে পড়িবে। ধর্মদত্ত! ঐ দেখ, তোমার পিতা ভারত সিংহ বিষন্ন মনে বসিয়া আছেন: ঐ দেখ, রামসেবক, যিনি তোমাকে নদীর জল হইতে তুলিয়াছেন! এই দেখ, তোমার খেলাইবার সঙ্গী, প্রতাপ ও মহাবীর। আর এই দেখ, বীরবালা, যে খেলা করিতে করিতে নদীর জলে পড়িয়া গিয়াছিল। যাহাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত তুমি জলে ঝাঁপ দিয়াছিলে। কিনারার

দিকে যাহাকে ঠেলিয়া দিয়া, তুমি নিজে গভীর জলে ডুবিয়া গিয়াছিলে। ভাগ্যক্রমে মহাবীর, প্রতাপ প্রভৃতি বালকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমে রামসেবক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। তাই তো বাছার প্রাণরক্ষা হইল! তাহা না হইলে ভারত সিংহের আজ কি সর্বনাশই হইত! ধর্মদত্ত! এই দেখ, বীরবালা। বীরবালাকে চিনিতে পার?"

দেবীসিংহ বীরবালার পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,—বীরবালা একটি পাঁচ বৎসরের সুরূপা বালিকা। নিজের শরীর পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,—বসন আর্দ্র, হাত-পা-গুলি ছোট ছোট, —দশ এগার বৎসরের বালকের যেরূপ হয়, সেইরূপ। পিতা ভারত সিংহকে দেখিলেন, সজলনয়না মাতাকে দেখিলেন। সমবয়স্ক মহাবীর, প্রতাপ প্রভৃতিকে দেখিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ক্রমে তাঁহার মনে বিশ্বাস হইল যে, তিনি দেবীসিংহ নন, তিনি ধর্মদত্ত। তিনি বিংশতি বৎসরের যুবক নন, তিনি একাদশ-বর্ষীয় বালক। স্বপ্নে আপনাকে দেবীসিংহ মনে করিয়াছিলেন, স্বপ্নে তিনি বীর হনুমানকে দেখিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অমাবস্যা বাবাজী

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ধর্মদত্তকে লইয়া সকলে বাড়ি গেলেন। তাঁহার পিতা ভারত সিংহ বলিলেন,—"ধর্মদত্ত! সৌভাগ্যক্রমে আজ তোমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। বাবাজীকে গিয়া প্রণিপাত কর।"

বাবাজী সন্ন্যাসী। নাম অমাবস্যা বাবাজী। বাবাজী দীর্ঘদন্ত, লোহিতলোচন, ঘোর কৃষ্ণকায়। ঘোর কৃষ্ণকায় বলিয়াই বোধ হয়, তাঁহার নাম অমাবস্যা বাবাজী হইয়া থাকিবে। ইনি অতি সাধু পুরুষ। কেবল দুগ্ধ খাইয়া প্রাণধারণ করেন। তাই ভারত সিংহ ইঁহাকে অতি ভক্তি করেন। চিমটা হাতে দেশে দেশে তীর্থ পর্যটন করিতে দেন না। নিজ ঘরে রাখিয়া ভারত সিংহ ইঁহাকে যথাবিধি পূজা করেন। সতত

হার আজ্ঞাধীন হইয়া থাকেন। ভারত সিংহের ঘরে অমাবস্যা বাবাজী র্বেসর্বা, যা করেন তাই হয়।

ধর্মদত্ত গিয়া বাবাজীকে প্রণাম করিলেন, পদধূলি মস্তকে গ্রহণ রিলেন। কোনো কথা না বলিয়া বাবাজী ধর্মদত্তকে চিমটা দ্বারা বালে প্রহার করিলেন। আর বলিলেন,—"ধর্মদত্ত! দিন দিন তুই তি মূর্খ ও অতি নির্বোধ হইতেছিস্! শাস্ত্রে আছে,—'চাচা, আপন াচা।' তাই প্রতিবাসীর গৃহে ডাকাত পড়িলে সেকালের লোকে াপনার আপনার ঘরে দোহারা তেহারা খিল ও হুড়কো দিয়া বসিয়া াকিত, কেহ বাহির হইত না। আজকালের ছেলেরা সব হইল কি? রের জন্য প্রাণসমর্পণ! পাঁচ বৎসরের একটা মেয়ে বাঁচাইতে জলে াপ! এ সকলই কলির মাহাত্ম্য!"

চিমটার প্রহারে ধর্মদত্ত চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সজল-য়নে পিতার মুখপানে চাহিলেন। ভারত সিংহ কিছুই বলিলেন না। াতা আসিয়া ধর্মদত্তকে বাড়ির ভিতর লইয়া গেলেন। মাতা বলিলেন, —"বাছা, ধর্ম! চুপ কর, আর কাঁদিয়ো না। কালা-মুখ সন্ন্যাসী এখান ইতে যায়ও না, মরেও না। কী গুণে যে কর্তাকে এত বশীভূত রিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না। উহার কু-পরামর্শে কর্তাটি দিন দিন ন জন্তু হইতেছেন! কালা-মুখ আমার সোনার সংসার ছারখার রিল।"

কিছু দিন পরে, বীরবালার পিতা, জবরদস্ত সিংহ আসিয়া ভারত-িংহের নিকট প্রস্তাব করিলেন,—"মহাশয়! ধর্মদত্ত আমার কন্যার াণরক্ষা করিয়াছে। যদি অনুমতি হয় ত বীরবালাকে ধর্মদত্তের হাতে মর্পণ করি। বীরবালা,—ধীর, লজ্জাশীলা ও সুন্দরী।"

এ কথায় সকলে সম্মত হইলেন। ধর্মদত্তের সহিত বীরবালার বাহ হইল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ত হইতে লাগিল। এদিকে ভারত সিংহের ঘরে ধর্মদত্ত বাড়িতে াগিলেন, ওদিকে জবরদস্ত সিংহের গৃহে বীরবালা বাড়িতে লাগিলেন। র্মদত্ত ও ধর্মদত্তের মাতা কিন্তু বড়ই অসুখে কালাযাপন করিতে

লাগিলেন। ভারত সিংহের গৃহে অমাবস্যা বাবাজীর এখন একাধিপত্য
ধর্মদত্তকে তিনি দুটি চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারেন না। বিনা দো
সর্বদাই তাঁহাকে প্রহার করেন। টাকাকড়ি বিষয়-বিভব, সবই এখ
অমাবস্যা বাবাজীর হাতে। ধর্মদত্তের মাতাকেও তিনি আহার পরিচ্ছদে
ক্লেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে ভারতসিংহ নির্জীব জড় পদার্থে
মতো জবু-থবু হইয়া পড়িলেন।

এইরূপে সাত আট বৎসর কাটিয়া গেল। এক দিন অমাবস্
বাবাজী ধর্মদত্তকে চিমটার দ্বারা অতিশয় প্রহার করিলেন। ধর্মদত্তে
শরীরে শতধারা হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সেইদিন বিনয় করি
ধর্মদত্ত বাবাজীকে বলিলেন,—"মহাশয়! দেখুন, আমি আর এখ
বালক নই, এক্ষণে বড় হইয়াছি। আমাকে বিনা দোষে প্রহার ক
আর ভাল দেখায় না। আমাকে আর মারিবেন না। স্মরণ রাখিবে
যে, খরতর ক্ষত্রিয়-শোণিত আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইহেছে।"

বাবাজী পরিহাস করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিছুদিন পরে পুনরা
তিনি ধর্মদত্তকে প্রহার করিলেন। ধর্মদত্ত সেদিন আর ক্রোধ সংবর
করিতে পারিলেন না। বাবাজীর গলা টিপিয়া ধরিলেন। সবল
ক্ষত্রিয় যুবার সহিত শীর্ণকায় বাবাজী পারিবেন কেন? শ্বাসরোধ হই
বাবাজী মৃতপ্রায় হইলেন। কেবল প্রাণটি থাকিতে থাকিতে ধর্মদ
তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। রাগদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া বাবাজী বলিলেন
—"ভাল! দেখিয়া লইব! অমাবস্যা বাবাজী গায়ে হাত তুলিয়া
বাঁচিতে পারে, এ কথা আমি দেখিয়া লইব।"

অল্পদিন পরে ভারত সিংহের একটি কন্যা হইল। সূতিকাঘরে
সমাগতা প্রতিবাসিনীগণ নবপ্রসূতা কন্যাটির অলৌকিক রূপ-লাব
দেখিয়া আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন। কন্যার রূপে সূতিকাঘর প্রভাম
হইল। সকলে একবাক্য হইয়া বলিলেন,—'ধর্মের মা! তোমা
কন্যাটির কি অদ্ভুত রূপ হইয়াছে! দিদি, আঁতুড়-ঘরে এরূপ রূপ
কখনো দেখি নাই! কন্যাটির নাম কমলা রাখ।' সকলে মিলি
কন্যাটির নাম কমলা রাখিলেন।

ভারত সিংহের কন্যা হইয়াছে শুনিয়া অমাবস্যা বাবাজীর রাগ হইল। ভারত সিংহকে তিনি বলিলেন—"মহাশয়! আপনার বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলে কন্যা কখনও জীবিত থাকে নাই। আপনার পূর্বপুরুষদিগকে শ্বশুর বলিয়া কেহ সম্বোধন করেন নাই। ইংরাজের দৌরাত্ম্যে আজ ক্ষত্রিয়কুল লঙ্কিত হইতেছে সত্য, কিন্তু আমি আপনার গৃহে থাকিতে আপনার কুল কলঙ্কিত হইতে দিব না। এক্ষণে যেরূপ অনুমতি হয়।"

ভারতসিংহ এক্ষণে জড় পদার্থ। জ্ঞানগোচর কিছুই নাই। তিনি বলিলেন,—"যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করুন।"

অমাবস্যা বাবাজী সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নীচ জাতি ধাত্রীকে অর্থ দ্বারা বশ করিলেন। একদিন ঘোর নিশীথে, ধর্মের মাতাকে নিদ্রিত পাইয়া সেই ধাত্রীর সাহায্যে বাবাজী কমলাকে চুরি করিলেন। পূর্বপ্রচলিত প্রথা অনুসারে কন্যাটিকে মৃত্তিকা-পাত্রে রাখিলেন। সেই হাঁড়িতে একটু গুড় ও একটুখানি তুলা রাখিয়া সরা চাপা দিলেন! গ্রামের বাহিরে জনশূন্য মাঠের মাঝে লইয়া হাঁড়িটিকে পুতিয়া ফেলিলেন। গর্ত খুঁড়িবার সময় ও হাঁড়ি পুতিবার সময় বাবাজী বার বার এই মন্ত্রটি পাঠ করিতে লাগিলেন,—

কমলা তুমি হও দূর।
যাও শীঘ্র যমপুর॥
খাও গুড় কাটো সূত।
তোমায় চাই না—চাই পুত॥

রাজপুতদিগের মনে বিশ্বাস এই যে, নবপ্রসূতা কন্যাকে সংহার করিলে, সেই কন্যাই বারবার আসিয়া গৃহে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এইরূপ প্রণালীতে মন্ত্রপাঠ করিয়া জীবিত কন্যাকে মৃত্তিকাসাৎ করিলে পুনরায় আর সে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে না।

মাতা জাগরিত হইয়া শিশুটিকে দেখিতে পাইলেন না। সূতিকাঘরে হাহাকার পড়িয়া গেল। কত কাঁদিলেন, কত কাটিলেন। মনে করিলেন,—তাঁহার অসাবধানতায় কন্যাকে শৃগালে লইয়া গিয়াছে।

অমাবস্যা বাবাজী গোপনভাবে পুলিশের নিকট পত্র পাঠাইলেন।

তাহাতে ধর্মদত্তের প্রতি ভগিনীবধের দোষারোপ করিলেন। পুলিসের দ্বারা তদন্তের সময় অমাবস্যা বাবাজী প্রকাশ্যভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। ধর্মদত্ত রাত্রিকালে হাঁড়ির ভিতর করিয়া শিশুটিকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন, তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এইরূপ ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। ধাত্রীও সেইভাবে সাক্ষ্য দিল। প্রতিবাসী রামসেবক বলিলেন যে, রাজপুতেরা কিরূপে আপনাদিগের কন্যা বধ করিত, এ কথা ধর্মদত্ত তাঁহাকে কিছুদিন পূর্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রামসেবক মিথ্যা বলেন নাই, কুতূহলবশত ধর্মদত্ত সত্যই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য ভারত সিংহ কিছুমাত্র যত্ন করিলেন না; একটি পয়সাও খরচ করিলেন না। ধরাশায়িনী শোকাকুলা পত্নীর অবিরত অশ্রুধারায় তাঁহার মন ঈষৎমাত্রও ভিজিল না। অমাবস্যা বাবাজী যে তাঁহার ঘোর সর্বনাশ করিতেছে, সে জ্ঞান তাঁহার হইল না। বীরবালার পিতা অনেক অর্থব্যয় করিলেন। সুচতুর উকিল নিযুক্ত করিয়া জামাতার রক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সামান্য বালিকা হইয়াও কুলের কুলবধূ হইয়াও এই বিপদের সময় স্বামিরক্ষার নিমিত্ত, বীরবালা উকিলের বাড়ি, সাক্ষীদিগের বাড়ি, যত লোকের বাড়ি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ধর্মদত্তের উকিল আসিয়া ভারত সিংহকে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"ধর্মদত্ত যে ভগিনীকে বধ করে নাই, তাহা নিশ্চয়। অমাবস্যা বাবাজীর কুটিলতা ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। প্রকৃত ঘটনা কি মহাশয়ের বোধহয় অবিদিত নাই। অতএব সকল কথা প্রকাশ করিয়া পুত্রের প্রাণরক্ষা করুন।" ভারতসিংহ, না রাম না গঙ্গা,—কোনো উত্তর করিলেন না। জড়ের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

জবরদস্ত সিংহ সমুদয় চেষ্টা হইল। ধর্মদত্তের মাতা, পুত্রের হিতকামনায় দেবতাদিগকে রাত্রিদিন ডাকিতেছেন। দেবতারা তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন না। বীরবালার কান্নায় দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইল বটে, কিন্তু তাঁহার স্বামী অব্যাহতি পাইলেন না যাবজ্জীবনের নিমিত্ত ধর্ম দ্বীপান্তরিত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ঘোমটাবতী

জামাতা-শোকে জবরদস্ত সিংহ অতিশয় কাতর হইলেন। ক্রোধে সর্বশরীর তাঁহার কাঁপিতে লাগিল। অমাবস্যা বাবাজীর যথোচিত দণ্ড করিয়া অবশেষে তাহার প্রাণবধ করিবেন, মনে মনে এই সঙ্কল্প করিলেন। বিষণ্ণ-বদনে, অশ্রুনয়না মলিন-বসনা বালিকা কন্যাকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রি হইয়াছে, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। মাটিতে পড়িয়া বীরবালা অবিরত কাঁদিতেছেন। বেড়াইতে বেড়াইতে ঘোমটাবতী বলিয়া একটি উপদেবতা সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বীরবালাকে শিশুকাল হইতে তিনি দেখিয়া আসিতেছেন। বীরবালাকে আজ দুঃখসাগরে নিমগ্না দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। ঘোর রজনীতে বীরবালা মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছেম, ঘোমটাবতী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এরূপ সময়ে বীরবলার আর ভয় কি? তিনি উঠিলেন। ঘোমটাবতী যেদিকে যাইতে লাগিলেন, সেইদিকে তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন। গ্রাম পার হইয়া, দুই জনে মাঠের মাঝে উপস্থিত হইলেন। হাত বাড়াইয়া ঘোমটাবতী একটি স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন।

তাহার পর ঘোমটবতী অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। বীরবালা দেখিলেন যে, সেই নির্দিষ্ট স্থানের মৃত্তিকা কোমল, যেন অল্প দিবস পূর্বে সে-স্থান কেহ খনন করিয়াছিল। হাত দিয়া বীরবালা সেই স্থানের মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন। খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটি হাঁড়ি বাহির হইল। হাঁড়িটি তুলিয়া মুখের সরাখানি খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহার ভিতর একটু গুড় একটু খানি কার্পাস ও একখানি কাগজ রহিয়াছে। সেইগুলি বাড়ি লইয়া আসিলেন ও আপনার পিতাকে দেখাইলেন। জবরদস্ত সিংহ দেখিলেন যে, সেই কাগজখানিতে এইরূপ লেখা রহিয়াছে,—"আমার নাম শাহ সুলতান, নিবাস বোগদাদ। ভারতবর্ষ হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিতেছি। লোকজন লইয়া তাঁবু খাটাইয়া এই মাঠে আমি রাত্রিযাপন করিতেছিলাম। রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে নিকটে ঐ ঝোপের ভিতর

বসিয়াছিলাম। সেই সময় কৃষ্ণকায় এক ব্যক্তি একটি হাঁড়ি লইয়া মাঠে আসিল। হাঁড়ির ভিতর শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মন্ত্র পড়িতে পড়িতে সেই ব্যক্তি হাঁড়িটি পুতিল। সেই মন্ত্র শুনিয়া বুঝিলাম যে, শিশুটি রাজপুত-কন্যা, নাম কমলা। কৃষ্ণকায় ব্যক্তি চলিয়া গেলে, আমি তৎক্ষণাৎ মাটি খুঁড়িয়া হাঁড়িটি তুলিলাম। শিশুটি জীবিত রহিয়াছে দেখিলাম। আমি নিঃসন্তান। কমলাকে আমি আমার দেশে লইয়া চলিলাম।" বীরবালার পিতা ও বীরবালা সেই কাগজখানি ও হাঁড়িটি উকিল ও বিচারকর্তাকে দেখাইলেন। কিন্তু কোনো ফল হইল না। সকলে বলিল,—"তুমি যে নিজে এই কাগজ খানি প্রস্তুত কর নাই, তাহার প্রমাণ কি ?"

বীরবালা ও তাঁহার পিতা পুনরায় বিষণ্ণ চিত্তে বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। সেই রাত্রিতে বীরবালা গোপনে পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। পাগড়ি ভিতর নিজের দীর্ঘ কেশ লুকাইলেন। সেই রাত্রিতেই অতি গোপনভাবে বাড়ি পরিত্যাগ করিলেন। পিতার প্রবোধের জন্য একখানি কাগজে এই লিখিয়া গেলেন,—"পিতা! আমি কমলার অন্বেষণে চলিলাম। বোগদাদ নগরে চলিলাম। কমলাকে আনিয়া নিশ্চয় স্বামীর উদ্ধার করিব। স্বামিপদ ধ্যান করিয়া আমি যাইতেছি। নিশ্চয় কৃতকার্য হইব। আপনি চিন্তিত হইবেন না।"

বীরবালা চলিলেন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা বৈ তো নয় ? পথ-ঘাটের কথা তিনি কি জানেন ? লোকের মুখে শুনিলেন যে, বোগদাদ অনেক দূর, পশ্চিমদিকে। বীরবালা সেই পশ্চিমদিকে চলিলেন। একদিনে অধিক পথ যাইবেন—এরূপ ক্ষমতা কোথায় ? অল্প অল্প করিয়া প্রতিদিন পথ হাঁটিতে লাগিলেন। নানা ক্লেশ পাইয়া, নানা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অবশেষে ভারতের পশ্চিম-প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। একদিন এক স্থানে একটি মেলা হইতেছে, বীরবালা তাহা দেখিতে পাইলেন। বীরবালা সেই মেলার ভিতর প্রবেশ করিলেন। সে-স্থানে নানাদেশ হইতে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল। ভারতের নানা স্থানে হইতে শত শত সাধুগণও আসিয়া

সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বীরবালা দেখিলেন যে, একজন সাধু, সিদ্ধি বাটিয়া সকলকে বিতরণ করিতেছেন। যে চাহিতেছে তাহাকেই তিনি সিদ্ধি ও মিষ্টান্ন দিতেছেন। সহসা সকলের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। সকলের সন্দেহ হইল যে, সাধু হিন্দু নন্, মুসলমান। এইরূপ মনে করিয়া লোকে তাঁহার উপর ঢিল ও পাথর বর্ষণ করিতে লাগিল। সাধুর একটি কুকুর ছিল। কুকুরটি নিকটে শুইয়া ছিল। ক্রোধে অপর কাহাকে কিছু না বলিয়া, সাধু দুই হাতে কুকুরটির পা ধরিয়া তুলিলেন, নিকটস্থ একখানি পাথরের উপর আছাড় মারিলেন। কুকুরের মাথাটি ফাটিয়া গেল, চারিদিকে মস্তিষ্ক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, কুকুরটি তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। কুকুরের মৃতদেহ ফেলিয়া দিয়া সাধু সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া শিস্ দিতে লাগিলেন। সেই শিস্ শুনিয়া মৃত কুকুরটি তৎক্ষণাৎ বাঁচিয়া উঠিল, দৌড়িয়া সাধুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন, সকলেই তখন সাধুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মেলাস্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে সাধু অরণ্যময় নির্জন পর্বতের দিকে চলিলেন। বীরবালা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বার বার হাত নাড়িয়া সাধু তাঁহাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। বীরবালা তাহা শুনিলেন না, বীরবালা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। অবশেষে সাধু ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছ কেন? আমাকে এরূপ বিরক্ত করিতেছ কেন?" বীরবালা তাঁহাকে নিজের দুঃখের কথা সবই বলিলেন। সাধুর দয়া হইল। বৃক্ষপত্রে একখানি কবজ লিখিয়া বীরবালাকে দিলেন, ও বলিলেন,—"এই কবজখানি বাম হাতে ধরিয়া যেখানে ইচ্ছা করিবে, সেই দণ্ডে সেখানে উড়িয়া যাইতে পারিবে। ইহার সহায়তায় তুমি বোগদাদ গমন কর। সে-স্থান হইতে কমলাকে আনিয়া পতির উদ্ধারসাধন কর। আর আমার সঙ্গে আসিয়ো না। কিন্তু দেখিয়ো, কবজখানি যেন ছিঁড়িয়া না যায়। তাহা হইলে ফল হইবে না।"

চতুর্থ অধ্যায়

সবুজ ভূত

কবজ পাইয়া বীরবালার মনে আনন্দ হইল। অনায়াসে এখন বোগদাদ যাইতে পারিবেন, শাহ সুলতানের অনুসন্ধান হইবে। কমলাকে পাইবেন, পতির উদ্ধার হইবে, তাঁহার মনে এখন ভরসা হইল। বীরবালা মনে করিলেন,—"আচ্ছা দেখি দেখি, সত্য সত্যই কবজের এইরূপ গুণ আছে কি না? প্রথমে বোগদাদ না গিয়া অন্য কোনো স্থানে যাইবার বাসনা করি। কবজের পরীক্ষা করি। দেখি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হই কি না।"

এইরূপ ভাবিয়া তিনি কবজখানি বাম হাতের ভিতর করিলেন, আর মনন করিলেন,—"আমি পৃথিবীর মুড়োতে যাইব।" মনে করিতে-না-করিতে বীরবালা শূন্যপথে দ্রুতবেগে উড়িয়া চলিলেন। নিমিষের মধ্যে পৃথিবীর প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। বীরবালা দেখিলেন যে, অতি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা আমাদের এই পৃথিবীটি চারিদিকে বেষ্টিত। আকাশ ভেদ করিয়া সেই প্রাচীর রহিয়াছে। বীরবালা ভাবিলেন যে, তবে এই প্রাচীর হইল পৃথিবীর শেষ, ইহার ও-দিকে আর পৃথিবী নাই। প্রাচীরের ও-ধারে কী আছে? সেটি দেখিতে হইবে। প্রাচীরের গায়ে গোল গোল ছোট ছোট ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্র দিয়া বীরবালা উঁকি মারিলেন। সর্বনাশ! প্রাচীরের ও-ধারে পৃথিবীর ও-পারে কোটি কোটি খর্বকায় ভূত। প্রাচীর ধরিয়া ক্রমাগত তাহারা ঠেলিতেছে; ইচ্ছা,—প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করে। পৃথিবীতে আসিয়া পৃথিবী একেবারে রসাতল দিবে, এই তাদের বাসনা। কোটি কোটি খর্বকায় ভূতগণ একবার যদি প্রাচীর পার হইতে পারে, তাহা হইলে পৃথিবীর আর রক্ষা নাই। মনুষ্যকুল ধ্বংস করিয়া পৃথিবী তাহারা অধিকার করিবে। তাহাদের ভয়াবহ মূর্তি দেখিয়া বীরবালার প্রাণে ভয় হইল।

ছিদ্র দিয়া তাহারাও সেই সময়ে বীরবালাকে দেখিতে পাইল। ছিদ্র দিয়া হাত বাড়াইয়া তাহারা বীরবালার হাত ধরিল। কবজখানি কাড়িয়া লইবে, এই তাহাদের বাসনা। অতি কষ্টে বীরবালা হাত ছাড়াইয়া লইলেন। কিন্তু ঘোর বিপদের কথা। টানাটানিতে কবজখানি ছিঁড়িয়া গেল।

বোগদাদে না গিয়া পৃথিবীর প্রান্তভাগে মিছামিছি আসিয়া কবজখানি হারাইলেন। সেজন্য বীরবালা নিজেকে কত তিরস্কার করিলেন। কিন্তু কী করিবেন। আর উপায় নাই। পৃথিবীর প্রান্তভাগ হইতে পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। পৃথিবীর আগা কি এখানে? পথ আর ফুরায় না। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বীররালা এইরূপ পথ চলিলেন। তথাপি লোকালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেন না। একদিন এক পাহাড়ের নিকট বীরবালা একটি সবুজ বর্ণের বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধা গাছতলায় বসিয়া রৌদ্র পোহাইতেছিল ও চরকা কাটিতেছিল। বীরবালাকে দেখিয়া সে অমনি তাড়াতাড়ি চরকা ফেলিয়া উঠিল, আর আকাশপানে পা করিয়া বীরবালার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। বীরবালা যেদিক যান, আর আকাশ-পানে পা করিয়া বুড়ীও সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, অবশেষে বীরবালাকে বুড়ী যেই একটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করাইল, সঙ্গে সঙ্গে সব দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। বীরবালার বড় ভয় হইল। দ্বার ঠেলিতে লাগিলেন, কিছুতেই খুলিতে পারিলেন না। সবুজ বুড়ী আপনার আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল। সবুজ বুড়ীর বাড়িতে কোলাহল পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর বসিয়া বীরবালা তাহাদের সকল কথা শুনিতে পাইলেন। এই পৌষপার্বণে তাহারা বীরবালাকে কাটিয়া কুটিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া খাইবে, সবুজ ভূতেরা এই পরামর্শ করিতে লাগিল। চারিদিকে চাউল কুটিবার ধুম পড়িয়া গেল। ডাল বাটা হইতে লাগিল। অবশেষে বীরবালাকে কুটিবার সময় উপস্থিত হইল। অন্য ভূতদিগের মতো সবুজ ভূতেরা আচার-বিহীন নয়। ইহারা বৃথা মাংস ভক্ষণ করে না; ঠাকুরদের নিবেদন করিয়া বীরবালার

বলিদান হইবে। তাহার পর বীরবালার দেহকে কাটিয়া কুটিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। দুই-চারি জন সবুজ ভূতে বীরবালাকে ধরিয়া স্নান করাইল। পাহাড়ের মাথায় দেবতার মন্দিরে গিয়া পূজা দিল। যথাবিধি বীরবালাকে উৎসর্গ করিল। বলিদানের জন্য বীরবালাকে পাহাড়ের ধারে লইয়া গেল। একদিকে পাহাড়, অপর দিকে অতল গিরিগহ্বর। কোপ মারিবার জন্য কামার-ভূত খাঁড়া তুলিল। বীরবালা ভাবিলেন,—"মরিলাম তো। মরিতে তো আর বাকি নাই। কিন্তু আমার মাংস লইয়া সবুজ ভূতেরা যে পিঠে করিয়া খাইবে, তাহা হইতে দিব না।" এই মনে করিয়া তিনি পর্বতের শিখরদেশ হইতে ঝাঁপ দিলেন। শূন্যপথে বীরবালা পাহাড়ের তলদেশে পড়িতে লাগিলেন।

পাহাড়ের গায়ে একখানি পাথরের উপর সবুজ ভূতদিগের একটি ছেলে বসিয়া ছিল। ভাল কাপড়-চোপড় পরিয়া সবুজ-বুড়ীর বাড়িতে সে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিল। সবুজ বুড়ীর বাড়িতে আজ মানুষের পিঠে হইবে, পৌষপার্বণের দিনে পেট ভরিয়া মানুষের পিঠে খাইবে। তাই, মনের আনন্দে ভূতের ছেলেটি পায়ের উপর পা দিয়া পাথরের উপর বসিয়া আছে।

পড়িবি তো পড়, বীরবালা গিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িলেন। অকস্মাৎ কী আসিয়া আকাশ হইতে ঘাড়ে পড়িল, সেজন্য ভূত-বালক চমকিয়া উঠিল। তাহার বড় ভয় হইল। নিমন্ত্রণ খাওয়া ঘুরিয়া গেল। পলাইবার জন্য সে আকাশে উড়িল। দৃঢ়রূপে বীরবালা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। আকাশে উড়িতে উড়িতে ভূতবালক ক্রমাগত গা-ঝাড়া দিতে লাগিল, কিন্তু বীরবালা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না, বীরবালাকে সে কিছুতেই ফেলিয়া দিতে পারিল না। উড়িতে উড়িতে ভূতবালক গিয়া মহাসমুদ্রের উপর উপস্থিত হইল, উড়িয়া উড়িয়া তাহার শান্তি বোধ হইল। সমুদ্রের উপর একখানি জাহাজ যাইতেছে, সে দেখিতে পাইল। সেই জাহাজের মাস্তুলের উপর ভূতবালক গিয়া বসিল। এই সময় বীরবালা তাহার গলা ছাড়িয়া দিলেন, আর হাত

দিয়া মাস্তুলের দড়ি ধরিলেন। ছাড়ান পাইয়া ভূতবালক তৎক্ষণাৎ উড়িয়া পলাইল।

মাস্তুল হইতে বীরবালা নামিয়া জাহাজের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। জাহাজের লোকে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলে আশ্চর্য হইল যে, এই অকুল সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজের উপর মানুষ কোথা হইতে আসিল। আকাশ হইতে পড়িল না কি? যাহা হউক, বীরবালা সেই জাহাজে রহিলেন। অল্প দিন পরে প্রবল ঝড় উঠিল, পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ দ্বারা মহাসমুদ্র আলোড়িত হইতে লাগিল। জাহাজ ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। জাহাজের লোক মনে করিল, বীরবালার আগমনেই তাহাদের এই বিপদ ঘটিতেছে। এ মনুষ্য নয়। ভূত কি ডাইন হইবে। আকাশ হইতে মানুষ আবার কবে কোথায়, জাহাজের উপর পড়ে? এই মনে করিয়া রাত্রিকালে তাহারা বীরবালাকে সমুদ্র-জলে ফেলিয়া দিল। তরঙ্গ দ্বারা তাড়িত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে বীরবালা চলিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। যখন জ্ঞান হইল, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সমুদ্রকূলে বালির উপর পড়িয়া আছেন। আস্তে আস্তে উঠিলেন, উঠিয়া চলিতে লাগিলেন। চারিদিকে বালুকা-প্রান্তর, ধু ধু করিতেছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। যাইতে যাইতে একটি মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উটে করিয়া মনুষ্যটি আসিতেছিল। বীরবালাকে ধরিয়া সে আপনার নিকট উটের পৃষ্ঠে বসাইল, উট চালাইয়া দিল। সাত দিন সাত রাত্রি বীরবালা সেই মনুষ্যের সহিত উটের পৃষ্ঠে চলিলেন। অবশেষে তাঁহারা একটি নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই মনুষ্য বীরবালাকে লইয়া একজন অর্থবান ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিল। ক্রেতার নাম ইব্রাহিম। বীরবালা এক্ষণে জানিতে পারিলেন যে, তিনি আরবদেশে মক্কা নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

মক্কা নগরে ইব্রাহিমের ঘরে বীরবালা বাস করিতে লাগিলেন। সুন্দর শান্ত-প্রকৃতি বালক দেখিয়া ইব্রাহিম বীরবালাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। ইব্রাহিমের স্ত্রীও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন থাকিতে থাকিতে বীরবালা এক দিন ইব্রাহিমের বিবিকে আপনার সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন ইব্রাহিমের স্ত্রী বুঝিতে পারিলেন যে, বীরবালা বালক নন্—বালিকা। স্বামীকে তিনি সকল কথা বলিলেন। স্ত্রী-পুরুষে বীরবালার দুঃখে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। দয়া করিয়া তাঁহারা বীরবালাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিলেন ও অর্থ দিয়া বণিকদিগের সহিত বোগদাদে প্রেরণ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সাহেব ভূত

বীরবালা বোগদাদে উপস্থিত হইয়া শাহ সুলতানের বাড়ি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শাহ সুলতান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, অনায়াসেই তাঁহার তত্ত্ব পাইলেন। বীরবালা শুনিলেন যে, আজ এক বৎসর শাহ সুলতান মরিয়া গিয়াছেন। তিনি বিপুল ধন রাখিয়া গিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরের একটি শিশুকন্যাকে সেই বিষয়ের অধিকারিণী করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফরাগৎ হোসেন, কন্যাটিকে তাড়াইয়া দিয়া সমুদয় বিষয় আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তাহার পর নানারূপ দুষ্ক্রিয়া দ্বারা অল্পদিনে সমুদয় বিষয় তিনি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। শিশু-কন্যাটি পথের ভিখারী হইয়া অবশেষে একটি সাহেবের বাড়িতে চাকরি করিতেছেন। এই সকল কথা শুনিয়া বীরবালার নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, শিশুটি আর কেহ নয়—কমলা। এক্ষণে তিনি সেই শিশুটির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক সন্ধান করিয়া অনেক ক্লেশে, শেষে জানিতে পারিলেন যে, শাহ সুলতানের বাড়ি হইতে বিদূরিত হইয়া শিশুটি অনেক দিন ধরিয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল। একদিন গাছতলায় বসিয়া কাঁদিতেছিল, এমন সময় সেই পথ দিয়া একটি ইংরেজ বণিক ও তাঁহার স্ত্রী যাইতেছিলেন। নিরাশ্রয় শিশুটিকে দেখিয়া তাঁহাদের দয়া হইল। আদর করিয়া তাহাকে বাড়ি লইয়া গেলেন। সেই অবধি

ইংরেজ বণিকের ঘরে শিশুটি বাস করিতেছিল। ইংরেজ বণিকের সহসা সৌভাগ্যের উদয় হইল। সহসা তিনি বিপুল অর্থলাভ করিয়া স্বদেশে গমন করিলেন। শিশুটি তাঁহাদের সঙ্গেই রহিল।

এই কথা শুনিয়া বীরবালা হতাশ হইয়া পড়িলেন। বোগদাদে আসিয়াও কমলাকে পাইলেন না। কী করিবেন? এক্ষণে বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। বহুদিন পরে ভূমধ্যসাগর-কূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কী করিয়া বিলাত যাইবেন, বিষণ্ণবদনে সেইখানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। নিজের দুরদৃষ্ট ভাবিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। নিশ্বাসটি যেই ফেলিয়াছেন, আর কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া নিকটে কে কাঁদিয়া উঠিল। চমকিত হইয়া বীরবালা চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটি সাহেব-ভূত। সাহেব-ভূত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"ওগো তুমি আমার সহিত এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার কেন করিলে? জোরে নিশ্বাস ফেলিলে কেন? এই দেখ, আমার শরীরের জোড় সব খুলিয়া গেল।"

বীরবালা দেখিলেন, সত্য সত্যই সাহেব-ভূতের শরীরের জোড় সব খুলিয়া যাইতেছে। হাত, পা, নাক, কান খসিয়া পড়িতেছে।

সভয়ে বীরবালা বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি যে এখানে বসিয়াছিলেন, তাহা জানিতাম না। আপনার শরীরের জোড় যে এত ভঙ্গুর, তাহাও জানিতাম না। তাহা যদি জানিতাম, তাহা হইলে ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিতাম।"

সাহেব-ভূত পুনরায় বলিলেন,—"আমার আঙ্গুল খসিয়া গেল, এখন আঙটি পরিব কোথায়? হাত খসিয়া গেল, বালা পরিব কোথায়? পা খসিয়া গেল, মল পরিব কোথায়? নাক খসিয়া গেল, নোলক পরিব কোথায়? কান খসিয়া গেল, মাকড়ি পরিব কোথায়?"

সাহেব-ভূতের দুঃখে বীরবালা দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! ইহার কি কোনো উপায় নাই?" ভূত বলিলেন,—"যদি তুমি কাদা দিয়া আমার হাত পা ভাল করিয়া জুড়িয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি ভাল হই।" বীরবালা তাহাই করিলেন। সুস্থ হইয়া

সাহেব-ভূত বীরবালার সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। সকল কথা বলিয়া ও পরিচয় দিয়া বীরবালা সাহেব-ভূতকে বিলাত যাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সাহেব-ভূত বলিলেন,—"তাহার ভাবনা কি? আমি এইক্ষণেই তোমাকে টেলিগ্রাফে বিলাত পাঠাইয়া দিতেছি। জন-সাহেব কমলাকে বিলাত লইয়া গিয়াছেন, রঙ্গিণী মেমের নিকট তোমাকে আমি পাঠাইব। আমি জীবিত থাকিতে রঙ্গিণী আমার স্ত্রী ছিলেন। জন-সাহেবের মেমের সহিত রঙ্গিণীর ভাব আছে।" এই বলিয়া সাহেব-ভূত সমুদ্রের বালি দিয়া বড় একটি টেলিগ্রাফের তার প্রস্তুত করিলেন। বীরবালাকে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন।

বীরবালা তাহার ভিতর প্রবেশ করিলে সাহেব-ভূত তারের বাটটি টক্ টক্ টক্ টক্ করিয়া নাড়িলেন, আর সেই মুহূর্তেই বীরবালা বিলাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। একেবারে রঙ্গিণীর ঘরের ভিতর গিয়া পৌঁছিলেন। আরশির নিকট দাঁড়াইয়া রঙ্গিণী তখন বেশ-ভূষা করিতেছিলেন, মুখে পাউডার মাখিতেছিলেন। সহসা বীরবালাকে ঘরের ভিতর আসিতে দেখিয়া তিনি চমকিত হইলেন।

রঙ্গিণীর নিকট বীরবালা সকল পরিচয় দিলেন। বীরবালা তাঁহার নিকট দুই-একদিন বাস করিলেন। তাহার পর রঙ্গিণী তাঁহাকে জন-সাহেবের নিকট লইয়া গেলেন। জন-সাহেব বলিলেন যে, বোগদাদ হইতে কমলাকে তিনি বিলাতে আনিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এখানে আনিয়া কন্যাটিকে বিজয়ার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। বিজয়া অতি সম্ভ্রান্ত মহিলা, অতি দয়াময়ী, অতি পবিত্র-প্রাণা। শিশুটিকে তিনি নিজের কন্যার ন্যায়, অতি যত্নে প্রতিপালন করিতেছিলেন। এই কথা শুনিয়া বীরবালা বিজয়ার নিকট গমন করিলেন। কমলাকে দেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিলেন। অতি মধুর ভাষে বিজয়া বলিলেন,—"কমলা আমার প্রাণস্বরূপ। কমলাকে আমি কিছুতেই দিতে পারি না।" ভূমিতে জানু পাতিয়া, জোড় হাতে বীরবালা স্তুতি-বিনতি করিতে লাগিলেন, বীরবালা বলিলেন,—

"মহোদয়া! দয়াময়ি! দয়াময়ী বলিয়া সকলে আপনাকে জানে। আপনার প্রভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাস, দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে। আপনি পবিত্রতাময়ী। আপনার পবিত্রতা আদর্শস্থল হইয়া ঘরে ঘরে আজ পবিত্রতার আবির্ভাব করিয়াছে। আমার পতিধর্মের প্রতি আপনি কৃপা করুন। আমার শ্বশুর ভারতসিংহের প্রতি আপনি কৃপা করুন। ভারতসিংহ বৃদ্ধ বুদ্ধিহীন হইয়াছেন। তাঁহার সংসার আজ শ্মশানভূমি হইয়াছে। কমলাকে প্রদান করুন। ধর্মকে আমি পুনরায় দেশে আনয়ন করি! ভারতসিংহের অন্ধকার সংসার পুনরায় আলোকিত হউক।"

এইরূপ স্তুতি-বিনতি শুনিয়া বিজয়ার মনে দয়া হইল, ভারতসিংহের দুর্দশা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। বীরবালার হস্তে কমলাকে সমর্পণ করিলেন। বীরবালা তাঁহার কে হন, তাহা শুনিয়া কমলার আর আহ্লাদের অবধি রহিল না। মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু—সকলের মুখ দেখিবেন, সেজন্য কমলার মনে অপার আনন্দের উদয় হইল। বীরবালার গলা ধরিয়া কমলা কত কাঁদিলেন, কত হাসিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
পোষড়ার পিঠে

কমলাকে লইয়া বীরবালা দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। নিকটস্থ নগরে থাকিয়া পিতাকে সংবাদ দিলেন। জবরদস্তসিংহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কন্যাকে পাইয়া, কমলাকে দেখিয়া জবরদস্তসিংহের আর সুখের পরিসীমা রহিল না। কমলাকে দেখাইয়া, যথাবিধি উপায় করিয়া, ধর্মদত্তকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিলেন। অবশেষে ধর্মদত্ত, বীরবালা ও কমলাকে সঙ্গে লইয়া, তিনি ভারতসিংহের ভবনে উপস্থিত হইলেন। জবরদস্তসিংহ, বীরবালার পুনরাগমন, কমলা-লাভ, ধর্মের মুক্তি, এতদিন সকল কথা গোপন রাখিয়াছিলেন। আজ সকলকে লইয়া সহসা ভারতসিংহের গৃহে উপস্থিত হইলেন। পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূ দেখিয়া

ধর্মের মাতা যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলেন। অমাবস্যা বাবাজীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি ভারতসিংহকে বলিলেন,—"আপনার এ পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূকে কিছুতেই ঘরে লওয়া হইবে না।" এই কথা শুনিয়া জবরদস্তসিংহ আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। বাবাজীর চিমটাটি সেই স্থানে পড়িয়া ছিল; চিমটার অগ্রভাগ অগ্নির ভিতর ছিল। অগ্নির উত্তাপে চিমটার অর্দ্ধাংশ ঘোর রক্তবর্ণ হইয়াছিল। জবরদস্তসিংহ সেই চিমটাটি তুলিয়া লইয়া, তাহার অগ্রভাগ দ্বারা অমাবস্যা বাবাজীর নাক ধরিলেন। বাবাজীর নাসিকা পড় পড় শব্দে পুড়িতে লাগিল। তাহা হইতে দারুণ দুর্গন্ধময় ধূম নির্গত হইতে লাগিল। যন্ত্রণায় বাবাজী চীৎকার করিতে লাগিলেন। আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, বাবাজী নিজের পিঠে পাখির মতো পাখা বাহির করিলেন। অবশেষে জানালা দিয়া উড়িয়া পলাইলেন।

সকলে আশ্চর্যান্বিত হইলেন। সকলে তখন বুঝিলেন যে, অমাবস্যা বাবাজী মনুষ্য নন। অমাবস্যা বাবাজী যেই উড়িয়া গেলেন সঙ্গে সঙ্গে ভারতসিংহও যেন চমকিত হইয়া ঘোর নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলেন। নির্বাণ-প্রায় তাঁহার চক্ষু দুইটিতে পুনরায় আলোকের সঞ্চার হইল, তাঁহার মুখ প্রভাময় হইল। সহসা ভারতসিংহের যেন পুনরায় নব-যৌবনের উদয় হইল। ধর্মদত্ত, বীরবালা ও কমলাকে তিনি সাদরে কোলে করিলেন। মোহবশত অন্ধ হইয়া স্ত্রী-পুত্রকে নানারূপ ক্লেশ দিয়াছিলেন, দেবদুর্লভ ধর্ম হেন পুত্র ও কমলা হেন কন্যারত্নকে তিনি বিসর্জন দিয়াছিলেন, সেজন্য ভারতসিংহ এক্ষণে মনোদুঃখে অতিশয় কাতর হইলেন, আকুল হইয়া মনের বেদনায় তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে বীরবালা ভাবিলেন,—"যদি ঘোমটাবতীকে দেখিতে পাই, তো তাঁহার চরণে একবার প্রণাম করি; তিনি আমার বড় উপকার করিয়াছেন।' এইরূপ ভাবিয়া বীরবালা একাকিনী মাঠের দিকে চলিলেন। কমলাকে যেখানে মাটিতে পোঁতা হইয়াছিল, বীরবালা সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষতলে ঘোমটাবতী বসিয়া

হইয়াছেন, বীরবালা দেখিতে পাইলেন। করজোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! আপনি কে বলুন! আপনি যে ভূতিনী নন, তাহা আমি নিশ্চয় জানি। আপনি কে বলুন।" কোনো উত্তর না দিয়া, ঈষৎ হাসিয়া ঘোমটাবতী ঘোমটা খুলিলেন। বিদ্যুৎপ্রায় তাঁহার রূপের ছটায় জগৎ আলোকিত করিল। বিশ্বসংসার শান্তিসুধায় সিক্ত হইল। আকাশের দ্বার উন্মুক্ত হইল। অপ্সরাগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্নর বালকগণ মধুরতানে বীরবালার সাহস, বিক্রম ও পতিভক্তির গুণগান করিতে লাগিল। অপ্সরা-বালিকাগণ বীরবালার বেশভূষা করিতে লাগিল।

বীরবালাকে মাঠের দিকে যাইতে ধর্মদত্ত দেখিয়াছিলেন। বীরবালার প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাঁহার ভাবনা হইল। বীরবালার অনুসন্ধানে তিনিও মাঠের দিকে চলিলেন। মাঠের মাঝখানে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া ধর্মদত্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বীরবালা বসিয়া আছেন। অপ্সরা-বালিকাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। কেহ তাঁহার চুল বাঁধিয়া দিতেছে, কেহ তাঁহার সুকোমল শরীর সুগন্ধ দ্বারা সিক্ত করিতেছে। আকাশপানে চাহিয়া দেখিলেন যে, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ধর্মদত্ত আকাশের দিকে মাথা আরও উঁচু করিলেন। সবলে মাথাটি যেই তিনি তুলিলেন, আর তাঁহার ঘাড়টি খুট করিয়া উঠিল।

ঘাড়টি যেই খুট করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই অপূর্ব দৃশ্য তাঁহার নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইল। দেখিলেন যে তিনি সরযূকূলে অশ্বত্থমূলে ঠেশ দিয়া বসিয়া আছেন। আপনার শরীরপানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, সে শরীর ধর্মদত্তের শরীর নয়, যেন আর কাহার শরীর। 'আমি কে?'—এই কথা লইয়া তাঁহার মনে ঘোরতর সংশয় উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সকল কথা মনে পড়িল। তিনি অযোধ্যানিবাসী দেবী সিংহ। স্বপ্নে তিনি আপনাকে ধর্মদত্ত মনে করিয়াছিলেন, আর এই সমস্ত অদ্ভুত রহস্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাকে স্বপ্নই বা কী করিয়া বলি। ক্ষণকালের নিমিত্তও তিনি তো

নিদ্রা যান নাই। কেবল একবার মাত্র তাঁহার ঢুল আসিয়াছিল। সম্মুখ দিকে তাঁহার মাথাটি একবার ঢুলিয়া পড়িয়াছিল, আর সেই সময় তাঁহার ঘাড়টি একটু খুট করিয়াছিল। সেই মুহূর্তেই তিনি মাথাটি সোজা করিয়া লইলেন, আর ঘাড়টি আর-একবার খুট করিল। এ কতটুকু সময়? কিন্তু এই ক্ষণকালের মধ্যেই তিনি এত কাণ্ড দেখিলেন, এত কাণ্ড শুনিলেন, এত কাণ্ড করিলেন। কী আশ্চর্য ব্যাপার! স্বপ্ন হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু বীরবালা যে স্বপ্ন, প্রকৃত দেবীরূপিণী নারী নন, সে-কথা ভাবিয়া দেবীসিংহের মন বড়ই কাতর হইল। 'যদি বীরবালাকে আর দেখিতে পাইব না, তবে এ জাগরণে প্রয়োজন কী? চিরনিদ্রায় কেন আমি অভিভূত হইয়া থাকিলাম না?'

দেবীসিংহ অতি কাতর হইয়া বৃক্ষের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন যে, বৃক্ষ-ডালে একটি হনুমান বসিয়া রহিয়াছে। সেইক্ষণেই চতুর্দশবর্ষীয়া একটি পরমা সুন্দরী বালিকা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়! অযোধ্যা কি এই পথ দিয়া যাইতে হয়?" সে-কণ্ঠস্বর, সে-রূপ, দেবীসিংহের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে, কখনও আর ভুলিবার নহে। চকিত হইয়া দেবীসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে ও, বীরবালা?"

বালিকাটি উত্তর করিল,—"আজ্ঞা, হাঁ! আমার নাম বীরবালা বটে! আপনি আমার নাম কী করিয়া জানিলেন?"

এই কথা বলিতে বলিতে বালিকাটির পিতা এবং তদীয় পরিবারবর্গ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরিচয় পাইয়া দেবীসিংহ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারাই তাঁহার শ্বশুর ও শ্বশুরবাড়ির লোক, বালিকাটি তাঁহার স্ত্রী। আর দেখ আশ্চর্যের কথা কী বলিব! এই যে বালিকা বীরবালা তাঁহার স্ত্রী, 'ইনি যেন সেই বীরবালা', সেই স্বপ্নের বীরবালা। অদ্ভুত মানিয়া দেবীসিংহ গাছের দিকে পুনরায় চাহিয়া দেখিলেন। গাছের উপর বীর হনুমান বসিয়া হাসিতেছেন। দেবীসিংহ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সাদরে শ্বশুর ও তাঁহার পরিবারবর্গকে দেবীসিংহ বাড়িতে লইয়া গেলেন। বীরবালার রূপে, বীরবালার গুণে দেবীসিংহের পিতামহী ও আত্মীয়-স্বজন প্রতিবাসীরা মুগ্ধ হইলেন।

পৌষপার্বণের সময় গৃহে কুটুম্বেরা সমাগত হইয়াছেন। পিতামহী কত চাউল কুটিলেন, কত ডাল বাটিলেন, কত নারিকেল কুরিলেন। নানাবিধ পিঠাপুলি করিয়া কুটুম্বদিগকে আহার করিতে দিলেন। এই বীরবালার গল্পটি যাঁহারা মনোযোগ দিয়া পাঠ করেন, চিরদিন তাঁহাদের ঘরে পৌষপার্বণের আনন্দ বিরাজ করে, তাঁহাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়।

পাপের পরিণাম

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

বিজয় কলিকাতায় পড়িতেন। অনেকদিন পূর্বে তাঁহার মাতার পরলোক হইয়াছিল। এক্ষণে পিতার পরলোক হইল। খরচ অভাবে তাঁহার লেখাপড়া বন্ধ হইয়া গেল। এক জ্যেষ্ঠভ্রাতা ব্যতীত সংসারে তাঁহার আর কেহ ছিল না। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পশ্চিমে কর্ম করিতেন। নিরুপায় হইয়া বিজয় তাঁহার নিকট চলিয়া গেলেন।

ভ্রাতৃজায়া তাহাতে বড় অসন্তুষ্ট হইলেন। প্রথমদিন হইতেই বিজয়কে তাড়াইতে চেষ্টা করিলেন। ভাই, স্ত্রীর নিতান্ত অনুগত। তাঁহার নিজের চক্ষু থাকিয়াও ছিল না, কর্ণ ছিল না, মন ছিল না। গৃহিণীর চক্ষু দিয়া তিনি দেখিতেন, তাঁহার কর্ণ দিয়া শুনিতেন, তাঁহার মন দিয়া তিনি ভাল-মন্দ বিচার করিতেন। ফলকথা, গৃহিণী তাঁহাকে যাহা বলিতেন, তিনি তাহাই করিতেন। ভাইও বিজয়কে দূর করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্বে দেশ হইতে একজন ভদ্রলোক এই স্থানে আসিয়াছিলেন। সামান্য একটি ঘর ভাড়া করিয়া নির্জনে একাকী তিনি বাস করিতেন। একমাত্র বিজয়ের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় তিনি ও বিজয় গঙ্গাতীরে কোন এক নিভৃত স্থানে গিয়া বসিতেন।

একদিন বিজয়কে নিতান্ত বিষণ্ণবদন দেখিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয় আপনার দুঃখের কাহিনী তাঁহাকে বলিলেন। এই লোকটির নাম বেণীমাধব হালদার।

বেণীবাবু বলিলেন,—"তুমি ভাবিও না, কলিকাতা গিয়া কর্মকাজের চেষ্টা কর। এক বৎসর খরচের নিমিত্ত তোমাকে দুইশত টাকা দিব। এক বৎসরের ভিতর কর্মকাজ হয় ভালই; না হয় পরে দেখা যাইবে।"

বিজয় তাঁহাকে বার বার ধন্যবাদ করিলেন, আর তিনি বলিলেন,—"এ টাকা আমি ভিক্ষা-স্বরূপ লইব না। সাধ্য হইলে আপনার টাকা আমি পরিশোধ করিব।"

বেণীবাবু বলিলেন,—"ধন্যবাদে আমার প্রয়োজন নাই। যদি যথার্থই তোমার মনে হয় যে, আমি তোমার উপকার করিলাম, তাহা হইলে আমার নিন্দা করিও না, আর আমার কোন অনিষ্ট করিও না।"

বিজয় বলিলেন,—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা।"

বেণীবাবু উত্তর করিলেন,—"লোকে বলে বটে, কিন্তু ইহা ঠিক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা নহে। অনেক পূর্বে একজন ফরাসি বলিয়াছিল,—"অমুক আমার নিন্দা করিতেছে বটে, কেন বল দেখি? আমি তো কখন তাহার কোন উপকার করি নাই।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কোন লোকের উপকার করিয়াছিলেন, তাহার পর সে আপনার অপকার করিয়াছিল?"

বেণীবাবু উত্তর করিলেন,—"এ সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।"

বেণীবাবু বিজয়কে টাকা দিলেন। কলিকাতা যাত্রা করিবার পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় বিজয় যথারীতি গঙ্গাতীরে সেই নিভৃত স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বেণীবাবুকে সে স্থানে দেখিতে পাইলেন না।

বিজয় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"আশ্চর্য কথা! কাল প্রাতে আমি কলিকাতা যাইব। তাঁহার নিকট আজ আমি বিদায় লইব। প্রতিদিন তিনি আসেন। আজ কেন আসেন নাই।"

বেণীবাবু একাকী থাকিতেন। তাঁহার বাসায় কোন লোককে যাইতে দিতেন না। বিজয়কেও তিনি মানা করিয়াছিলেন।

কিন্তু বিজয় আজ থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার বাসায় তিনি গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন যে, বেণীবাবুর ভয়ানক জ্বর হইয়াছে।

বিজয় বলিলেন,—"চারি দিকে বসন্ত হইতেছে। আপনি আরোগ্যলাভ না করিলে আমি কলিকাতা যাইতে পারি না।"

বেণীবাবু উত্তর করিলেন,—"জ্বরটা অধিক হইয়াছে বটে। বোধ

হয়, ম্যালেরিয়া জ্বর। দুই-এক দিনের মধ্যে আমি ভাল হইব। আমার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। কল্য প্রাতে তুমি কলিকাতায় চলিয়া যাও।”

বিজয় তাঁহার কথা শুনিলেন না। বেণীবাবুর জ্বর আরও বৃদ্ধি হইল। চারি দিনের দিন তাঁহার সর্ব শরীরে বসন্ত দেখা দিল। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিদিন বিজয় তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

পীড়া কঠিন হইয়া উঠিল। এ রোগের চিকিৎসকগণ আসিয়া বলিল যে, জীবনের কোন আশা নাই।

বিজয় বলিলেন,—“বেণীবাবু! আপনার আত্মীয়স্বজনকে তারে সংবাদ দিলে হয় না?”

বেণীবাবু উত্তর করিলেন,—“পৃথিবীতে আমার আত্মীয়স্বজন কেহ নাই। যে ছিল, সে অতি নির্দয়ভাবে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।”

রাত্রি অবসান হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি বিজয় বেণীবাবুর নিকট বসিয়া আছেন। রোগী অজ্ঞান-অভিভূত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এখন চক্ষু চাহিয়া তিনি বলিলেন,—“বিজয়! তুমি আমার অনেক করিলে! অতি ভয়ানক রোগ। এ রোগে মানুষ মানুষের নিকট যায় না। প্রাণের ভয় না করিয়া রাত্রিদিন তুমি আমার সেবা করিলে। দেখ, আমি নিতান্ত নিঃস্ব নহি। গোলোকধাম গ্রামে আমার বাটী, বাগান ও অনেক ভূমি আছে। সেই গ্রামে আমার জমিদারি। এ সমুদয় বিষয় উইল দ্বারা আমি তোমাকে দান করিব। তুমি শীঘ্র ইহার আয়োজন কর। আজ রাত্রিতেই আমাকে বোধ হয় যাইতে হইবে। অতএব তুমি বিলম্ব করিও না। শেষ অবস্থায় অজ্ঞান হইয়া পড়িতে পারি। উইল রেজেস্টারি না করিলেও চলে, কিন্তু তুমি আমার নিস্পর, সেজন্য রেজেস্টারি করিতে পারিলে ভাল হয়।”

বিজয় প্রথমে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। কিন্তু উইলের জন্য রোগী নিতান্ত ব্যস্ত হইলেন। বেণীবাবু তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে,

যদি তিনি আরোগ্যলাভ করেন, তাহা হইলে উইল ছিঁড়িয়া ফেলিলেই হইবে, অথবা অন্য উইল করিলেও চলিবে। অগত্যা বিজয় সম্মত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
উইল

কী করিয়া উইল করিতে হয়, কী করিয়া রেজেস্টারি করিতে হয়, বিজয় তাহার কিছুই জানিতেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ রাইচরণ রায় মহাশয়কে গিয়া তিনি সকল কথা বলিলেন। বিজয় যেদিন হইতে বসন্ত রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেইদিন হইতে জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে বাড়িতে আসিতে দিতেন না। বাহিরে দাঁড়াইয়া বিজয় ভ্রাতাকে সকল কথা বলিলেন।

রাইচরণ রায়মহাশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কোথাকার কে একজন নিষ্পর, যাঁহার সহিত অল্প দিন পূর্বে কিছুমাত্র আলাপ-পরিচয় ছিল না, তিনি বিজয়কে এত টাকার সম্পত্তি দিয়া যাইতেছেন, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্যের বিষয় কী আছে? মুখে তিনি আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মনে মনে তাঁহার হিংসা হইল। বিজয়কে বাহিরে রাখিয়া তিনি বাটীর ভিতর গমন করিলেন। কিছুক্ষণ গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া পুনরায় বাহিরে আসিয়া তিনি কনিষ্ঠকে বলিলেন,—"বিজয়, তুমি আমার এই পত্রখানি লইয়া সবরেজিস্ট্রারের নিকট গমন কর, তিনি আমার বন্ধু, আমার পত্র পাইলে তিনি বেণীবাবুর বাটীতে আসিবেন। আমার বন্ধু জগৎবাবু ও আর একজনকে লইয়া সে স্থানে আমি যাইতেছি। তাঁহারা উইলের সাক্ষী হইবেন।"

বিজয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাইচরণ রায়মহাশয় দুই জন বন্ধুকে লইয়া বেণীবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। সবরেজিস্ট্রারকে লইয়া বিজয়ও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখন উইল লেখা ও রেজেস্টারি হইল, তখন রাইচরণবাবু বিজয়কে ঔষধ আনিতে পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন,—"আমরা সব ঠিক করিতেছি। তোমাকে কোন কাগজে

স্বাক্ষর করিতে হইবে না। বেণীবাবুর নিমিত্ত তুমি শীঘ্র এই ঔষধ আনয়ন কর।"

ঔষধ লইয়া বিজয় যখন প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তিনি দেখিলেন যে, উইল হইয়া গিয়াছে। সকলে চলিয়া গিয়াছেন, কেবল রাইচরণবাবু রোগীর নিকট বসিয়া আছেন।

রাইচরণ রায়মহাশয় বলিলেন,—"এই দেখ, উইল রেজেস্টারি করা হইয়াছে। এ কাগজ এখন আমার নিকট থাকুক। আমি এক্ষণে বাটী গমন করি।"

রায়মহাশয় চলিয়া গেলেন। বিজয় রোগীর নিকট বসিয়া রহিলেন। সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। অপরাহ্নে পুনরায় জ্বর ফুটিল। রোগী পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রোগী এ পাশ ও-পাশ করিতে লাগিলেন। বিজয় মাঝে মাঝে তাঁহার মুখে একটু একটু জল দিয়া তাঁহার শুষ্ককণ্ঠ সিক্ত করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় একটু চেতন হইল। চক্ষু চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?"

বিজয় উত্তর করিলেন,—"আমাকে চিনিতে পারেন না? আমি বিজয়।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যে কাগজ তাহার নাম কী, তাহা লেখা হইয়াছে?"

বিজয় বলিলেন,—"উইল? হাঁ, তাহা লেখা হইয়াছে।"

বেণীবাবু পুনরায় বলিলেন,—"আর একটা কথা তোমায় বলিব। কিন্তু কি কথা, তাহা ঠিক মনে হইতেছে না। এই মনে আসিতেছে, আর তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যাইতেছে। রও—ঠিক কাপড়কাচা সাবাঙের মতো।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাপড়কাচা সাবাঙের মত? সে আবার কী? সাজিমাটি?"

বেণীবাবু বলিলেন,—"তাহার নাম আমার মনে হইতেছে না। এত বড়, লম্বা লম্বা। চক্ চক্ করে।"

বিজয় ভাবিলেন,—"রোগী প্রলাপ বকিতেছেন।"

কিছুক্ষণ পরে রোগী পুনরায় বলিলেন,—"কাছে মুখ লইয়া এস, তোমাকে চুপি চুপি বলিব। কোথায় রাখিয়াছি? অন্ধকার। মাথার উপর! তাহাকে কী কাষ্ঠ বলে, ঝম্-ঝম্, ঝম্-ঝম্, ঝম্-ঝমি গাছ। কচি কচি মেয়েরা পাড়িতে গিয়াছিল। চক্ষুর জল বাঘের গায়ে পড়িয়াছিল। সেই ঝম্-ঝমি কাঠের ভিতর। ঝম্-ঝম্।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় তিনি বলিলেন,—"চাবি লও। ঐ বাক্স খোল।"

বিজয় তাহাই করিলেন।

বেণীবাবু পুনরায় বলিলেন,—"দক্ষিণ পার্শ্বে দেখ। একখানি মেয়েমানুষের ছবি পাইবে। তাহার উপর কী আছে? মানুষের নাক। সোনা দিয়া বাঁধাইয়াছি। তুমি সর্বদা গলায় পরিধান করিবে। তোমার ভাল হইবে। তাহার পর ঐ স্ত্রীলোককে দিবে। হা, হা, হা, সোনা দিয়া বাঁধানো মানুষের নাক, হা, হা, হা।"

বিজয় যথার্থ ই বাক্সের ভিতর একখানি ছবি ও সোনা দিয়া বাঁধানো মানুষের শুষ্ক নাক দেখিতে পাইলেন। বিজয় মনে ভাবিলেন,—"মৃত্যুকালে ইনি আমাকে এই নাক গলায় পরিধান করিতে আজ্ঞা করিলেন। আমি ইঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।"

বেণীবাবু তাহার পর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আর জ্ঞান হইল না। মৃদুস্বরে মাঝে মাঝে মাঝে কেবল তিনি বলিতে লাগিলেন,—"অন্ধকার! মাথার উপর! কাপড়কাচা সাবাঙ। চক্‌চকে। ঝম্-ঝম্, ঝম্-ঝমি গাছ। তাহার ভিতর আমি রাখিয়াছি। সোনা বাঁধানো নাক। হা, হা, হা।"

নাকের কথা ব্যতীত অন্য সকল কথা প্রলাপ, অথবা ইহার কোন অর্থ আছে, বিজয় তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

রোগী ক্রমে সুস্থির হইলেন। রাত্রিশেষে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

টাকার লোভ

যথাসময়ে বিজয় বেণীবাবুর শ্রাদ্ধ করিলেন।

তাহার পর তিনি ভ্রাতাকে বলিলেন,—"দাদা, তবে আমি এক্ষণে বেণীবাবুর গ্রামে গমন করি। সে গ্রামের নাম গোলকধাম। বেণীবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কর্মচারীর নাম নৃসিংহ বড়াল। সকলে তাঁহাকে বড়ালমহাশয় বলে। তিনি তাঁহার স্ত্রীর সহিত বেণীবাবুর বাটীতে বাস করেন। চাষবাসের কাজ ও জমিদারির কাজ সমস্ত বিষয়ের তিনি তত্ত্বাবধান করেন। আমি সেস্থানে গিয়া উইলের প্রোবেট লইব ও বড়াল মহাশয়ের হিসাব দেখিব। উইলখানি আমাকে প্রদান করুন।"

রায়মহাশয় উত্তর করিলেন,—"তোমাকে আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। বেণীবাবু মনে করিলেন যে, তুমি বালক, তুমি বিষয় রক্ষা করিতে পারিবে না। সে জন্য তিনি আমার নামে উইল করিয়াছেন। সমুদয় বিষয় তিনি আমাকে দিয়াছেন।"

বিজয়ের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, —"সে কী দাদা! জ্যেষ্ঠ ভাই হইয়া আমাকে ফাঁকি দিলেন! বেণীবাবু পীড়িত ছিলেন। সে সময় তাঁহার জ্ঞান ছিল না।"

রায়মহাশয় বলিলেন,—"ও কথা বলিও না। যদি অজ্ঞান অবস্থায় তিনি উইল করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে উইল কোন কাজের নহে। কিন্তু তখন অজ্ঞান ছিলেন না। যাঁহারা সে সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবেন।"

বিজয় বলিলেন,—"তবে উইলে আমার নাম না লিখিয়া চুপি চুপি আপনি নিজের নাম বসাইয়া দিয়াছিলেন। বেণীবাবু তাহা জানিতে পারেন নাই।"

রাইচরণবাবু বলিলেন,—"উইল আমি নিজে হাতে লিখি নাই। জগজ্জীবনবাবু তাহা লিখিয়াছিলেন। সবরেজিস্ট্রারের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে

তিনি উইল পাঠ করিয়া বেণীবাবুকে শুনাইয়াছিলেন। জানিয়া শুনিয়া মস্ত বুঝিয়া তবে তিনি উইলে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। যাঁহারা সে সময় পস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের বরং তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।”

অনেকক্ষণ দুই ভ্রাতার তর্ক-বিতর্ক হইল। বিজয় নিশ্চয় বুঝিলেন য, দাদা শঠতা করিয়া উইলে নিজের নাম বসাইয়া দিয়াছেন। রুগ্ন বস্থায় বেণীবাবু তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে জ্যেষ্ঠকে তিনি বলিলেন,—“ভাই হইয়া আপনি বড়ই নিষ্ঠুর কাজ রিলেন। আপনাকে বেণীবাবু কেন বিষয় দিবেন,—আপনার নামে কন তিনি উইল করিবেন? আপনার সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় কছুই ছিল না। আপনি বড় ভাই, আপনাকে আর আমি কি বলিব, তান্ত অন্যায় করিয়া আপনি আমাকে বঞ্চিত করিলেন। যাহা উক, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আমাকে অর্ধেক বিষয় আপনি দান করুন।”

তাহাতেও রায়মহাশয় সম্মত হইলেন না। স্ত্রীর পরামর্শে বিজয়কে নি বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

বিজয় কলিকাতা যাইবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে ইতে তিনি ভাবিলেন,—“গোলকধামে বেণীবাবুর বাড়ি। বড়ালমহাশয় হার কর্মচারী। সে স্থানের ভাবটা কিরূপ, একবার জানিয়া যাই।”

বিজয় গোলকধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। লোককে জিজ্ঞাসা রিয়া বরাবর তিনি বেণীবাবুর বাড়িতে গমন করিলেন। সে স্থানে য়া শুনিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ,—বড়ালমহাশয়কে বেণীবাবুর মৃত্যু বাদ দিয়াছেন, আর তিনি কিরূপ উইল করিয়াছেন, তাহাও খিয়াছেন।

বিজয় আরও দেখিলেন, বড়ালমহাশয় বেণীবাবুর বাড়ির অনেকগুলি র মেঝে খনন করাইতেছেন।

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—“আপনার ভ্রাতা চারিদিন পরে এই ড়িতে আসিবেন। ঘরের মেঝে সব নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; সেজন্য ন্য মেঝেগুলি নূতন করিয়া আমি করিতেছি।”

সে কথায় বিজয়ের প্রত্যয় হইল না। মেঝে খুঁড়িয়া বড়ালমহাশয় যেন কী খুঁজিতেছেন,—এইরূপ তাঁহার সন্দেহ হইল। "অন্ধকার ঝম্-ঝমি গাছের ভিতরে আমি রাখিয়াছি।" মৃত্যুকালে বেণীবাবু এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। এ কথার কোন অর্থ আছে? বিজয় তাহা ভাবিতে লাগিলেন। সোনা দিয়া বাঁধানো নাক ও ছবির কথাও তিনি সেই সময় বলিয়াছিলেন। তাহা সত্য। তবে এ কথা সত্য হইবে না কেন? বেণীবাবুর সে সময় জ্ঞান ছিল না। তিনি এক দ্রব্যের নাম করিতে অন্য দ্রব্যের নাম করিয়াছেন। ইহাই সম্ভব। কিন্তু ঝম্-ঝমি গাছের মূলে যে কিছু সত্য আছে—বিজয়ের তাহা নিশ্চয় বিশ্বাস হইল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাড়ির চারিদিক দেখিতেছি বৃহৎ বাগানের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার ভিতর ঝম্-ঝমি নামক কি কোন গাছ আছে?"

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—"ঝম্-ঝমি গাছ! কস্মিনকালে এ গাছের নাম শুনি নাই।"

বিজয় বলিলেন,—"মৃত্যুকালে বেণীবাবু বলিয়াছেন যে, কাপড়কাচা সাবানের ন্যায় কোনরূপ চক্‌চকে দ্রব্য তিনি এই ঝম্-ঝমি গাছের ভিতর রাখিয়াছেন। ইহার অর্থ কী?"

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"তবে আর আমি বৃথা ঘরের মেঝে খনন করি কেন?"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মেঝে খুঁড়িয়া আপনি কী খুঁজিতেছেন?"

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—"কিছুই নহে। আর কী খুঁজিব!"

বিজয় বলিলেন,—"এই যে বলিলেন, তবে আর বৃথা খনন করি কেন?"

বড়ালমহাশয় সে প্রশ্নের ভালরূপ উত্তর দিলেন না। অন্য কথা বলিয়া সে কথা তিনি চাপা দিলেন।

বেণীবাবু একাকী পশ্চিমে গিয়াছিলেন কেন? সঙ্গতিপন্ন লোক হইয়া একাকী নিভৃতে কালযাপন করিতেছিলেন কেন,—এই সমুদয়

কথা বিজয় তাহার পর বড়ালমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তাহারও ভালরূপ কোন উত্তর পাইলেন না। এইমাত্র কেবল তিনি জানিতে পারিলেন যে, একদিন রাত্রিকালে সহসা তিনি কাশী চলিয়া গিয়াছিলেন।

তাহার পর সেই গ্রামের দুই-চারিজন লোককে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে, বেণীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী এই বাটীতে বাস করিতেন। বেণীবাবুর স্ত্রীকে গ্রামের লোক 'সোনা-বৌ' বলিয়া ডাকিত। তিনি সর্বদা পূজা-পাঠ ও জপ-তপ লইয়া থাকিতেন। কিছুদিন পরে একজন পীড়িত সন্ন্যাসী তাঁহাদের বাটীতে আগমন করেন। বিশেষরূপ যত্ন করিয়া বেণীবাবু তাঁহাকে রোগ হইতে মুক্ত করেন। সন্ন্যাসীর গায়ের বর্ণ নিতান্ত কালো ছিল। সেজন্য 'কালা-বাবা' বলিয়া সকলে তাঁহাকে ডাকিত। প্রায় তিন বৎসর 'কালা-বাবা' বেণীবাবুর বাড়িতে বাস করেন। তাহার পর সহসা বেণীবাবু, 'কালা-বাবা' ও 'সোনা-বৌ' কাশী চলিয়া গেলেন। কেন এরূপ সহসা তাঁহারা কাশী গমন করিলেন, কেহ তাহা জানে না। বড়ালমহাশয় বোধ হয় ইহার বিশেষ কারণ অবগত আছেন; কিন্তু কাহাকেও তিনি কোন কথা প্রকাশ করিয়া বলেন না।

সে সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন, বেণীবাবুর স্ত্রী 'সোনা-বৌ' বা কোথায় গেলেন, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া বেণীবাবু অন্য স্থানে গমন করিলেন কেন,—এ সমুদয় কথার সন্ধান বিজয় কিছুই পাইলেন না।

যাহা হউক, বিজয় কলিকাতা চলিয়া গেলেন। বেণীবাবু যে টাকা দিয়াছিলেন, সেই টাকায় তিনি সামান্যভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। সকল কাজেই তিনি প্রচুর লাভ করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন ধনবান্ লোক হইয়া উঠিলেন। বেণীবাবুর আদেশে সোনা দিয়া বাঁধানো সেই মানুষের নাক তিনি গলায় পরিয়াছিলেন। তাঁহার মনে ধ্রুববিশ্বাস হইল যে, এই নাক তাঁহার ভাগ্যের মূল।

চতুর্থ অধ্যায়

ভয়াবহ শব্দ

রাইচরণ রায়মহাশয় যথাসময়ে গোলকধামে আসিয়া বেণীবাবুর বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। বড়ালমহাশয় তাঁহাকে সমুদয় সম্পত্তি বুঝাইয়া দিলেন। বড়ালমহাশয়কে তিনি কর্মচ্যুত করিলেন না। যেমন বেণীবাবুর সময়ে তিনি কাজকর্ম করিতেন, এখনও তিনি সেইরূপ কাজ-কর্ম করিতে লাগিলেন। বেণীবাবুর আত্মীয়স্বজন কেহ ছিল না। সেজন্য উইলের প্রোবেট লইতে কোন গোলযোগ হয় নাই। কিন্তু অল্পদিন পরে গ্রামবাসীদিগের সহিত গোলযোগ উপস্থিত হইল। গ্রামের সকলেই রায়মহাশয়ের প্রজা। প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি করিতে রায়-মহাশয় চেষ্টা করিলেন। তাহাদের সহিত সেজন্য নানারূপ মোকদ্দমা-মামলা চলিতে লাগিল।

রায়মহাশয়ের পুত্র ছিল না, কেবল এক কন্যা। কন্যা ও জামাতা তাঁহার বাড়িতেই থাকিত। তাহা ব্যতীত রায়মহাশয়ের স্ত্রীর ভগিনীর কন্যা, অর্থাৎ বোন-ঝি ও তাঁহার দুই কন্যা এই সংসারে থাকিত। স্ত্রীর ভগিনীর কন্যা বিধবা ছিলেন।

সাত বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন রাত্রিতে রায়মহাশয়ের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। মানুষের পদশব্দ তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল। বাটীতে চোর প্রবেশ করিয়াছে, এইরূপ অনুমান করিয়া তিনি আলো জ্বালিলেন। দোতলার প্রায় সকল ঘরেই শারসি খড়খড়ি সম্বলিত জানালা ছিল। রায়মহাশয় যে ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন, বাটীর ভিতর দিকে তাহাতে দুইটি জানালা ছিল।

বিছানার নিকট যে জানালা, তাহার খড়খড়ি খোলা ছিল; কিন্তু শারসি অর্থাৎ কাচ বন্ধ ছিল। রায়মহাশয় দেখিলেন যে, দালানে দাঁড়াইয়া একজন ঘোর কৃষ্ণকায় লোক সেই কাচের উপর মুখ রাখিয়া উঁকি মারিতেছে। কাচের উপর এত সবলে সে আপনার মুখ রাখিয়াছে যে, তাহার নাক যেন বসিয়া গিয়াছে। নাক যেন নাই এইরূপ বোধ হইতেছিল।

"কে ও! কে ও!" বলিয়া রায়মহাশয় তাড়াতাড়ি ঘর হইতে াহির হইলেন। তুড়তুড় করিয়া পদশব্দ হইল। পূর্বদিকের সিঁড়িতেও সইরূপ শব্দ হইল। তাহার পর আর কিছু তিনি শুনিতে বা দেখিতে াইলেন না।

বাটীর সকলে জাগিয়া উঠিল। নীচে একজন চাকর বাস করিত, স দৌড়িয়া আসিল। রায়মহাশয়ের জামাতা উঠিলেন। বাহির াটীতে বড়ালমহাশয় বাস করিতেন, তিনি আসিলেন। সমস্ত বাটী কলে তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল। চোরের চিহ্নমাত্র কেহ দেখিতে াইল না। সদর-দরজা ও অন্তঃপুরের খিড়কি-দরজা সন্ধ্যার পর যেরূপ ন্ধ করা হইয়াছিল, এখনও সেইরূপ বন্ধ ছিল। আশ্চর্য কথা! চোর কিরূপে পলায়ন করিল? বন্ধ দ্বার-জানালার ভিতর দিয়া অথবা প্রাচীর ভদ করিয়া রক্ত-মাংসের শরীরবিশিষ্ট মানুষ পলাইতে পারে না। ায়মহাশয় কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন? অথবা যে কৃষ্ণকায় মূর্তি তিনি দখিয়াছিলেন, তাহা কি মানুষ নহে?

নানারূপ তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল। একমাত্র বড়ালমহাশয় নিস্তব্ধ রহিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"মানুষটা কিরূপ ঠিক করিয়া তাহা আমাকে বলিতে পারেন?"

রায়মহাশয় উত্তর করিলেন,—"কেবল নিমিষের নিমিত্ত সে আমার য়নগোচর হইয়াছিল। আমি অধিক কিছু বলিতে পারি না। তবে কবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, তাহার বর্ণ অতিশয় কালো। বয়ঃক্রম ল্লিশ হইবে। শারসিতে এরূপভাবে সে আপনার নাসিকা চাপিয়া রিয়াছিল যে, তাহাতে নাক একবারে চেপ্টা হইয়া গিয়াছিল। এরূপ লাক এ গ্রামে কেহ আছে?"

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"না, আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না।"

পরদিন গ্রামে কোন লোকের বাড়ীতে পাঁঠা বলিদান হইয়াছিল। াত্রিতে অনেকগুলি বন্ধুকে সে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। আহারাদির পর একজন লোক বাটি করিয়া একটু রাঁধা মাংস লইয়া যাইতেছিল। র্ষাকাল। অন্ধকার রাত্রি। বামহাতের উপর পাঁঠার বাটি রাখিয়া

ও দক্ষিণহস্তে লাঠির শব্দ করিতে করিতে কাদা-কিচা ভাঙ্গিয়া লোকটি আস্তে আস্তে যাইতেছিল। পথে একটি হেলা বেলগাছ হইতে কে "খুপ" করিয়া তাহার হাত হইতে পাঁঠার বাটিটা তুলিয়া লইল। ভয়ে আঁউ-মাঁউ করিয়া সে রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল ও কিছুদূর গিয়া একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

নদীর নিকট গ্রাম। গ্রামের ভিতর তখন বান আসিয়াছিল। মাঝে মাঝে ভূমি উচ্চ করিয়া তাহার উপর লোকে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। লোকের বাটীগুলি যেন দ্বীপের ন্যায় হইয়াছিল। নিকটস্থ কয়েক বাটী হইতে লোক দৌড়িয়া আসিল। অনেক কষ্টে সেই ভয়প্রাপ্ত লোককে তাহারা সচেতন করিল। সে রাত্রিতে বেলগাছের দিকে যাইতে কেহ সাহস করিল না। পরদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, বেলতলায় কাঁসার বাটিটি পড়িয়া আছে। মাংসটুকু ভূত চাটিয়া-পুটিয়া খাইয়াছে।

তাহার পর দুইদিন সন্ধ্যার পর দুইজন গ্রামবাসীর সহিত ভূতটির সাক্ষাৎ হইল। তাহারা অবশ্য ঘোরতর ভীত হইয়া চিৎকার করিতে করিতে তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিল। সেইদিন হইতে গ্রামের লোক সন্ধ্যার পর আর কেহ ঘর হইতে বাহির হইত না। সন্ধ্যা হইলেই দ্বার বন্ধ করিয়া সকলে আপনার আপনার ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিত। গ্রামের যে দুইজনের সহিত ভূতের সাক্ষাৎ হইল, তাহারা বলিল যে, সে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের ভূত, পুরুষ ভূত, আর তাহার নাক নাই।

দুইদিন পরে বিষম বর্ষা আরম্ভ হইল। ঘোর দুর্যোগ। রাত্রিদিন টিপ্ টিপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে মুষলধারে বৃষ্টি আসিতে লাগিল। আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল। বাতাসের শোঁ-শোঁ ও বৃষ্টি-ঝাপটের চট্ চট্ শব্দে পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল। নদীতে আরও প্রবলবেগে বান আসিল। গ্রাম পূর্ব অপেক্ষা আরও গভীরভাবে প্লাবিত হইল। এক একটি উচ্চ স্থানের গৃহগুলিকে দ্বীপের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। চারিদিকে প্রশস্ত বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত রায়মহাশয়ের বৃহৎ অট্টালিকা উচ্চ ভূমিতে ছিল। তাহার ভিতর নদীর জল কখন প্রবেশ করে না।

শোঁ-শোঁ, ভোঁ-ভোঁ, চট্ চট্, পট্ পট্,—ঝড় ও জলের শব্দ। একে বান, তাহাতে ভূতের ভয়, তাহাতে ঘোর দুর্যোগ। আজ দিনের বেলাতেই ঘর হইতে কেহ বড় বাহির হয় নাই। মানুষের কথা দূরে থাকুক, জীব-জন্তু কাক-পক্ষীও আজ আহারান্বেষণে বাহির হয় নাই। সন্ধ্যা হইল, নিবিড় অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। এমন সময়ে সেই বৃষ্টির শব্দ ভেদ করিয়া আর একপ্রকার শব্দ উত্থিত হইল। রায়মহাশয়ের বাটীর নিকট একটি বৃহৎ তেঁতুল গাছ আছে। সেই তেঁতুল গাছের নিবিড় শাখাপল্লবের ভিতর হইতে এই ভয়াবহ শব্দ উত্থিত হইল।

"হু হু! হু হু! হু হু হু!" শব্দটা এইরূপ। কিন্তু অতি ভয়াবহ শব্দ। অতি ভীষণ শব্দ।

পঞ্চম অধ্যায়
খাঁদা ভূত

তেঁতুল গাছ হইতে সেই ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল। সেই শব্দে গ্রামের সমস্ত লোক জাগরিত হইল। কি ভয়ানক ব্যাপার! এ কি সেই খাঁদা ভূতের কাণ্ড, অথবা অন্য কোন দানাদৈত্য রাক্ষসের চিৎকার। সকলের বক্ষঃস্থল ভয়ে ধড়্ ধড়্ করিতে লাগিল। ঘোর আতঙ্কে সকলের হস্তপদ কাঁপিতে লাগিল। বালক-বালিকাগণ চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। "চুপ চুপ" করিয়া মাতা-পিতাগণ তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। শিশুগণ মাতাগণকে জড়াইয়া ধরিল। মাতাগণ তাহাদিগকে কোলে টানিয়া লইলেন। বয়স্ক লোকগণ দুর্গা দুর্গা বলিয়া দেবতাগণকে স্মরণ করিতে লাগিল। পুরুষগণ উঠিয়া বিছানায় বসিল। আলো জ্বালিয়া তামাক সাজিবে, সে সাহস কাহারও হইল না।

"হু হু। হু হু। হু হু হু।" তেঁতুল গাছ হইতে যাই এই শব্দ উত্থিত হইল, আর চারিদিকে "হ্যাকা হুয়া, হ্যাকা হুয়া হু" শৃগালগণ

ডাকিয়া উঠিল। সেই সময় কাক-পক্ষিগণ অন্ধকার না মানিয়া, বৃষ্টি-বাদল না মানিয়া, বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া উড়িতে লাগিল। কা কা রবে তাহারা একবার এ ডালে বসিল, পুনরায় সে ডাল হইতে উড়িয়া অন্য ডালে গিয়া বসিতে লাগিল। নিকটস্থ বাঁশঝাড়ে বকের পাল পালকের ভিতর মস্তক লুকাইয়া বৃষ্টির জলে ভিজিতেছিল। কক্ কক্ রবে তাহারাও চারিদিকে উড়িতে লাগিল। বাদুড়গণ সন্ সন্ শব্দে সে স্থান হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। পেঁচকগণ হুঠ হুঠ রবে রায়মহাশয়ের অট্টালিকা-গাত্রে কোটরের ভিতর আশ্রয় লইল। নিকটস্থ কয়েক বাড়ি হইতে কুকুরগুলো ডাকিতে ডাকিতে বাহির হইল। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইলে, যেই সেই তেঁতুল গাছ তাহাদের নয়নগোচর হইল, আর তাহারা বসিয়া পড়িল। লাঙ্গুল ভিতরে রাখিয়া পশ্চাৎ পদদ্বয়ের উপর ভর দিয়া উচ্চভাবে বসিয়া, দূর হইতে তেঁতুল গাছের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তাহারা অতি ভয়ঙ্কর শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সেই গভীর নিশাকালে সেই চিৎকারে একে লোকের হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল, তাগর পর আবার সেই প্লুতস্বরে কুকুরের ক্রন্দনে আতঙ্কের আর সীমা রহিল না।

অল্পক্ষণ পরে পৃথিবী নীরব হইল। কিন্তু সে স্থিরভাব অধিকক্ষণ রহিল না। তেঁতুল গাছ হইতে পুনরায় সেই ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল—

"হু, হু, হু, হু, হু, হু, হু।"

আর পরক্ষণেই শৃগালগণ পুনরায় ডাকিয়া উঠিল—

"হ্যাঁকা হুয়া, হ্যাঁকা হুয়া হু।"

পুনরায় পক্ষীর কোলাহল আরম্ভ হইল। পুনরায় কুকুরগণ কাঁদিয়া উঠিল।

অল্পক্ষণ পরে আর একবার পৃথিবী সুস্থির হইল, কিন্তু পরমুহূর্তে পুনরায় সেই ভয়াবহ শব্দ উঠিল,—

"হু, হু, হু, হু, হু, হু, হু।"

সেইসঙ্গে শৃগালগণের ডাকে পৃথিবী পরিপূরিত হইল,—

পূর্বের ন্যায় কাক-পক্ষিগণের কোলাহলে ও কুকুরের ক্রন্দনে মানুষের হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তিনবার তেঁতুল গাছ হইতে হুঙ্কার শব্দ হইল। তিনবার চারিদিকে ঘোর কোলাহল উপস্থিত হইল, তাহার পর আর সে শব্দ হইল না। বায়ুর সন্ সন্ ও বৃষ্টি-ঝাপটের চট্ চট্ ব্যতীত আর কোন শব্দ হইল না।

কিন্তু গ্রামের লোকের আর নিদ্রা হইল না। ভয়ে শঙ্কিত হইয়া দেবতাদিগকে ডাকিয়া সকলে রাত্রি যাপন করিল। পরদিন গ্রামের লোক পরস্পর চুপি চুপি বলাবলি করিতে লাগিল,—"পুরুষ-পুরুষানুক্রমে আমরা এ স্থানে বাস করিতেছি। এরূপ বিষম ব্যাপার গ্রামে পূর্বে কখন ঘটে নাই। ভূতের কণ্ঠস্বর খোঁনা হয় সত্য, কিন্তু ভূত যে খাঁদা হয় তাহা কখন আমরা শুনি নাই। তাহার উপর ঘোর রাত্রিতে এই ভয়ানক শব্দ! এরূপ ভয়াবহ শব্দ কেহ কখন শ্রবণ করে নাই। ভূস্বামীর পাপে এই সকল অমঙ্গল ঘটিয়াছে। রাজাবাবুর সময়ে আমরা পরম সুখে কালযাপন করিতেছিলাম। কোথা হইতে একটা অনাহূত হতভাগা লোক আসিয়া আমাদের সর্বনাশ করিল। এ গ্রামে আর আমাদের ভদ্রস্থ নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে রাইচরণ রায়মহাশয় তাঁহার কর্মচারী বড়াল-মহাশয়কে ডাকিতে পাঠাইলেন। ভূতের ভয়ঙ্কর চিৎকার সম্বন্ধে দুইজনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। বড়াল বলিলেন,—"না মহাশয়! আমাদের গ্রামে পূর্বে খাঁদা ভূতের উপদ্রব ছিল না। রাত্রি দুই প্রহরের সময় এরূপ ভয়ঙ্কর চিৎকারও কেহ শ্রবণ করে নাই।"

সেইদিন রায়মহাশয় আপনার স্ত্রীকে বলিলেন,—"দেখ রায়ণী! আমার মনে কিরূপ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, খাঁদা ভূত প্রথমে আমার বাড়িতে আসিয়াছিল। তাহার পর আমার তেঁতুল গাছ হইতে সে বিকট শব্দ করিয়াছে। বিজয়কে প্রবঞ্চনা করিয়া আমরা এই বিষয় লইয়াছি। আমি দেখিতেছি যে, ইহাতে আমাদের ভাল হইবে না। আমাদের সর্বনাশ করিবার নিমিত্ত খাঁদা ভূতের আবির্ভাব হইয়াছে।"

স্বামীকে ধমক দিয়া রায়ণী বলিলেন,—“পুরুষ মানুষের সাহস থাকে। কিন্তু তোমার মত ভীরু পুরুষ কখন আমি দেখি নাই। লোকে কত কি উপায় অবলম্বন করিয়া সম্পত্তি লাভ করে। দেশে বড় মানুষ আছে; কি করিয়া তাহাদের বিষয় হইয়াছে, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়ো।”

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঘোর অনুতাপ

সে বৎসর খাঁদা ভূতকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। আর সেরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ হইল না। কিন্তু অল্পদিন পরে রায়মহাশয়ের জামাতা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। সেই রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল।

এক কন্যা ব্যতীত রায়মহাশয়ের অন্য সন্তান ছিল না। সেই কন্যা বিধবা হইল; কন্যা এখনও অল্পবয়স্কা, এখনও তাহার সন্তান-সন্ততি হয় নাই। রায়মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী গভীর শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এত কাণ্ড করিয়া সম্পত্তি লাভ করিলেন, সে সম্পত্তি এখন কে ভোগ করিবে?

গৃহিণীর অন্তঃকরণেও ঘোর অনুতাপ উপস্থিত হইল। মিথ্যাকথা, নীচতা, নিষ্ঠুরতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি পাপকার্য করিলে, মানুষ যে তাহার প্রতিফল পায়, এখন তাহার মনে নিশ্চয় বিশ্বাস হইল। গাছতলায় বাস করিয়া, দিনান্তে শাকান্ন ভোজন করিয়া, ধর্মপথে থাকিয়া, মানুষ যদি প্রিয়জনের অকাল-মৃত্যু-জনিত শোক হইতে নিষ্কৃতি পায়, সেও ভাল; তথাপি শোক-বিদীর্ণ হৃদয়ে কোটিপতি হওয়াও কিছু নহে। তিনি ভাবিলেন যে,—“এই মুহূর্তে সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া বনে গিয়া বাস করি, যদি জামাতাকে আমি ফিরিয়া পাই।”

স্ত্রী-পুরুষে ঘোর দুঃখে দিনপাত করিতে লাগিলেন। এক বৎসর াটিয়া গেল। পুনরায় ভাদ্রমাস আসিল। নদীর বানে গ্রাম পুনরায় াবিত হইল।

রায়মহাশয় নিদ্রা যাইতেছিলেন। সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। াহার মনে কিরূপ একটা আতঙ্ক উদয় হইল। তাড়াতাড়ি তিনি আলো জ্বালিলেন। গত বৎসরের ন্যায় বাড়ির ভিতর বারেন্দার দিকের ড়খড়ি খোলা ছিল, কিন্তু শারসি বন্ধ ছিল। সেইদিকে তাঁহার দৃষ্টি াড়িল। তিনি দেখিলেন যে, কাচের উপর মুখ রাখিয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণের সই খাঁদা ভূত দাঁড়াইয়া আছে।

রায়মহাশয় ভীরু ছিলেন না। এই অমানুষিক মূর্ত্তি দেখিয়া ঘারতর ভীত হইয়াছিলেন বটে, তথাপি তিনি সাহস করিয়া ঘর হইতে াহির হইলেন। কিন্তু কোন স্থানে ভূতের চিহ্নমাত্র পাইলেন না। াকর উপরে আসিল। গোলমাল শুনিয়া বড়ালমহাশয় বাহির বাড়ি ইতে আসিলেন। তন্নতন্ন করিয়া সকলে সমুদয় বাড়ি অন্বেষণ করিল। কন্তু ভূতের চিহ্নমাত্র কেহ দেখিতে পাইল না। সদর দ্বার ও খিড়কি ার পূর্বের ন্যায় বন্ধ ছিল। সুতরাং ভয় দেখাইতে অথবা চুরি করিতে, াহির হইতে কেহ বাটীর ভিতর প্রবেশ করে নাই।

বাড়িটি বৃহৎ। দুই মহল, দুই তলা, কতক পূর্বকালের, কতক কালের চক-মিলান বাটী। বাড়ির ভিতর উত্তর দিকে দোতলায় ইটি বৃহৎ ঘর। সেই দুই ঘরে রায়মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী বাস করেন। শ্চিম দিকে দুইটি ঘর। তাহাতে রায়মহাশয়ের কন্যা ও জামাতা বাস রিতেন। এক্ষণে একজন ঝি লইয়া তাঁহার কন্যা একাকিনী সেই দুই রে বাস করেন। উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি সিঁড়ি। পূর্বদিকে দুইটি য়নাগার। তাহাতে রায়মহাশয়ের স্ত্রীর ভগিনী-কন্যা আপনার দুই ন্যা লইয়া বাস করেন। পূর্বে এই দুইটি ঘরে বেণীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী য়ন করিতেন। ইহার পার্শ্বে একটি অন্ধকার ঘর। তাহাতে বেণীবাবুর জিনিসপত্র থাকিত। তাহার পার্শ্বে পূর্বদিকে আর একটি সিঁড়ি। ন্তঃপুরের দক্ষিণ দিকে পূজার দালানের পশ্চাৎপ্রাচীর। পূর্বে দালানে

পূজা হইত। এক্ষণে ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দালানে সম্মুখে, বাহির-বাটীর প্রাঙ্গণ ঘাস ও বনে পরিপূর্ণ হইয়াছে। বাহির বাটীতে উপর ও নীচে অনেকগুলি ঘর। তাহার দুইটি ঘরে বড়াল মহাশয় সপরিবারে বাস করেন। সদর দরজা সর্বদাই বন্ধ থাকে ভিতর বাটীর পশ্চিম দিকে খিড়কি দ্বার। সেই দ্বার দিয়া সকলে আনাগোনা করেন।

প্রাতঃকালে রায়মহাশয় জানিতে পারিলেন যে, পূর্ব্বদিকে অন্ধকার ঘর আছে, তাহার অনেকটা প্রাচীর ভূতে খনন করিয়াছে তাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্যান্বিত হইল। ভূতে কি কখন কোন স্থা খনন করে? অন্ধকার ঘর তালা দ্বারা আবদ্ধ ছিল। তালা সেইরূ বন্ধ ছিল। সুতরাং মানুষে ঘরের প্রাচীর খনন করে নাই। কিন্তু ভূতে দেয়াল খুঁড়িল কেন?

বড়ালমহাশয়কে ডাকিয়া কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভূত গ রাত্রিতে চোর-কুঠরির প্রাচীর খনন করিয়াছে। ইহার কারণ কি অনুমান করিতে পারেন?"

বড়ালমহাশয় কারণ অনুমান করিতে পারিলেন না।

রায়মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলেন,—"এ স্থানে দেখিতেছি লোকের খনন করা বাই। মানুষেও খনন করে, ভূতে খন করে। এ বাড়িতে প্রথম যখন আমরা আগমন করি, তখ আসিয়া দেখিলাম যে আপনি অনেকগুলি ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া নূত করিয়াছেন। আপনাকে আমি এ কাজ করিতে বলি নাই। তাহা পর কখনও এ স্থান, কখনও সে স্থান, মাঝে মাঝে আপনি খন করেন। কখনও বা ঘরের দেয়ালে ঘা মারিয়া পরীক্ষা করেন ইহার কারণ কি, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। কোনও স্থানে প্রোথিত আছে?"

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—"বালি-কাম ফাঁপিয়াছে কি পুনরায় মেরামত করিতে হইবে কি না তাহাই আমি পরীক্ষা করি দেখি।"

রায়মহাশয় বলিলেন,—"বাগানের ভূমিতে বালি-কাম আবশ্যক হয় না। বাগানেও এ স্থান সে স্থান খনন করেন কেন? কিছুদিন হইতে আপনি আবার গাছ কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমার অনুমতি না লইয়া সেদিন বড় একটি শিরীষ গাছ আপনি কাটিয়াছেন। ইহার কারণ কি?"

বড়ালমহাশয়ের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। মনের অসাবধানতাবশতঃ সহসা তিনি বলিয়া ফেলিলেন,—"ঝম-ঝমির গাছ?"

রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে আবার কি? ঝম-ঝমির গাছ আবার কি?"

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—"শিরীষ গাছের শুঁটি শুষ্ক হইলে বাতাসে ঝমঝম করিয়া শব্দ হয়।"

রায়মহাশয় আর কোন কথা বলিলেন না। বড়ালমহাশয় যে কোন বিষয় গোপন করিতেছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা বৃথা বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

তারপর তিন-চারি রাত্রি রায়মহাশয়ের বাটীর পূর্বভাগে খুটখাট শব্দ হইল। মানুষের পদশব্দও কেহ শুনিতে পাইল। রায়মহাশয় দুই-চারি জন চাকরকে দালানে শয়ন করিতে বলিলেন। সেইদিন হইতে দোতলায় আর কোন শব্দ হইল না। কিন্তু নিম্নের তলায়, বিশেষতঃ পূর্বদিকের ঘরগুলিতে নানারূপ শব্দ হইতে লাগিল। এই সময় কোন গ্রামবাসীর সহিত খাঁদা ভূতের সাক্ষাৎ হইল। গ্রামের লোক ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পর ঘর হইতে বাহির হওয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

অমাবস্যার রাত্রি আসিল। ভাদ্রমাস। বর্ষাকাল। ঘোর অন্ধকার রাত্রি। দুই প্রহরের পর সেই তেঁতুল গাছ হইতে পুনরায় সেই ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল,—

হু হু, হু হু, হু হু হু।

পুনরায় পূর্বের ন্যায় শৃগাল ডাকিয়া উঠিল,—

হ্যাঁকা হুয়া, হ্যাঁকা হুয়া হু।

পুনরায় পূর্বের ন্যায় জীব-জন্তু, কাক-পক্ষীর কোলাহল পড়িয়া গেল। গ্রামের লোক সেইরূপে ভীত হইল। ঘোরতর অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া দেবতাদিগকে তাহারা স্মরণ করিতে লাগিল।

রায়মহাশয় ভাবিলেন যে,—"গত বৎসর তেঁতুল গাছ হইতে এইরূপ ভয়ানক হাঁক আসিয়াছিল। সেই হাঁকের পর আমার জামাতার পরলোক হইল। এবার আবার কি হয় দেখ।"

সত্য সত্যই ঘোর অমঙ্গল ঘটিল। রায়মহাশয়ের বিধবা কন্যাটি পীড়িত হইল। সেই রোগেই তাহার মৃত্যু হইল। স্ত্রী-পুরুষ শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পাপ করিয়া তাঁহারা এই সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদের মনে ঘোর অনুতাপ উপস্থিত হইল। ধনবান হইয়াও মানুষ যদি নিদারুণ শোক দ্বারা সন্তপ্ত হয় তাহা হইলে সে ধনে প্রয়োজন কি?

যে তেঁতুল গাছ হইতে হাঁক আসিতেছিল, সেই গাছটি রায়মহাশয় কাটিয়া ফেলিলেন। বাড়িতে নানারূপ পূজা-পাঠ স্বস্ত্যয়ন করাইলেন। ভূতের রোজাগণের দ্বারাও নানারূপ ক্রিয়াকলাপ করাইলেন।

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"আমি আপনার বাড়িতে বাস করি, কোন্ দিন আমার নিমিত্ত হয়তো হাঁক আসিবে। তেঁতুল গাছ কাটিয়া ফেলিলে কি হইবে? ভূত অন্য গাছে বসিয়া হাঁক দিবে। মন্ত্রে-তন্ত্রে এ ভূত যাইবে না। খাঁদা ভূত কিজন্য আসিতেছে, বোধ হয়, তাহা আমি বুঝিয়াছি। সেই দ্রব্যটি তাহাকে আনিয়া দিলেই সে বোধ হয় আর আসিবে না।"

রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কি দ্রব্য?"

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—"রাজাবাবুর নিকট শপথ করিয়াছিলাম যে, তাঁহার ঘরের কথা কাহাকেও আমি বলিব না। কিন্তু খাঁদা ভূতের দৌরাত্ম্যে যখন আমাদের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইতেছে, তখন অগত্যা আমাকে বলিতে হইল।"

রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাজাবাবু কে?"

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—"বেণীবাবুকে আমরা রাজাবাবু বলিতাম।"

সপ্তম অধ্যায়

পূর্বকথা

রায়মহাশয় বলিলেন,—"আমার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এখন আর খাঁদা ভূতের উপদ্রব নিবারণ করিয়া বিশেষ কোন ফল নাই।"

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—"এখনও আপনার প্রাণ, আপনার গৃহিণীর প্রাণ, সুচিন্তা এবং সুবালাদিদির প্রাণ, তাহাদের মাতার প্রাণ, —এই সমুদয় প্রাণের জন্য মঙ্গল কামনা করিতে হইবে। তাহার পর এই বাটীতে আমরাও বাস করি। আমাদেরও প্রাণের ভয় আছে।"

পূর্বেই বলিয়াছি যে, রায়গৃহিণীর ভগিনীর কন্যা এই বাটীতে বাস করেন। বিধবা হইয়া দুইটি কন্যা লইয়া মাসীর আশ্রয়ে তিনি দিনপাত করিতেছেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা সুবালা এখনও নিতান্ত শিশু।

রায়মহাশয় বলিলেন,—"ভাল! বেণীবাবুর সংসারের কি কথা আমাকে বলিবেন, তাহা বলুন। যদি টাকা খরচ করিলে খাঁদা ভূত দূর হয়, তাহা আমি করিব।"

বড়ালমহাশয় বলিতে লাগিলেন,—"রাজাবাবু অর্থাৎ বেণীবাবু, স্ত্রী লইয়া এই বাটীতে বাস করিতেন। তাঁহার পিতা পূর্বদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। এ অঞ্চলে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন কেহ ছিল না। তাহার স্ত্রী সুন্দরী ছিলেন। সেজন্য সকলে তাঁহাকে সোনা-বৌ বলিয়া ডাকিত। সোনা-বৌ ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোক ছিলেন। গরীব-দুঃখী কাহাকে কখনও এক পয়সা দিতেন না বটে, কিন্তু সর্বদাই পূজা-পাঠ জপ-তপ লইয়া থাকিতেন। রাজাবাবু স্ত্রীকে বড় ভালবাসিতেন, কিন্তু সোনা-বৌ তাঁহাকে সেরূপ ভালবাসিতেন না। রাজাবাবু রামপক্ষী, বিলাতী বিস্কুট প্রভৃতি সামগ্রী আহার করিতেন। সেজন্য জপ-তপ-পরায়ণা স্ত্রী তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন।

"এইরূপে তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে দিনযাপন করিতেছিলেন। আমি তাহার কর্মচারী ছিলাম। বীরু নামে রাজাবাবুর একজন প্রিয় চাকর ছিল। এক বৎসর ভাদ্রমাসে নদীতে বান আসিয়াছে। প্রাতঃকালে

সকলে দেখিল যে, এই বাগানের নিম্নে নদীর কিনারায় কৃষ্ণবর্ণের একটি লোক পড়িয়া আছে। মাথায় জটা ও গলায় রুদ্রাক্ষমালা দেখিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া বোধ হইল। আমরা দেখিলাম যে, তিনি তখনও জীবিত আছেন। রাজাবাবু তাঁহাকে আপনার বাটীতে লইয়া আসিলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁহার চৈতন্য হইল বটে, কিন্তু তিনি জ্বরবিকার রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। নিকটে আমাদের ভাল ডাক্তার নাই। দূর হইতে সুচিকিৎসক আনাইয়া, অনেক অর্থব্যয় করিয়া, রাজাবাবু তাঁহার প্রাণরক্ষা করিলেন।

"সুস্থ হইয়া সন্ন্যাসী এই বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। দিনান্তে দুই সের দুগ্ধ ও ফলমূল ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য তিনি আহার করিতেন না। সেজন্য সকলে বুঝিল যে, তিনি অতি পবিত্র সাধু। গ্রামের লোকে যখন শুনিল যে, সন্ন্যাসী কেবল দুগ্ধ খাইয়া প্রাণধারণ করেন, তখন তাহাদের ভক্তির আর সীমা রহিল না। দলে দলে আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইতে লাগিল। কিন্তু ভক্তি হইল সোনা-বৌয়ের! সে ভক্তির কথা আপনাকে আর কি বলিব! ভক্তিরসে তিনি একেবারে গলিয়া গেলেন।

"গলিলাম না কেবল আমি, আর গলিল না বীরু চাকর আর গলিলেন না রাজাবাবু নিজে। স্ত্রীর সহিত সন্ন্যাসীর ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া রাজাবাবু চটিয়া গেলেন। বীরু চটিয়া গেল—সন্ন্যাসীর রামপাখি ভোজনে। রাজাবাবুর নিমিত্ত রামপক্ষী রান্না হইলে সন্ন্যাসী গোপনে তাহা বীরুর নিকট হইতে চাহিয়া লইতেন। আমি চটিলাম—তাঁহার ব্রাণ্ডিপানে। রাজাবাবু সুরাপান করিতেন না। কিন্তু সময়-অসময়ের জন্য ঘরে তিনি দুই-এক বোতল ব্রাণ্ডি রাখিয়া দিতেন। সেই ব্রাণ্ডি লইতে সাধুকে আমি একদিন ধরিয়া ফেলিলাম। সাধু বলিলেন যে, ইহার নাম "কারণ"; ইহা দ্রবীভূত তারা। জটাজুটধারী সন্ন্যাসীদিগকে মদ্য, মাংস, মৎস্য ও মুড়ি দিয়া পূজা করিতে হয়।

"সোনা-বৌকে সন্ন্যাসী ধর্মশিক্ষা দিতে লাগিলেন। আমরা সকলেই তাহাতে বিরক্ত হইলাম। রাজাবাবু স্ত্রীকে বড়ই ভালবাসিতেন

ও তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। সেজন্য প্রথম প্রথম তিনি কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু অবশেষে সাধুকে তিনি বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিলেন। নদীর ধারে যে শিবমন্দির আছে, সন্ন্যাসী তাহাতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ইহার অল্পদিন পরে সোনা-বৌয়ের একটি কন্যা হইল। রাজাবাবু সেই কন্যাটির উপর প্রাণমন সমর্পণ করিলেন, কিন্তু মাতার যেরূপ স্নেহ থাকা উচিত, তাহা ছিল বলিয়া আমাদের বোধ হইল না। মাতা প্রথম াহাকে স্তন্যপান করাইতে সম্মত হন নাই। রাজাবাবুর ভর্ৎসনায় শেষে তিনি সম্মত হইলেন। যাহা হউক, ছয় মাসের হইয়া একদিন হসা কন্যাটি মারা পড়িল। শিশুর শোকে রাজাবাবু অধীর হইয়া াড়িলেন।

আরও কিছুদিন গত হইল। বাটীতে একদিন রাত্রিতে আমি নিদ্রা যাইতেছি। বড়ালনী আমাকে জাগাইয়া বলিলেন,—"দেখ াড়ির ভিতর কি গোলমাল হইতেছে। শীঘ্র তুমি বাড়ির ভিতর ামন কর।"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমি বাড়ির ভিতর গমন করিলাম। দেখিলাম য কাপড়-পোড়া গন্ধে বাড়িটি পরিপূর্ণ হইয়াছে, আর উপরে রাজাবাবুর রে বীরু চীৎকার করিতেছে। তাড়াতাড়ি সেই ঘরে গিয়া দেখিলাম য, ঘরের মাঝখানে একখানি কাপড় পুড়িতেছে। নিকটে কাঠের বাঁট-ম্বলিত একটি লোহার শিক পড়িয়া আছে। রাজাবাবু খাটের উপর ক্ষু মুদিত করিয়া পড়িয়া আছেন। কালা-বাবাকে মাটিতে ফেলিয়া ীরু তাহার বক্ষঃস্থলে হাঁটু দিয়া তাহাকে ধরিয়া আছে।

ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র বীরু আমাকে বলিল,—'বড়াল মহাশয়! ীঘ্র এই ভণ্ড তপস্বী বেটাকে বাঁধিয়া ফেলুন। রাজাবাবুকে এ খুন রিয়াছে।'

নিকটে কাঠের আলনা হইতে আমি একখানি কাপড় লইলাম। াই কাপড় দিয়া বীরুতে আমাতে সন্ন্যাসীকে খাটের পায়াতে বাঁধিয়া লিলাম।

তাহার পর রাজাবাবুকে গিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, তিনি জীবিত আছেন। তাঁহার শিয়রে একখানি রুমাল ও একটি শিশি পড়িয়া আছে। রুমাল ও শিশি হইতে একপ্রকার উগ্র মিষ্ট গন্ধ বাহির হইতেছে। তখন আমি বুঝিলাম যে, যে ঔষধ দিয়া ডাক্তারেরা রোগীকে অজ্ঞান করে, সেই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রাজাবাবুকে সন্ন্যাসী অজ্ঞান করিয়াছে। মাথায় জল দিয়া ও নানাপ্রকার শুশ্রূষা করিয়া আমরা রাজাবাবুর চৈতন্য উৎপাদন করিলাম। তিনি উঠিয়া বসিলেন।

ঘরের মধ্যস্থলে যে কাপড় পুড়িতেছিল, তাহার আগুন আমরা নিবাইয়া ফেলিলাম। কাপড়ের সামান্য একটু অংশ অবশিষ্ট ছিল, পুড়িয়া যায় নাই। পাড় দেখিয়া চিনিতে পারিলাম যে, তাহা সোনা-বৌয়ের শাড়ী। লোহার সিক কোথা হইতে আসিল, কে আনিল, কেন আনিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সিকটি হাতে করিয়া দেখিলাম যে, ঘোর উত্তপ্ত, অনেকক্ষণ পর্যন্ত কে যেন ইহাকে আগুনে রাখিয়াছে। তাড়াতাড়ি আমি উহা ফেলিয়া দিলাম। মনে করিলাম যে, কাপড়-পোড়া আগুনে এইরূপ উত্তপ্ত হইয়া থাকিবে।

রাজাবাবু আমাদের দুইজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'দেখুন বড়ালমহাশয়! দেখ বীরু! এই পাষণ্ড আমার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাকে আমি পুলিসে দিতে পারি না। মকদ্দমা করিতে গেলে নানারূপ ঘরের কথা বাহির হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই নরাধমকে একেবারে ছাড়িয়া দিতেও পারি না। ইহার কোনরূপ দণ্ড করিতে হইবে।'

বীরু বলিল,—'বেটার নাক কাটিয়া লইতে হইবে।' আমি-ও সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। সমুদয় কথা গোপন রাখিবার নিমিত্ত আমরা দুই জনে তিন সত্য করিলাম।'

'তাহার পর রাজাবাবু বলিলেন,—'বেটার নাকটি ভালরূপে কাটিয়া লইতে হইবে। নাকটি আমি চিহ্নস্বরূপ রাখিয়া দিব।'

বীরু ও আমি কালা বাবার হাত-পা উত্তমরূপে ধরিয়া রহিলাম। সুতীক্ষ্ণ ছুরি বাহির করিয়া রাজাবাবু নিজ হাতে অতি সুন্দররূপে তাহার

নাকটি কাটিয়া লইলেন। তাহার পর একটি শিশিতে তাহা রাখিয়া ব্র্যাণ্ডি দ্বারা শিশিটি পরিপূর্ণ করিলেন।

সন্ন্যাসীকে আমরা ছাড়িয়া দিলাম। তাহার বক্ষঃস্থল রক্তে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। জলে ভিজাইয়া সেই রুমালখানি আমরা তাহাকে দিলাম। রুমাল দিয়া নাক মুছিতে মুছিতে সন্ন্যাসী পলায়ন করিল।

রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সোনা-বৌ এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ?"

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—"বাবাজী তাঁহাকে মদ্যপান করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি স্বামীর নিকট শয়ন করিতেন না। তাহার পূর্বদিকে যে ঘরে রাজাবাবু শয়ন করিতেন, তাহার পাশের ঘরে তিনি থাকিতেন। রাত্রিতে আমাকে জপ করিতে হয়, এই বলিয়া তিনি স্বতন্ত্র থাকিতেন। এতক্ষণ তিনি বোধ হয় আপনার ঘরে ছিলেন। যাহা হউক, প্রাতঃকালে উঠিয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। শিবের মন্দিরে সন্ন্যাসীকেও কেহ দেখিতে পাইল না। আমরা বুঝিলাম যে, তাঁহারা দুইজনে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।"

রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর ?"

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—"সোনা-বৌ যে বাটী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, সে কথা রাজাবাবু আমাদিগকে প্রকাশ করিতে মানা করিলেন। সমুদয় জিনিসপত্র ও সম্পত্তি আমাকে বুঝাইয়া দিয়া, দুইদিন পরে রাজাবাবু বীরুকে সঙ্গে লইয়া কাশী চলিয়া গেলেন। এক্ষণে কথা এই, সে নাক কোথায় ?"

অষ্টম অধ্যায়

সে নাক কোথায়

রায়মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"সে নাক কোথায় ?"

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"হাঁ। সে নাক কোথায় ? যাইবার সময় রাজাবাবু আমাকে বলিয়া গেলেন,—'যে স্থানে ঐ নরাধম আর ঐ পাপীয়সী যাইবে, সেই স্থানে আমিও যাইব। সকলকে ইহাদের পাপের কথা বলিব। সকলের নিকট ইহাদিগকে ঘৃণিত করিব। কোন স্থানে ইহাদিগকে সুখে বাস করিতে দিব না। ইহাদের জীবন অসহ্য করিয়া তুলিব।' যাইবার সময় নাকের শিশি রাজাবাবু লইয়া গেলেন। সে নাক এখন কোথায় ?"

রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে নাক লইয়া কি হইবে ?"

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—"বুঝিতে পারিতেছেন না ? কালা বাবা বোধ হয় এখন মরিয়া গিয়াছে। মরিয়া ভূত হইয়াছে। ভূত হইয়া আপনার নাকের জন্য সে আসিতেছে। ভাদ্রমাসে কালা বাবা নদীর বানে ভাসিয়া আসিয়াছিল। ভাদ্রমাসে তাহার নাসিকা ছেদন হইয়াছিল। গত ভাদ্রমাসে তাহার ভূত নাসিকার জন্য আসিয়াছিল। এক্ষণে নাকটি পাইলেই সে সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবে। আমাদের প্রাণও বাঁচিয়া যাইবে। এখন সে নাক কোথায় ?"

রায়মহাশয় উত্তর করিলেন,—"সে নাক এখন কোথায়, আমি কি করিয়া জানিব ? রাজাবাবু নাক সঙ্গে লইয়া গেলেন। তাহার পর আর কিছু আপনি জানেন না ?"

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—"রাজাবাবু নানা স্থান হইতে মাঝে মাঝে আমাকে পত্র লিখিতেন। কিন্তু সে তাঁহার বিষয় সম্বন্ধে, নাকের বিষয় তিনি কিছু লেখেন নাই। তবে বীরু একবার আমাকে লিখিয়াছিল যে, সেঁকো বিষ প্রভৃতি মসলা দিয়া রাজাবাবু নাকটিকে টাটকা অবস্থায় রাখিয়াছেন, ইহা পচিয়া যায় নাই। তাহার পর সোনা দিয়া তাহাকে তিনি বাঁধাইয়াছেন। হারের ন্যায় চেন করিয়া

সেই নাক তাহাতে তিনি সংলগ্ন করিয়াছেন। চেন-সম্বলিত সেই নাক কখন তিনি গলায় পরিধান করেন, কখন বা বাক্সের ভিতর অতি যত্নে রাখিয়া দেন।”

রায়মহাশয় বলিলেন,—“মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট আমি ছিলাম না। আমার ভ্রাতা বিজয় তাঁহার নিকট ছিল। বাক্সের চাবি তিনি বিজয়কে দিয়াছিলেন। বাক্সর ভিতর যে টাকা ছিল, তাহা লইয়া বিজয় তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিল।”

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—“বসন্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রাজাবাবু আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাই তাঁহার শেষ পত্র। সেই পত্রে বিজয়বাবুর তিনি অনেক সুখ্যাতি করিয়াছিলেন, আর উইল করিয়া সম্পত্তি তাঁহাকে দিয়া যাইবেন, এই কথা আমাকে লিখিয়াছিলেন।”

রায়মহাশয় বলিলেন,—“বিজয় তখন অজ্ঞ যুবক ছিল। পৃথিবীর বিষয় সে কিছুই জানিত না। আমরা নিস্পর। উইল লইয়া যদি মকদ্দমা হয়, তাহা হইলে বিজয় সে বিবাদে কৃতকার্য হইবে না। বিষয় পাইলেও সে রক্ষা করিতে পারিবে না। এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া বেণীবাবু শেষে আমার নামে উইল করিলেন।”

বড়ালমহাশয় বলিলেন—“তাঁহার বাক্সতে নাক ছিল। নাকের বিষয় বিজয়বাবু বোধ হয় বলিতে পারিবেন।”

রায়মহাশয় বলিলেন,—“কল্যই আমি কলিকাতায় বিজয়ের নিকট গমন করিব। বিজয় নাক লইয়া কি করিবে? যদি ফেলিয়া দিয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে নাক আনিয়া খাঁদা ভূতকে প্রদান করিব।”

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—“আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, নাক পাইলে খাঁদা ভূত আর আমাদিগের উপর উপদ্রব করিবে না।”

রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সোনা-বৌ কোথায় গেলেন? নীরুই বা কোথায় গেল? এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলে, পরে কি হইল?”

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"বীরু মাঝে মাঝে আমাকে পত্র দিত। তাহার পত্র পাঠ করিয়া আমি অবগত হইলাম যে, কালা বাবা ও সোনা-বৌ প্রথম কাশী গিয়াছিলেন। কিন্তু রাজাবাবু যখন সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি তাঁহারা কাশী পরিত্যাগ করিয়া বেরিলি নামক নগরে পলায়ন করিলেন। রাজাবাবুও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেইস্থানে গমন করিলেন। তখন তাঁহারা আলমোড়া পলায়ন করিলেন। আলমোড়া হইতে টেহরি নামক স্থানে তাঁহারা গমন করিলেন। তাহার পর রাজাবাবু আর তাহাদের কোন সন্ধান পাইলেন না। বদ্রিনাথ, কেদারনাথ দর্শন করিয়া রাজাবাবু হরিদ্বারে আসিলেন। সেই স্থানে বিসূচিকা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বীরুর মৃত্যু হইল। রাজাবাবু তাহার পর, আপনি যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে তাঁহার পরলোক হইল। খাঁদা ভূতের আগমনে বুঝিলাম যে, কালা বাবার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু সোনা-বৌ আছেন কি নাই; যদি থাকেন তো কোথায় আছেন, কি করিতেছেন, তাহার আমি কিছুই জানি না।"

পরদিন রায়মহাশয় কলিকাতা গমন করিলেন। বিজয়বাবু এখন ধনবান্ লোক। বৃহৎ বাড়িতে বাস করেন। নানা প্রকার মূল্যবান দ্রব্যে তাঁহার গৃহ সুসজ্জিত। লোক-জন চাকর-নফরে তাঁহার বাড়ি পরিপূর্ণ। সকলের মুখে রায়মহাশয় তাঁহার সুখ্যাতি শ্রবণ করিলেন। বিজয়বাবুর স্ত্রী সতীলক্ষ্মী, দয়াময়ী। তাঁহার নাম অন্নপূর্ণা, কাজেও তিনি তাই, সকলের তিনি মা-জননী। বিজয়বাবুর একটি পুত্র হইয়াছে। তাহার বয়স ছয় বৎসর। ছেলেটি দেখিতে যেন রাজপুত্র। তাহার মৃদু-মধুর কথা শুনিলে হৃদয় শীতল হয়। বিজয়ের সুখ ঐশ্বর্য, বিশেষতঃ মনে শান্তি দেখিয়া ও সেই সঙ্গে নিজের অবস্থা ভাবিয়া রায়মহাশয় একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

বিজয়বাবু জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বিশেষরূপে অভ্যর্থনা করিলেন। দুই ভ্রাতা একত্র বসিয়া নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। পূর্বের কথা কেহই উল্লেখ করিলেন না। তবে রায়মহাশয় যখন খাঁদা ভূতের

দৌরাত্ম্য ও নিজের বিপদের বিবরণ প্রদান করিলেন, তখন বিজয় বাবু কেবল এই কথা কহিলেন,—"টাকা অতি তুচ্ছ বস্তু, টাকার জন্য পৃথিবীর লোক কেন যে পাগল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। যম-যন্ত্রণা অপেক্ষা দুঃখ আর কিছুই নাই। অর্থবলে মানুষ যখন সে যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পায় না, তখন ধনের জন্য মানুষ কেন যে এত লালায়িত হয়, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। ঈশ্বরের নিকট টাকার জন্য কখন প্রার্থনা করি নাই। কিন্তু তিনি নিজেই আমাকে প্রচুর অর্থ দিয়াছেন। ভগবানকে প্রসন্ন রাখিলে মানুষের কোন অভাব থাকে না।"

রায়মহাশয় বলিলেন,—"হাঁ, অধর্ম করিলে কিছুতেই মঙ্গল হয় না। শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক, পাপের ফল ফলিয়া যায়। আমার ঘোর সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। বাকি আর কিছুই নাই। বাকি আছে কেবল আমার নিজের প্রাণ ও তোমাদের বড়-বৌয়ের প্রাণ। আমাদের জন্য কোন্ দিন হয়তো হাঁক আসিবে। আমাদের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কেবল একমাত্র উপায় আছে। সে প্রতিকার তোমার হাতে।"

বিজয়বাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার হাতে? আমি কি করিতে পারি?"

রায়মহাশয় উত্তর করিলেন,—"মৃত্যুকালে বেণীবাবু বাক্সর চাবি তোমাকে দিয়াছিলেন?"

বিজয়বাবু বলিলেন,—"হ্যাঁ, বাক্সর ভিতর যে টাকা ছিল, তাহা লইয়া আমি তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম।"

রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাক্সর ভিতর আর কি ছিল?"

বিজয়বাবু উত্তর করিলেন,—"তাঁহার বাটীর জিনিসপত্রের ফর্দ ছিল। খানকয়েক চিঠি ছিল, কতকগুলি দলিল ছিল, সে সমুদয় আমি আপনাকে দিয়াছি।"

রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর কি ছিল?"

বিজয়বাবু উত্তর করিলেন,—"একখানি ছবি ছিল, আর সোনার একটি অলঙ্কার ছিল। তাহার অধিক মূল্য নহে। কিন্তু মূল্য যাহাই

হউক, সে অলঙ্কার তিনি আমাকে দিয়া গেছেন। সেই অলঙ্কার গলায় পরিধান করিতে মৃত্যুকালে তিনি আমাকে বার বার অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। তার পর যদি কখন কোন লোক আসিয়া প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সেই অলঙ্কার তাহাকে দিতে তিনি বলিয়া গিয়াছেন।”

রায়মহাশয় বলিলেন,—“সেই অলঙ্কার আজ আমি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। তুমি আমাকে তাহা প্রদান কর।”

বিজয়বাবু বলিলেন,—“আপনাকে দিতে তিনি বলিয়া যান নাই। আপনাকে আমি তাহা দিব না।”

রায়মহাশয় বলিলেন,—“নিজের জন্য তাহা আমি চাই না। সে অলঙ্কার কি, ও সে দ্রব্য কাহার, তাহা যদি আমি বলিতে পারি, তাহা হইলে তুমি আমাকে দিবে কি না?”

বিজয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সে দ্রব্য কি, তাহা বলুন দেখি, শুনি। কিন্তু এখন হইতে আমি বলিয়া রাখি যে, বেণীবাবু যাহাকে দিতে বলিয়াছেন, সে লোক ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমি তাহা দিব না।”

রায়মহাশয় উত্তর করিলেন,—“সে দ্রব্য মানুষের নাক; সোনা দিয়া বাঁধাইয়া তাহার সহিত সোনার চেন সংলগ্ন করিয়া বেণীবাবু তাহা গলায় পরিতেন, অথবা বাক্সর ভিতর তুলিয়া রাখিতেন। সে নাক একজন সন্ন্যাসীর। সে এখন মরিয়া ভূত হইয়াছে; সে সেই খাঁদা ভূত,— যে আমার সর্বনাশ করিতেছে। ফিরিয়া পাইলে সে ক্ষান্ত হইবে, আর আমার কোন অনিষ্ট করিবে না। সেজন্য নাকটি তুমি আমা[illegible] প্রদান কর।”

বিজয়বাবু উত্তর করিলেন,—“সে অলঙ্কারটি মানুষের নাক বটে, কিন্তু বেণীবাবু তাহা আপনাকে অথবা স দিতে বলিয়া যান নাই। কুসংস্কার বলিতে ইচ্ছা করেন, বলুন;—কিন্তু আমার একান্ত বিশ্বাস যে, এই নাক আমার সমস্ত সৌভাগ্যের মূল। এই দেখুন, নাকটি আমি গলায় পরিয়া আছি। কিছুতেই এ নাক আমি আপনাকে দিতে পারি না। বেণীবাবু যাহাকে দিতে বলিয়া গিয়াছেন, একমাত্র সেই লোক ভিন্ন এই নাক অন্য কাহাকেও দিব না।”

রায়মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"দিবে না? উইল দ্বারা বেণীবাবু আমাকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন। সেজন্য আইন অনুসারে এ নাক আমার। জান, মকদ্দমা করিয়া তোমার কান মলিয়া এ নাক আমি লইতে পারি?"

দুই ভ্রাতায় এইরূপ ঘোরতর বিবাদ হইল। বিজয়বাবু কিছুতেই নাক দিলেন না। হতাশ হইয়া রায়মহাশয় বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

নবম অধ্যায়

ভূতের আহার

ঘোরতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রায়মহাশয় বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া গৃহিণীকে সকল কথা বলিলেন।

রায়নী বলিলেন,—"আমি তো চিরকাল তোমাকে বলিয়া আসিতেছি যে, ঠাকুরপোর দয়া-ধর্ম নাই।"

রায়মহাশয় বলিলেন,—"আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আমার অবর্তমানে তুমি সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগ করিবে। তাহার পর বিজয় ইহা পাইবে। কিন্তু এক্ষণে বিজয় যাহাতে না পায়, সেইরূপ উইল করিব।"

বড়াল মহাশয়কেও তিনি সকল কথা বলিলেন। আরও বলিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর বিজয় যাহাতে বিষয় না পায়, সেইরূপ তিনি উইল করিবেন। তিনি বলিলেন,—"কিন্তু দেখুন বড়াল মহাশয়! সোনা-বৌয়ের কথা শুনিয়া আমি বড় ভীত হইয়াছি। যতদিন রায়-গৃহিণীর বয়স অধিক না হয়, ততদিন তাঁহাকে আমি দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা দিব না। বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে পরে তিনি দান-বিক্রয় করিতে পারিবেন।"

রায়মহাশয় এইরূপ উইল করিলেন,—

প্রথম। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভার্যা বিষয়ের উপস্বত্ব ভোগ করিবেন।

দ্বিতীয়। যতদিন না তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হয়, ততদিন তিনি সম্পত্তি দান-বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

তৃতীয়। অমুক সালের ২রা শ্রাবণ তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবে। তাহার পর যে দিন ইচ্ছা, এই সম্পত্তি তিনি দান অথবা বিক্রয় করিতে পারিবেন।

চতুর্থ। রায়-গৃহিণীর বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে, বড়াল মহাশয় পুরস্কারস্বরূপ এক হাজার টাকা পাইবেন।

পঞ্চম। যতদিন তাঁহার স্ত্রী জীবিতা থাকিবেন, ততদিন বড়াল মহাশয় ৫০ টাকা হিসাবে বেতন পাইবেন।

এইরূপ উইল করিয়া বড়াল মহাশয়কে তিনি বলিলেন,—"আমার স্ত্রীর জীবনের উপর আপনার স্বার্থ রাখিয়া দিলাম। তাঁহাকে জীবিত রাখিতে আপনি যত্ন করিবেন। আমার ভাই যাহাতে এ সম্পত্তি না পায়, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। এরূপ নরাধম নিষ্ঠুর ভাই আমি কখনও দেখি নাই। আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া, বেণীবাবুকে ফুস্‌লাইয়া সে এই সম্পত্তি লইতে চেষ্টা করিয়াছিল।"

রায়মহাশয় পুনরায় বলিলেন,—"উইল করিয়া এক্ষণে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। খাঁদা ভূতের যাহা ইচ্ছা এখন করুক। কিন্তু এবার ভাদ্র মাসে পুনরায় আসিয়া যদি সে পূর্বরূপ হুহুঙ্কার শব্দ করে, তাহা হইলে, এ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া আমি অন্যত্র গমন করিব।"

ভাদ্রমাস আসিল। খাঁদা ভূত যথারীতি উঁকি মারিতে না পারে, সেজন্য বাড়ির ভিতর দিকের জানালা দুইটি রায়মহাশয় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

একদিন রাত্রিতে সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। মনে পূর্বের ন্যায় আতঙ্ক উপস্থিত হইল। "আলো জ্বালিব না, কোনওদিকে চাহিয়া দেখিব না"—এইরূপ বার বার মনে মনে তিনি সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু

কিছুতেই তিনি থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া আলো জ্বালিলেন। বাগানের দিকে জানালা খোলা ছিল। সেই জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বাগানের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন যে, নিম্নে একজন মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। অন্ধকারে চিনিতে পারিলেন না ; কিন্তু সে যে খাঁদা ভূত তাহা তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন। রায়মহাশয় মনে মনে স্থির করিলেন,—"এবার যদি ভূতের হাঁক আসে, তাহা হইলে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আমি গমন করিব।"

খাঁদা ভূত এবার এক অদ্ভুত কাণ্ড করিল। অরন্ধনের পূর্বদিন রায়মহাশয়ের বাটীতে প্রচুর পরিমাণে অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন হইয়াছিল, পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সকলে দেখিল যে, ভূত এক হাঁড়ি ইলিশ মাছ, আধ হাঁড়ি কচুশাক ও সেই পরিমাণে ভাত-দাল খাইয়া গিয়াছে। ভূতের খোরাক, না রাক্ষসের খোরাক!

সেই রাত্রিতে ভয়ানক রবে পূর্বরূপ ভূতের হাঁকে পৃথিবী কম্পিত হইল, এবার তেঁতুল গাছ ছিল না। এবার রায়মহাশয়ের বাটীর ছাদে আলিসার উপর বসিয়া ভূতে হাঁক দিল। হাঁকের পরদিন হইতে খাঁদা ভূতকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

সেই রাত্রিতে রায়মহাশয় পক্ষাঘাত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলেন ; তাঁহার অর্ধ অঙ্গ একেবারে পড়িয়া গেল, তাঁহার চলৎশক্তি একেবারে রহিত হইয়া গেল। ডাক্তার বলিল,—"এ অবস্থায় তাঁহাকে নাড়া-চাড়া করিলে হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে। রায়মহাশয় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, এবার ভূতের হাঁক আসিলে তিনি অন্যস্থানে গমন করিবেন। তাহা আর হইল না। ঘোর কষ্টে রায়মহাশয় দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

আর এক বৎসর কাটিয়া গেল। পুনরায় ভাদ্র মাস আসিল। ভাদ্রমাসের শেষে পুনরায় খাঁদা ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইল। গ্রামের প্রান্তভাগে একজন বিধবা সদ্‌গোপনী বাস করিত। এক দিন সন্ধ্যার পর ঘরের দাওয়া অর্থাৎ পিঁড়াতে বসিয়া সে রন্ধন করিতেছিল। হঠাৎ সেই স্থানে খাঁদা ভূত আসিয়া উপস্থিত হইল। "মা গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া সদ্‌গোপনী ঘরের ভিতর পলায়ন

করিল ও দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সে রাত্রি সে আর ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে সে দেখিল যে, খাঁদা ভূত তাহার ভাত-দাল ও ব্যঞ্জন লইয়া গিয়াছে। হাঁড়ি, মালসা ও সরা করিয়া সমুদয় দ্রব্য সে লইয়া গিয়াছে। পিতল-কাঁসার দ্রব্য লয় নাই। নিভৃতে মাঠে লইয়া খাঁদা ভূত ভাত-ব্যঞ্জন আহার করিয়াছিল। পরদিন সকলে দেখিল, সে হাঁড়ি, মালসা ও সরা সেই স্থানে পড়িয়া আছে।

দুইদিন পরে খাঁদা ভূত যথারীতি রাত্রি দুই প্রহরের সময় হাঁক দিল। খাঁদা ভূত গ্রামে আসিয়াছে শুনিয়া রায়মহাশয় ছাদের উপর লোক রাখিয়াছিলেন। সেজন্য ছাদের উপর এবার সে হাঁক দিতে পারিল না। তাঁহার বাগানে দাঁড়াইয়া সে হুহুঙ্কার করিল।

রায়মহাশয়ের স্ত্রীর ভগিনীর বিধবা কন্যা, অর্থাৎ বোনঝি, এই সংসারে বাস করিতেছিলেন। দুইটি কন্যা লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন। একজনের নাম সুচিন্তা, তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর। অপর কন্যার নাম সুবালা, বয়ঃক্রম ছয় বৎসর। সুচিন্তার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু এখনও সে শ্বশুরালয়ে ঘর করিতে যায় নাই। জামাতা মধ্যে মধ্যে রায়মহাশয়ের বাটীতে আসিতেন।

এ বৎসর ভূতের হাঁকের পর সুচিন্তার প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। তিনদিন ঘোরতর কষ্ট পাইল; কিছুতেই প্রসব হইতে পারিল না। সেই যন্ত্রণায় তাহার মৃত্যু হইল। ডাক্তার বলিল,—"কন্যাটি নিতান্ত বালিকা। এত অল্পবয়সে গর্ভ হইলে তাহার ফল এইরূপ হইয়া থাকে।" বালিকার যন্ত্রণার কথা শুনিয়া রায়মহাশয়ের দুঃখ ও রাগ হইল। বালিকার মাতাকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন,—"আমার নিজের কন্যা ও জামাতা খাঁদা ভূতের দৌরাত্ম্যে মারা পড়িয়াছে। আমি নিজে পক্ষাঘাত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জড়ের ন্যায় পড়িয়া আছি। দুর্ভাগ্যের চূড়ান্ত হইয়াছে। আর আমার কিছু বাকী নাই। এখন দেখিতেছি যে, আমার সংসারে যাহারা থাকিবে, একে একে সকলেই মারা পড়িবে। তুমি বাছা, অন্যত্র গমন কর। তাহা না করিলে তুমি ও তোমার সুবালা মারা পড়িবে।"

বোনঝি উত্তর করিলেন,—"আমার প্রাণ গেলেই কি আর থাকিলেই কি? খাঁদা-ভূতকে আমি ভয় করি না। ভাবনা সুবালার জন্য। তাহার কাকার নিকট আমি যাইতে পারি। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর সহিত আমার বনিবে না। তাঁহার স্ত্রী মন্দ লোক নহেন। কিন্তু তাঁহার গলগ্রহ হইয়া আমি থাকিতে ইচ্ছা করি না। তাহার পর এ স্থানে আপনার ও মাসীমায়ের শরীর ভাল নহে, আপনাদিগকে ছাড়িয়াও আমি যাইতে ইচ্ছা করি না। বর্ষাকালে বিশেষতঃ ভাদ্রমাসে ভূতের উপদ্রব হয়। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন,—এই তিনমাস আপনি যদি সুবালাকে তাহার কাকার নিকট রাখেন, তাহা হইলে ভাল হয়। কিন্তু বারোমাস তাহাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না। বৎসরের বাকী কয় মাস সে আমার নিকট থাকিবে।"

বোনঝির দেবর অর্থাৎ সুবালার কাকার সহিত রায়মহাশয়ের আলাপ-পরিচয় ছিল না। অতি দূরসম্পর্ক—স্ত্রীর ভগিনীর কন্যার দেবর। তিনি কখনও রায়মহাশয়কে দেখেন নাই। যাহা হউক, পত্র লিখিয়া ও বড়ালমহাশয়কে পাঠাইয়া রায়মহাশয় স্থির করিলেন যে, আগামী শ্রাবণ মাসে সুবালা তাহার কাকার নিকট গমন করিবে। সে স্থানে সুবালা শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাস থাকিবে, তাহার পর রায়মহাশয়ের বাটীতে মাতার নিকট ফিরিয়া আসিবে।

এক বৎসর কাটিয়া গেল। শ্রাবণ মাস আসিল। কিন্তু কাকার নিকট সুবালার যাওয়া হইল না। সুবালার মাতা গ্রহণী রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। সকলে তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল। কাজেই সুবালাকে মাতার নিকট থাকিতে হইল।

দশম অধ্যায়

মাতা ও সুবালা

ভাদ্রমাস পড়িল। মাসের শেষে পুনরায় খাঁদা ভূতের আবির্ভাব হইল। "হুহু," "হুহু", আস্তে আস্তে এই শব্দ করিয়া রাত্রিকালে খাঁদা ভূত মাঠেঘাটে বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু খাঁদা ভূতের উপদ্রব অধিক দিন থাকে না। ছয়-সাত দিন পরে সেই বিকট রবে হাঁক দিয়া সে কোথায় চলিয়া যায়। সেই কয়দিন গ্রামের লোক ঘোরতর শঙ্কিত হইয়া কালযাপন করে।

এবারও অরন্ধনের পূর্বরাত্রিতে খাঁদা ভূত বড়ালমহাশয়ের হাঁড়ি খাইয়া গেল। রায়মহাশয়ের বাহির বাটীতে দুইটি ঘরে বড়ালমহাশয় নিজে, তাঁহার গৃহিণী ও তাঁহার শ্যালকপুত্র ধনুকধারী নামক দশ বৎসরের একটি বালক, এই কয়জনে বাস করিতেন। নিকটে একটি ছোট ঘরে তাঁহাদের রান্না হইত। অরন্ধনের নিমিত্ত বড়াল-গৃহিণী যাহা কিছু রাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, খাঁদা ভূত তাহা খাইয়া গিয়াছিল। আর-একটি আশ্চর্য কথা—আহারাদি করিয়া খাঁদা ভূত সম্মুখের রকে বসিয়া মলত্যাগ করিয়াছিল। সকলেই ঘোরতর বিস্মিত হইল। গ্রামের বৃদ্ধ লোকেরা বলিল,—"এই বয়সে অনেক ভূত দেখিয়াছি, অনেক ভূতের গল্প শুনিয়াছি; কিন্তু খাঁদা ভূতের ন্যায় অদ্ভুত ভূত কখন দেখি নাই। ভূতে পান্তাভাত ও কচুশাক খায়, কচুশাক খাইয়া মলত্যাগ করিয়া যায়, এরূপ কথা কখন আমরা শুনি নাই।"

রায়মহাশয়ের বাগানের পূর্বভাগে বৃহৎ এক বাঁশঝাড় ছিল। এবার সেই বাঁশঝাড়ের ভিতর বসিয়া খাঁদা ভূত হুঙ্কার দিল। পরদিন সে যথারীতি কোথায় চলিয়া গেল।

হাঁকের কিছুদিন পরে সুবালার মাতার মৃত্যু হইল। গ্রহণী রোগ তাঁহার পূর্ব হইতেই হইয়াছিল। কিন্তু এই দুর্ঘটনার সমুদয় দোষ খাঁদা ভূতের উপর পড়িল। সকলেই বলিল যে, ভূতের হাঁকের জন্য তাঁহার মৃত্যু হইল।

সুবালার বয়ঃক্রম এক্ষণে সাত বৎসর। কন্যাটি যে খুব রূপবতী ছিল, তাহা নহে। তাহার গায়ের বর্ণ খুব গৌরবর্ণ ছিল না, গঙ্গাজলী গমের ন্যায় এক প্রকার উজ্জ্বল মাজা-মাজা বর্ণ ছিল। নাসিকাটি টিকালো ও চক্ষু দুইটি চাকচিক্যশালী কৃষ্ণবর্ণের ছিল। নিবিড় কেশরাশি হাঁটু পর্যন্ত পড়িত। মুখের ও শরীরের একপ্রকার চমৎকার মেয়েলি-মেয়েলি ভাব ছিল। তাহার মৃদু মধুর ভাব ও লজ্জাশীলতা দেখিয়া এবং সুমিষ্ট কথা শুনিয়া সকলেই সুবালাকে ভালবাসিত।

মৃত্যুর একদিন পূর্বে মাতা সুবালাকে ডাকিয়া কাছে বসাইলেন। মাতা বলিলেন,—"সুবালা! তুমি সাত বৎসরের বালিকা, আমার সকল কথা এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু কথাগুলি তুমি মনে করিয়া রাখিও, মাঝে মাঝে আমার কথাগুলি স্মরণ করিও। যত বড় হইবে, তত তুমি আমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিবে। সুবালা! মা! আর তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না।"

সুবালা হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল। চক্ষুর জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল,—"না মা! আমাকে ছাড়িয়া তুমি যাইও না। তুমি গেলে আমি কাহার কাছে থাকিব?"

মাতা বলিলেন,—"তোমার দাদামহাশয় ও দিদিমণি তোমাকে ভালবাসেন। তুমি তাঁহাদের নিকট থাকিবে। সুবালা! তোমার দিদির শোকে আমি বড় কাতর হইয়া আছি। তাহাকে স্মরণ করিয়া আমার বুক ফাটিতেছে। তোমার দিদি যে স্থানে গিয়াছে, আমি সেই স্থানে যাইতেছি।"

সুবালা বলিল,—"সে কোথায় মা? সে স্থানে গেলে যদি দিদিকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমিও সেইখানে যাইব। তুমি যদি মা, সেই স্থানে যাও, তাহা হইলে আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।"

মাতা উত্তর করিলেন,—"সুবালা! মনে করিলে কেহ সে স্থানে যাইতে পারে না। আমাদের মাথার উপর যে পরমেশ্বর আছেন, তিনি না লইয়া গেলে সে স্থানে কেহ যাইতে পারে না। তিনি আমাকে

ডাকিতেছেন, সেইজন্য আমি সেই স্থানে যাইতেছি। যখন তুমি বুড়ো হইবে, যখন তোমার দাঁত পড়িয়া যাইবে, চুল পাকিয়া যাইবে, তখন তোমাকেও তিনি ডাকিবেন। তখন তুমি সেই স্থানে যাইবে। তখন দিদির সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তখন আমাকেও তুমি সেই স্থানে দেখিতে পাইবে।"

সুবালা বলিল,—"তোমার তো চুল পাকে নাই, দাঁত পড়িয়া যায় নাই, তবে তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন কেন?"

মাতা উত্তর করিলেন,—"কোন কোন লোককে তিনি আগে থাকিতে ডাকিয়া লন, সেইজন্য আমি যাইতেছি।"

সুবালা জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কিরূপ স্থান মা?"

মা উত্তর করিলেন,—"সে অতি সুন্দর স্থান। সে স্থানে কোনরূপ দুঃখ নাই। তোমার দিদি রোগে কত কষ্ট পাইয়াছিল। সে স্থানে কাহারও রোগ হয় না, কেহ সেরূপ কষ্ট পায় না। তোমার দিদি আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। তোমার দিদির জন্য আমি কত কাঁদিতেছি, তুমি কত কাঁদিয়াছ। সে স্থানে কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া যায় না, পিতা-মাতাকে সে স্থানে কাঁদিতে হয় না।"

সুবালা বলিল,—"দাদামহাশয় ও দিদিমণিও সর্বদা কাঁদেন।"

মাতা বলিলেন,—"তাঁহাদের কন্যা ও জামাতা মরিয়া গিয়াছে, সেইজন্য তাঁহারা কাঁদেন। মানুষ যদি কুকাজ না করে, সর্বদা যদি ভাল কাজ করে, তাহা হইলে তাহাদের পুত্র-কন্যা মরিয়া যায় না, তাহাদিগকে কাঁদিতে হয় না। বড় হইলে তোমারও পুত্র-কন্যা হইবে। তুমি কখনও কুকাজ করিও না। তাহা হইলে তুমি মনের সুখে থাকিবে, কখনও তোমাকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না।"

সুবালা বলিল,—"তুমি যখন যাহা বল, তাহা আমি শুনি। সেদিন সেই চড়ুই পাখি ধরিয়াছিলাম; তুমি বলিলে,—'সুবালা! চড়ুই পাখিকে কষ্ট দিও না।' আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম।"

মাতা বলিলেন,—"তুমি লক্ষ্মী মেয়ে। ভগবান তোমাকে কুশলে রাখুন, ভগবান তোমাকে সুখী করুন। আমি যাহা বলিতেছি, এক্ষণে

ভালরূপ তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। দেখ, সুবালা! কখনও মিথ্যা কথা বলিও না, কখনও মিথ্যা আচরণ করিও না, কখনও প্রতারণা করিও না, কখনও নিষ্ঠুর হইও না, নীচের ন্যায় ব্যবহার করিও না, কখন কাহাকেও কষ্ট দিও না। কাহারও নিকট হইতে কিছু লইব, এ প্রত্যাশা কখনও করিও না। লোককে দিতে পারি, সেই কামনা করিবে। পরমেশ্বর সর্বদা তোমার নিকটে আছেন, এই কথা ভাবিয়া সকল কাজ করিবে। বালক-বালিকাদিগকে তিনি বড় ভালবাসেন। আমি মা, পরমেশ্বর তোমাকে দিয়াছিলেন—তুমি আমার প্রাণের সুবালা, তাঁহার অনুগ্রহে তোমাকে পাইয়াছিলাম। এস, মা! একবার জনমের মত তোমাকে আদর করি।"

সুবালা মাতার মুখের নিকট আপনার মস্তক অবনত করিল। দুই হাতে মাতা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। মাতার বক্ষঃস্থলে মাথা রাখিয়া সুবালা কাঁদিতে লাগিল। মাতা সুবালাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

পরদিন সুবালার মাতার মৃত্যু হইল। সুবালা মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কেহই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিল না। রায়মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু কথায় বলে,—"অল্প শোকে কাতর, আর অধিক শোকে পাথর"; তাঁহারা পূর্ব পূর্ব দুর্ঘটনায় যেরূপ অস্থির হইয়াছিলেন, এবার ততদূর অধীর হইলেন না।

কিছুদিন পরে রায়মহাশয় সুবালাকে তাঁহার কাকার বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন। সেস্থানে খুড়ীমাতা তাহাকে যথেষ্ট আদর-যত্ন করিতে লাগিলেন। কাকার পুত্র-কন্যাদিগের সহিত খেলা করিয়া মাতার শোক সুবালা অনেক পরিমাণে ভুলিয়া গেল। এইস্থানে আর-একটি বালকের সহিত সুবালার সাক্ষাৎ হইল। এই বালকটির নাম বিনয়। কলিকাতায় ইহার পিতা বাস করেন। এই গ্রামে ইহার মাতুলালয়। বালকের বয়ঃক্রম দশ বৎসর। বিনয় উত্তমরূপ ঠাকুর গড়িতে পারিত। দুর্গা, কালী প্রভৃতি প্রতিমা সে গড়িয়া দিত, মনের আনন্দে বালক-বালিকাগণ তাহা পূজা করিত। কুম্ভকার হইয়া বিনয়

ঠাকুর গড়িত, চিত্রকর হইয়া সে রং করিত, মালী হইয়া সে সাজাইত, পুরোহিত হইয়া সে পূজা করিত, কামার হইয়া সে কচুগাছ বলিদান করিত, অন্যান্য বালকগণের সহিত ঢাকিঢুলি হইয়া সে বাজনা বাজাইত। নানা সাজে সাজিয়া সে ও অন্যান্য বালকগণ ঠাকুরের সম্মুখে যাত্রা করিত অথবা থিয়েটারের অভিনয় করিত।

কার্তিক মাসে সুবালা রায়মহাশয়ের বাড়িতে প্রত্যাগমন করিল। তাঁহার সংসারের সকলেই একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এক সুবালা ব্যতীত তাঁহাদের সংসারে এখন আর কেহ ছিল না। তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে সুবালার উপর মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন। কিরূপে সুবালা বাঁচিয়া থাকিবে, রাত্রিদিন এখন তাঁহাদের সেই চিন্তা হইল।

রায়মহাশয় একদিন গৃহিণীকে বলিলেন,—"এক-এক বার মনে হয় যে, নূতন উইল করিয়া সুবালাকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করি, অথবা পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমের কথা কাটিয়া দিই ও যখন ইচ্ছা তখন বিষয় হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা তোমাকে প্রদান করি। কিন্তু খাঁদা ভূতের কথা মনে হইলে কিছু আর করিতে ইচ্ছা হয় না।"

গৃহিণী উত্তর করিলেন,—"সুবালা আগে বাঁচিয়া থাকুক, তাহার পর অন্য কথা। আপাততঃ এ বিষয়ের সহিত সুবালার কোন সংস্রবে কাজ নাই। আমি যদি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে সুবালাকেই সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাইব।"

রায়মহাশয় বলিলেন,—"তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। সুচিন্তা ও সুবালার গুণে কন্যা ও জামাতাকে আমরা ভুলিয়া ছিলাম। সুচিন্তার শোক আমার হৃদয়ে যেন শেলের ন্যায় বিঁধিয়া আছে। যেরূপ নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সে মরিয়াছে, তাহা মনে হইলে আর জ্ঞান থাকে না। আমি সর্বদাই সেই কথা ভাবিয়া থাকি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যদি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে অল্প বয়সে আমি সুবালার বিবাহ দিব না। পনর বৎসর পূর্ণ না হইলে তাহার বিবাহ আমি দিব না। সুবালার কাকাকে আমি এ সম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। আমার যদি পরলোক হয়,

তাহা হইলে ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে সুবালার তিনি বিবাহ দিবেন না,— আমার নিকট তিনি এইরূপ সত্য করিয়াছেন। তুমিও আমার নিকট সেইরূপ সত্য কর ; কারণ, যেরূপ রোগে পড়িয়া আছি, তাহাতে কখন কি হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। ডাক্তারে বলিয়াছে যে, আর দুইবার আমার পীড়া বৃদ্ধি হইবে, সেই সময় আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িব। দ্বিতীয় আক্রমণে বাঁচিয়া গেলেও যাইতে পারি। কিন্তু তৃতীয় আক্রমণে—আর কিছুতেই রক্ষা পাইব না।”

রায়মহাশয় স্ত্রীকে কঠোর সত্যে আবদ্ধ করিলেন—(প্রথম) যে, তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে, উইল করিয়া সমুদয় সম্পত্তি সুবালাকে দিবেন, অন্য কাহাকেও দিবেন না। (দ্বিতীয়) যে, সুবালার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ না হইলে তিনি তাহার বিবাহ দিবেন না।

রায়মহাশয় বলিলেন,—“আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, যে বৎসর শ্রাবণ মাসে তোমার বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবে, সেই বৎসর কার্তিক মাসে সুবালার বয়সও পনর বৎসর সম্পূর্ণ হইবে। সেই বৎসর শ্রাবণ মাসে তুমি উইল করিবে ও কার্তিক মাসের পর যখন ইচ্ছা তখন সুবালার বিবাহ দিবে। এক্ষণে সুবালাকে ভালরূপ লেখাপড়া শিখাইতে হইবে।”

সুবালার নিমিত্ত রায়মহাশয় ভাল এক জন গুরুমা নিযুক্ত করিলেন। সুবালা মনোযোগের সহিত লেখাপড়া শিখিতে লাগিল।

একাদশ অধ্যায়

জোড়া শাঁকচুন্নি

সুবালার সহিত খেলা করিবার নিমিত্ত রায়মহাশয় একজন সঙ্গিনী মনোনীত করিলেন। গ্রামে রাধা নামে গোয়ালিনী দুইটা কন্যা লইয়া বাস করিত। তাহাদের নাম ছিল চঞ্চলা ও চপলা। চঞ্চলার ভালরূপ জ্ঞান গোচর ছিল না। ঠিক পাগল না হউক, অনেকটা বটে। সেজন্য তাহার স্বামী তাহাকে লয় নাই। নাম চঞ্চলা হইলেও লোকে তাহাকে পাগলী বলিয়া ডাকিত। তাহার ছোট ভাগিনী চপলার বয়স নয়-দশ বৎসর হইবে। রায়মহাশয় তাহাকেই সুবালার সঙ্গিনীরূপে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু পাগলী ছোট ভগিনীকে বড়ই ভালবাসিত। কিছুক্ষণ তাহাকে না দেখিলে সে থাকিতে পারত না। সেজন্য সেও আসিয়া সুবালার সহিত খেলা করিত। একদিন ঝগড়া করিয়া সুবালাকে সে চাপড় মারিয়াছিল। সেই অবধি রায়মহাশয় তাহাকে বাড়িতে আসিতে দিতেন না। কিন্তু চপলাকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারিত না। যখন সুবালা ও চপলা বাগানে খেলা করিতে যাইত, তখন পাগলীও সেই স্থানে চুপি চুপি আসিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিত। রায়মহাশয় জানিতে পারিয়া তাহাও বন্ধ করিয়া দিলেন। ভগিনীকে না দেখিয়া পাগলীর বড় কষ্ট হইল। চপলা সমস্ত দিন রায়মহাশয়ের বাড়িতে থাকিত। রাত্রিতেও সুবালার নিকট একঘরে শয়ন করিত। ভগিনীকে একবার দেখিবার নিমিত্ত পাগলী কখন কখন রায়মহাশয়ের বাগানে দাঁড়াইয়া থাকিত। চপলা পূর্বদিকে দোতলায় জানালার নিকট দাঁড়াইত, দূর হইতে ভগিনীকে দেখিয়া পাগলী সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরিয়া যাইত।

সুবালা ও চপলার সহিত আর-একজন খেলা করিত। তাহার নাম ধনুকধারী। বড়ালমহাশয়ের সে শ্যালকপুত্র। বড়ালমহাশয়ের পুত্রকন্যা ছিল না, সেজন্য তাহাকে আপনার সংসারে রাখিয়াছিলেন। সুবালা অপেক্ষা সে দুই-তিন বৎসরের বড় হইবে।

সুবালা ও চপলা যখন বাগানে বেড়াইতে যাইত, ধনুকধারী তখন তাহাদের সহিত গিয়া মিলিত। যে উচ্চ গাছ হইতে বালিকা দুইটি ফুল পাড়িতে পারিত না, ধনুকধারী সেই গাছে উঠিয়া তাহা পাড়িয়া দিত। ফুল লইয়া সুবালা ও চপলা নানারূপ অলঙ্কার গড়িয়া গায়ে পরিত।

ধনুকধারী গাছ হইতে নানারূপ ফলও তাহাদিগকে পাড়িয়া দিত। কুল, তেঁতুল, আমড়া, কামরাঙ্গা প্রভৃতি অম্লফল খাইলে রায়নী বকিতেন। কিন্তু শিশুমুখে এইসকল দ্রব্য অপেক্ষা সুখাদ্য আর কি আছে? পাকা আমড়ার সময়, কখন টুপ করিয়া একটি আমড়া পড়িবে, সেই প্রতীক্ষায় সুবালা ও চপলা ঊর্ধ্বমুখে গাছপানে চাহিয়া থাকিত। কাঁচা তেঁতুল, কামরাঙ্গা ও কুলের সময় আঁচলে বাঁধিয়া তাহারা লবণ লইয়া যাইত। ধনুকধারী গাছ হইতে পাড়িয়া দিত, মনের সুখে তাহারা লবণ দিয়া তাহা ভক্ষণ করিত। পাকা ও ডাঁসা করঞ্চাগুলি নুন দিয়া খাইতে কি সুন্দর! কষা-বকুল-ফল কি অমৃততুল্য নহে? প্রচুর শস্য সম্বলিত কলসীর খেজুর সুবালার ভাল লাগিত না। কেবলমাত্র খোসা দিয়া বীজটা ঢাকা সেই যে দেশী খেজুর, বল দেখি সে কেমন? ধনুকধারী কাল যে আমলকী পাড়িয়া দিয়াছে, তাহা চিবাইয়া জল খাইলে কেমন মিষ্টি লাগে!

এইরূপে সুবালা দিনযাপন করিতে লাগিল। সুবালার প্রতি রায়মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণীর স্নেহ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সুবালার গুণে সকল লোক মুগ্ধ হইল। রায়মহাশয়কে সুবালা দাদামহাশয় বলিয়া ডাকিত, রায়-গৃহিণীকে আদর করিয়া সে দিদিমণি বলিত।

এই সময় গ্রামের লোকের আর-একটি নূতন ভয় উপস্থিত হইল। রায়মহাশয়ের বাগানে দুইজন মালী কাজ করে—ত্রিলোচন ও শঙ্করা। বাগানের উত্তর সীমায় একখানি চালাঘরে তাহারা বাস করে। একদিন রাত্রিকালে গ্রাম হইতে তাহারা বাগানে প্রত্যাগমন করিতেছিল। তাহারা দেখিল যে, সাদা কাপড় পরিহিত দুইটি স্ত্রীলোক বাগানের

ভিতর দাঁড়াইয়া আছে। চীৎকার করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। গ্রামে গিয়া তাহারা বলিল যে, সে স্ত্রীলোক দুইটির পায়ের গোড়ালি সম্মুখ দিকে। গ্রামের লোকের বুঝিতে আর বাকী রহিল না। সেই দুইটি স্ত্রীলোক মানুষ নহে, তাহারা শঙ্খচূর্ণী, যাহাকে শাঁকচুন্নি বলে। পরদিন মালী দুইজন রায়মহাশয়কে বলিল যে, স্ত্রীলোক দুইটির গায়ে বড় বড় কৃমি ঝুলিতেছিল। তাহাদের দাঁতও প্রায় একহাত লম্বা। উপর দিকে পা রাখিয়া, হাতে ভর দিয়া, দেড় হাত জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া, বাগানের ভিতর তাহারা বন্ বন্ শব্দে ঘুরিতেছিল। তাহার পর আরও কয়জন গ্রামবাসী শাঁকচুন্নি দুইজনকে দেখিতে পাইল। গ্রামে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। আতঙ্কের আর সীমা রহিল না। সকলে বলিল যে,—"এ খাঁদা ভূতের কর্ম। কোথা হইতে একজোড়া শাঁকচুন্নি আনিয়া আমাদের গ্রামে সে ছাড়িয়া গিয়াছে ; একটা নয়, দুইটা,—একজোড়া। এক তো খাঁদা ভূতের জ্বালাতেই অস্থির। তাহার উপর শাঁকচুন্নির উপদ্রব,—একটা নয়, একজোড়া। বল দেখি, ছেলেপুলে লইয়া এ স্থানে আমরা কি করিয়া বাস করি! একটা নয়, একজোড়া।" গ্রামের লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

পুনরায় শ্রাবণ মাস আসিল। শাঁকচুন্নির উপর আবার খাঁদা ভূত আসিয়া পাছে কোন বিপদ ঘটায়, সেই ভয়ে রায়মহাশয় আগে থাকিতে সুবালাকে তাহার কাকার বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন, সে স্থানে গিয়া প্রথম প্রথম সুবালার মনে সুখ হয় নাই। বিনয় তখন সে গ্রামে ছিল না। গত বৎসর বিনয় বলিয়া গিয়াছিল,—"সুবালা! যখন তুমি তোমার কাকার বাড়িতে আসিবে ; আমিও সেই সময় আমার মামার বাড়িতে আসিব।" তবে কেন বিনয় আসিল না? সুবালার মনে দুঃখ হইল। বিনয়ের উপর তাহার রাগ হইল।

চারি-পাঁচ দিনের পরে বিনয়ের মাতুলানীকে সে জিজ্ঞাসা করিল,——"হ্যাঁ গা! তোমাদের বিনয় এবার মামার বাড়ি আসে নাই কেন?"

মাতুলানী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"বিনয় এখন স্কুলে পড়িতেছে। স্কুল-কামাই করিয়া সে কিরূপে আসিবে?"

মাতুলানীর সেই ঈষৎ হাসি দেখিয়া সুবালা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল। কিছু আর না বলিয়া সে স্থান হইতে সে আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল।

যাহা হউক, কিছুদিন পরে বিনয় মাতুলের বাটীতে আসিল। সুবালা রাগ করিয়া প্রথম তাহার সহিত কথা কহে নাই। অনেক বুঝাইয়া বিনয় তাহাকে সান্ত্বনা করিল।

বিনয় বলিল,—"দেখ সুবালা! তুমি যে এখানে আসিয়াছ, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। যখন জানিতে পারিলাম, তখনও আমি আসিতে পারিলাম না। স্কুল-কামাই করিয়া কিরূপে আসিব?"

সুবালা বলিল,—"আর বারে কি করিয়া আসিয়াছিলে?

বিনয় উত্তর করিল,—"গত বৎসর আমার পীড়া হইয়াছিল। সেজন্য স্কুল-কামাই করিয়া নিয়ত আমি এ স্থানে ছিলাম। এখন আমি ভাল আছি। এখন আর স্কুল-কামাই করিতে পারি না।"

সুবালা জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে আর তুমি আসিবে না? আর আমাদের সেরূপ ঠাকুর-পূজা হইবে না?"

বিনয় উত্তর করিল,—"বাবা বলিয়াছেন যে, যদি অন্যদিন পরিশ্রম করিয়া ভালরূপে পড়া প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে তিনি আমাকে প্রতি শনিবারে এখানে আসিতে দিবেন। অন্যদিনে খুব পরিশ্রম করিয়া আমি পড়া করিয়া রাখিব। শনিবার দিন এখানে আসিব। রবিবার দিন থাকিব। সোমবার প্রাতঃকালে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিব।"

যতদিন সুবালা খুড়ামহাশয়ের বাটীতে রহিল, ততদিন বিনয় প্রতি শনিবার মাতুলালয়ে আসিতে লাগিল। পূর্বের ন্যায় খেলা-ধূলা করিয়া আমোদ-আহ্লাদে সকলে দিনযাপন করিতে লাগিল।

এ দিকে রায়মহাশয়ের বাটীতে এবার এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। ভাদ্র মাসের শেষে পুনরায় খাঁদা ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইল। একদিন রাত্রিকালে রায়মহাশয়ের বাটীর পূর্বদিকে, বাগানে সহসা দুইবার "মা গো!" এইরূপ শব্দ হইল। কে যেন ভীত হইয়া এইরূপ শব্দ করিল।

কেহ কেহ বলিল যে, সে একজনের কণ্ঠস্বর নহে, দুইজনের। একবার "মা গো!" বলি যে শব্দ হইল, তাহা রায়মহাশয়ের বাটীর ঠিক পূর্ব-গায়ে হইয়াছিল। দ্বিতীয় বারে যে "মা গো!" বলিয়া শব্দ, তাহা বাগানের ভিতরে কিছুদূরে হইয়াছিল। দুই শব্দ দুইজনের, একজনের নহে। তাহার দুই-তিন ঘন্টা পরে বাগানের ভিতর হইতে খাঁদা ভূতের হুহুঙ্কার আসিল।

যে সময়ে রায়মহাশয়ের বাগানে "মা গো" বলিয়া শব্দ হইয়াছিল, তাহার অল্পক্ষণ পরেই গ্রামের ভিতর আর-একটি ঘটনা ঘটিল। চপলার ভগিনী—যাহাকে পাগলী বলে, দৌড়িয়া সে বাটি আসিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। অনেক কষ্টে যখন লোকের উহার দাঁত-কপাটি ভাঙ্গিল, তখন সে "খাঁদা ভূত" এই কথা বলিয়া পুনরায় মূর্ছিতা হইল। এক একবার জ্ঞান হয়, আর পুনরায় "খাঁদা ভূত" বলিয়া 'আউ-মাউ' করিয়া সে মূর্ছিতা হয়। সমস্ত রাত্রি তাহার এইরূপ হইতে লাগিল।

রাত্রিকালে সে কোথা গিয়াছিল, কি দেখিয়া সে ভয় পাইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন কথা সে বলিতে পারিল না।

আরও একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল! পরদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, চপলা রায়মহাশয়ের বাড়িতে নাই। বাড়ির সদর ও খিড়কি দরজা যেমন বন্ধ, তেমনি বন্ধ ছিল, কিন্তু চপলাকে কেহ দেখিতে পাইল না। পূর্বদিকে যে ঘরে সুবালা শয়ন করিত, চপলা সেই ঘরে শয়ন করিত। যখন সুবালা এখানে ছিল, তখন দুইজনে একসঙ্গে শয়ন করিত। সুবালা এখন এখানে নাই। সেজন্য চপলা একেলা সেই ঘরে শয়ন করিত।

চপলা কোথায় গেল? কি করিয়া সে বাড়ি হইতে বাহির হইল? সে সমস্যার মীমাংসা কেহই করিতে পারিল না।

রায়মহাশয় শয্যাগত। তথাপি তিনি যথাসাধ্য চপলার অনুসন্ধান করাইলেন। চপলার মাকে তিনি সংবাদ দিলেন। মায়ের নিকট চপলা গমন করে নাই। প্রাতঃকালেও পাগলী মূর্ছিতা হইতেছিল। তাহাকে লইয়া মা ব্যস্ত ছিল। চপলার কোন সংবাদ সে দিতে পারিল না।

চপলা বালিকা। কাহারও সহিত কোন স্থানে যে চলিয়া যাইবে, সেরূপ বয়স তাহার হয় নাই। তাহার পর সদর ও খিড়কি দরজা বন্ধ ছিল। যাইবেই বা কি করিয়া ?

ভিতর-বাটী, বাহির-বাটী, উপর তালা, নীচে তালা, সমস্ত বাড়ি— সকলে তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল। সমস্ত বাগান, সমস্ত গ্রাম, বন, মাঠ, নদীর ধার সকলে খুঁজিয়া দেখিল। রায়মহাশয়ের বাগানে যতগুলি পুষ্করিণী ছিল, জাল টানিয়া তাহাতে দেখা হইল। কোন স্থানে চপলার চিহ্নমাত্র কেহ দেখিতে পাইল না। রায়মহাশয় পুলিশে খবর দিলেন। পুলিশ আসিয়াও কিছু করিতে পারিল না। চারিদিকে দশ ক্রোশ পর্যন্ত যতগুলি গ্রাম আছে, সকল স্থানে রায়মহাশয় অনুসন্ধান করাইলেন। চপলার কেহ কোন সন্ধান পাইল না।

লোকে বলে যে, মানুষকে নিশিভূতে লইয়া যায়। গাছের উপর তাহাকে বসাইয়া রাখে, অথবা মারিয়া ফেলে। গাছের উপর চপলাকে কেহ দেখিতে পাইল না। নিশিভূতে যদি মারিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মৃতদেহ কোথায় গেল ? ফলকথা, চপলার কোন সন্ধান হইল না। রায়মহাশয়ের বাটী হইতে সে একেবারে যেন উড়িয়া গেল; অবশেষে হতাশ হইয়া সকলে স্থির করিল যে, খাঁদা ভূত চপলাকে খাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার হাড়গুলি পর্যন্ত রাখে নাই। অথবা সেই শাঁকচুন্নি দুইজন তাহাকে আপনাদের সঙ্গী করিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু খাঁদা ভূত যে তাহাকে খাইয়াছে, এই কথায় সকলের অধিক প্রত্যয় হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়

টুপ ! টুপ ! টুপ

গ্রামের লোক ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িল। সকলে বলিল যে,—"খাঁদা ভূত আজ চপলাকে খাইল, কাল আমাদেরও তো খাইতে পারে। এখন উপায় কি? রায়মহাশয়ের বাটীতে অনেক পূজাপাঠ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন হইয়াছিল। তাহাতে কোন ফল হয় নাই। দুইবার ভূত নামানো হইয়াছিল। রোজার সহিত একটা মাম্‌দো ভূত, একটা রাঁকিনী, একটা শাঁকিনী এবং হাঁকিনী আসিয়াছিল। অন্ধকার ঘরে তাহারা কেবল দুপদাপ্‌ করিল, খোনা সুরে অনেক কথা বলিল, একধামা সন্দেশ ও দুই হাঁড়ি ক্ষীর খাইয়া গেল। কিন্তু খাঁদা ভূত কি জোড়া শাঁকচুন্নির তাহারা কিছুই করিতে পারিল না। এখন করা যায় কি?"

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেক যুক্তি করিয়া, গ্রামের লোক রক্ষাকালীর পূজা করিল। ঠাকুর গড়া হইল, পূজাও হইল। "খাঁদা ভূত ও তাহার শাঁকচুন্নি জোড়াকে মা, তুমি দূর কর,"—এই কামনায় স্ত্রীলোকেরা ধুনা পোড়াইল। তাহার পর গ্রামের পুরুষগণ প্রতিমার সম্মুখে জোড়হাতে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিল,—"হে মা রক্ষাকালী! তোমার নিকট আমরা আর কিছু চাই না, খাঁদা ভূত ও শাঁকচুন্নি জোড়ার দৌরাত্ম্য হইতে তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। হে মা! ভূতের উপদ্রবে আমরা জরজর হইয়াছি। তুমি খাঁদা ভূতের দমন কর, শাঁকচুন্নি জোড়াকে তুমি দূর কর। যদি না কর, মা, তাহা হইলে আর কেহ তোমার পূজা করিবে না।"

রক্ষাকালী পূজা করিয়া উপকার হইল। শাঁকচুন্নি জোড়াকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। সে বৎসর খাঁদা ভূতকেও আর কেহ দেখিতে পাইল না।

কার্তিক মাসে সুবালা বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বাড়ি আসিয়া সেও চপলা সম্বন্ধে নানারূপ তদন্ত করিল। পরদিন প্রাতঃকালে যাহারা

সেই পূর্ব দিকের ঘর দেখিয়াছিল, তাহারা বলিল, "কাজকর্ম সারিয়া আপনার ঘরে গিয়া মাদুরের উপর বসিয়া চপলা, বোধ হয়, মাথা আঁচড়াইতেছিল। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সকালবেলা আমরা দেখিলাম যে, প্রদীপের সমস্ত তেল ও সলিতা পুড়িয়া গিয়াছে। মাদুরের উপর চিরুনি ও ছেঁড়া চুল পড়িয়া আছে। এলোচুলে মাথা আঁচড়াইবার সময় ভূতে ছিদ্র পাইয়া তাহাকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।"

চপলার মাতা বলিল,—"কি বলিব দিদি! দুইটি মেয়ে লইয়া এই সংসারে ছিলাম। বিধাতা তাহাতেও বাদ সাধিলেন!"

সুবালা জিজ্ঞাসা করিল,—"পাগলী রাত্রিতে কোথায় গিয়াছিল?"

গোয়ালিনী উত্তর করিল,—"তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। চপলাকে পাগলী বড় ভালবাসিত, তাহাকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারিত না। যেদিন হইতে রায়মহাশয় তাহাকে তোমাদের বাড়ি যাইতে মানা করিলেন, সেইদিন হইতে তাহার বড় কষ্ট হইল। তোমাদের বাগানে দাঁড়াইয়া দোতলার জানালার দিকে সে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। একবার যদি দূর হইতে চপলাকে সেই জানালার ধারে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে কৃতার্থ হইয়া প্রফুল্লমুখে সে বাটী ফিরিয়া আসিত। আমি এ দিনের বেলার কথা বলিতেছি। রাত্রিতে সে কোথায় গিয়াছিল, তাহা আমি জানি না।"

সুবালা বলিল,—"সে রাত্রে পাগলী বোধ হয় খাঁদা ভূতকে দেখিয়াছিল?"

চপলার মা উত্তর করিল,—"হাঁ দিদি! তাহাই বোধ হয় হইয়াছিল। একে তো পাগলী! তাহার উপর ভয় পাইয়াছিল। মুখ শাকবর্ণ হইয়া সে বাড়িতে আসিয়া পড়িল। আমরা তাহার দাঁতকপাটি ভাঙ্গিলাম। কিন্তু জ্ঞান আর কিছুতে হয় না। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান হইল। তাহার পর "খাঁদা ভূত" এই কথাটি বলে আর পুনরায় মূর্ছিত হয়। রাত্রি দুই প্রহরের পর খাঁদা ভূতের সেই ভয়ানক 'হু হু' শব্দ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া মেয়েটা এমনি মূর্ছিত হইল যে, আমরা মনে করিলাম, আর

সে বাঁচিবে না। যাহা হউক, আপাততঃ তাহার প্রাণটা বাঁচিয়াছে। কিন্তু সেই অবধি কাহারও সহিত সে ভালরূপ কথা কয় না। কবিরাজ-মহাশয় বলিয়াছেন যে, তাহার 'স্তম্ভিত বাই' হইয়াছে। তোমরা দিদি বড়-মানুষ। কিন্তু আমি খাঁদা ভূতের কি করিয়াছি যে, সে আমার উপর এরূপ বাদ সাধিল। আমার একটি কন্যাকে সে একেবারে খাইয়া ফেলিল। আর একটিকে সে ভয় দেখাইয়া আরও পাগল করিল।"

বলা বাহুল্য যে, সুবালা পূর্বদিকের ঘরে আর শয়ন করিত না। পশ্চিমদিকের ঘরে সে বাস করিতে লাগিল। সুবালার খেলাইবার সঙ্গিনী আর হইল না। ওরূপ বিপদসঙ্কুল বাড়িতে কেহই আপনার কন্যা পাঠাইতে সম্মত হইল না। গুরুমায়ের নিকট থাকিয়া সুবালা মনোযোগের সহিত বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে লাগিল। কখন কখন ধনুকধারী আসিয়া পড়িবার ঘরে বসিত। সুবালা বাগানে বেড়াইতে গেলেও ধনুকধারীর সহিত সর্বদা সাক্ষাৎ হইত।

সুবালার প্রতি রায়মহাশয় ও তাঁহার ভার্যার স্নেহ-মমতার আর পরিসীমা রহিল না। পাছে সুবালার কোনরূপ অনিষ্ট হয়, সেজন্য সর্ব্বদাই তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া রহিলেন। সুবালাকে সমুদয় সম্পত্তি লিখিয়া দিবার নিমিত্ত রায়মহাশয় কতবার চিন্তা করিলেন। কিন্তু এ পাপের বিষয় তাহাকে দিলে পাছে কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে, সেই ভয়ে তিনি তাহা করিলেন না। "আমার অবর্তমানে যাহা হয় হইবে",—এইরূপ ভাবিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

পুনরায় শ্রাবণ মাস আসিল। সুবালা খুড়ামহাশয়ের বাড়িতে গমন করিল। সে স্থানে পূর্বের ন্যায় আমোদ-আহ্লাদে কালযাপন করিতে লাগিল।

ভাদ্র মাস পড়িল। ভাদ্র মাসের শেষে খাঁদা ভূত পুনরায় দেখা দিল। ঘোর রাত্রি। রায়মহাশয় নিদ্রা যাইতেছিলেন। সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। 'টুপ' করিয়া একটি ঢিল তাঁহার ঘরের ভিতর পড়িল। নিম্নে বাগান হইতে জানালা দিয়া

ঘরের ভিতর কে সেই ঢিলটি ফেলিল। রায়মহাশয় আপনি উঠিয়া বসিতে পারেন না। চাকর ঘরের মেঝেতে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। তাহাকে তিনি ডাকিলেন,—"গদা! গদা! আমাকে তুলিয়া বসা।"

চাকর উঠিতে না-উঠিতে, 'টুপ' করিয়া আর একটি ঢিল পড়িল।

"গদা! গদা! ওঠ। আমাকে তুলিয়া বসা",—রায়মহাশয় পুনরায় বলিলেন।

'টুপ'—আর একটি ঢিল পড়িল, আর সেই মুহূর্তে বাগানে, তাঁহার ঘরের ঠিক নিম্নে খাঁদা ভূতের হু-হু শব্দ হইল।

রায়মহাশয় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পক্ষাঘাত রোগের শেষ আক্রমণ দ্বারা তিনি আক্রান্ত হইলেন। তিন ঘণ্টা পরে তাঁহার পরলোক হইল।

আহা! সেইদিন সন্ধ্যাবেলা রায়মহাশয় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—'টাকা দিয়া সুস্থ শরীর ক্রয় করিতে পারা যায় না। পক্ষাঘাত রোগে আমি কষ্ট ভোগ করিতেছি। টাকা আমাকে রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারে না। অনেক ধনবান্ লোকের কথা আমি শুনিয়াছি, যাঁহাদের পাকস্থলী নষ্ট হইয়া গিয়াছে, পরিপাক-শক্তি একেবারে লোপ হইয়াছে, একটু সাবু খাইয়া তাঁহাদিগকে দিনপাত করিতে হয়। তাঁহারা টাকা দিয়া নূতন পাকস্থলী ক্রয় করিতে পারেন না। টাকা দিয়া কেহ যৌবনকাল ক্রয় করিতে পারে না। যযাতি রাজার গল্প সকলেই অবগত আছেন। টাকা দিয়া প্রিয়জনের পরমায়ু ক্রয় করিতে পারা যায় না। আমার কথা দূরে থাকুক, বিপুল ঐশ্বর্যশালী রাজা-মহারাজাকেও পুত্র-কন্যার মৃত্যুজনিত মর্মভেদী শোকে সন্তাপিত হইতে হয়। হায়, হায়! তবুও অধর্ম করিয়া মানুষ অর্থোপার্জন করিতে চেষ্টা করে। সেই অধর্মের প্রতিফলস্বরূপ পরিণামে কত যে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে মানুষের যদি স্থির বিশ্বাস থাকিত, পাপের ফল যদি সঙ্গে সঙ্গে ফলিত, তাহা হইলে কখনই কেহ অধর্ম করিত না। সুবালার মাতা সর্বদাই কন্যা দুইটিকে বলিত,—"দেখ সুচিন্তা! দেখ সুবালা! মিথ্যা

কথা, মিথ্যাচরণ, নীচতা, নিষ্ঠুরতা, সর্বদা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।” বেশ বুঝিতেছি যে, আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না। দূর—অতিদূর পর্যন্ত আমার মানসিক দৃষ্টি যাইতেছে। জীবনের নানা বিষয় চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, পাপের প্রতিফল ভুগিতেই হয়, নিশ্চয় ভুগিতে হয়, তবে দুইদিন আগে আর দুইদিন পরে।”

পক্ষাঘাতের শেষ আক্রমণ দ্বারা যখন তিনি আক্রান্ত হইলেন, তখন তাঁহার জ্ঞান ছিল না। মাঝে মাঝে গুটিকত কথা বিজ বিজ করিয়া তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল। নিকটে যাহারা ছিল, কান পাতিয়া তাহারা শুনিল। একবার তিনি বলিলেন,—“নদীকূলে কে ও বসিয়া? কি ভয়ানক মূর্তি! যমের কিঙ্কর? উহার নাক নাই। কাদা দিয়া নাক গড়িতেছে, মুখের উপর বসাইতেছে। তাহার পর ফেলিয়া দিতেছে। এইরূপ বার বার করিতেছে। ও কি পাগল, না ভূত, না যমদূত?”

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন,—“অতি দূরে উষর প্রান্তর; পার্শ্বে, বৃক্ষতলায় বসিয়া কে ও স্ত্রীলোকটি কাঁদিতেছে? আহা! উহার মলিন বদন দেখিয়া বড়ই দুঃখ হয়। তুমিও কি বাছা পাপ করিয়াছিলে, তাহার প্রতিফল তুমিও কি ভোগ করিতেছ? পূর্বে তুমি এই বাড়ীর কর্ত্রী ছিলে? পাপের ফলে এখন তুমি অনাথিনী? তোমার হৃদয় রাত্রিদিন দগ্ধ হইতেছে? বাছা! আমি আর তোমাকে কি বুঝাইব? আমিও সেইরূপ আগুনে দগ্ধ হইতেছি। অধিক কথা নহে, আমরা যদি লোকের মনে দুঃখ না দিতাম; লোককে আমরা যদি না কাঁদাইতাম, তাহা হইলে আমাদের কাঁদিতে হইত না।”

ক্রমে রায়মহাশয়ের গলা ঘড় ঘড় করিতে লাগিল। তাঁহার মুখমণ্ডল বিকৃত হইয়া অতি ভয়ানক মূর্তি ধারণ করিল। পক্ষাঘাত রোগে যেদিক আক্রান্ত হয় নাই, তাঁহার শরীরের সেইদিক অতি ভয়ানকভাবে প্রসারিত ও কুঞ্চিত হইতে লাগিল। তাঁহার যন্ত্রণা ও বিকট আকৃতি দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিদিগের ঘোরতর আতঙ্ক হইল। বড়ালমহাশয় বলিলেন,—“মৃত্যুকালে অনেক লোকের নিকটে আমি উপস্থিত ছিলাম,

কিন্তু এরূপ ভয়াবহ ব্যাপার কখনও আমি দর্শন করি নাই। আমি আর দেখিতে পারি না।" এই বলিয়া সে স্থান হইতে তিনি পলায়ন করিলেন। অল্পক্ষণ পরে রায়নীও সেই কথা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর হইতে পলায়ন করিলেন। গদা চাকরও ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। মৃত্যুকালে রায়মহাশয় একলা পড়িয়া রহিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ঝেঁকড়া-চুলো ছোঁড়া

রায়মহাশয়ের পরলোক হইলে, রায়-গৃহিণী সুবালাকে আনিতে পাঠাইলেন। সুবালা আসিয়া দাদামহাশয়ের জন্য অনেক কাঁদিল। "আমাকে তোমরা সংবাদ দাও নাই কেন? আমি দাদামহাশয়কে দেখিতে পাইলাম না।" এই বলিয়া সুবালা খেদ করিতে লাগিল।

"রায়মহাশয়ের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে, সংবাদ দিবার সময় ছিল না,"—এই কথা বলিয়া সুবালাকে সকলে বুঝাইতে লাগিল।

সুবালাকে কাছে ডাকিয়া রায়-গৃহিণী অনেক আদর করিলেন। তিনি বলিলেন,—"সুবালা! আমার যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। একে একে সকলেই গেল। বাকী কেবল আমি আর তুমি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। তুমি কোন পাপে নাই। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যে, খাঁদা ভূত তোমার অনিষ্ট করিতে সাহস করিবে না। ভগবান্ তোমাকে রক্ষা করিবেন।"

সুবালা বলিল,—"তোমাকেও, দিদিমণি, তিনি বাঁচাইয়া রাখিবেন।"

রায়নী বলিলেন,—"বাঁচিয়া থাকিতে আমার তিলমাত্র সাধ নাই। তবে, কেবল তোমার নিমিত্ত আর সাত বৎসর পৃথিবীতে থাকিতে ইচ্ছা হয়। তাহা হইলে তোমাকে এই বিষয় দিয়া যাইতে পারি। এই সম্পত্তি তোমাকে দিয়া একজন রূপবান্ গুণবান বরের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিয়া মানে মানে যাইতে পারিলেই আমি এখন কৃতার্থ হই।"

রায়-গৃহিণী পুনরায় বলিলেন,—"আরও কথা এই, সুবালা! এই সম্পত্তি পাছে অন্য লোকের হাতে পড়ে, সেজন্য আমার বড় ভয়! তুমি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে যে, রায়মহাশয়ের এক ছোট ভাই আছে; তাহার নাম বিজয়। সে কলিকাতায় থাকে। তাহার বড় অহঙ্কার। সে বড় দুষ্ট। তোমার দাদামহাশয় আমাকে বার বার বলিয়া গিয়াছেন যে, সম্পত্তি কিছুতেই যেন সে না পায়। যদি আমার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ না হয়, যদি সম্পত্তি তোমাকে আমি উইল করিয়া দিতে না পারি, তাহা হইলে সেই দুর্বৃত্ত ইহা পাইবে।"

সুবালা জিজ্ঞাসা করিল—"তিনি বড় দুষ্ট?"

রায়-গৃহিণী উত্তর করিলেন—"সে বড় দুষ্ট! তোমার দাদামহাশয়কে বঞ্চনা করিয়া সে এই বিষয় লইতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার পর খাঁদা ভূতের উপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া, তোমার দাদামহাশয় যখন তাহার নিকট হইতে খাঁদা ভূতের নাক চাহিলেন, তখন সে কিছুতেই দিল না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি তাহার কিছুমাত্র মমতা হইল না। তবেই বুঝিয়া দেখ যে, সে কেমন নির্দয়, কেমন নিষ্ঠুর!"

সুবালা জিজ্ঞাসা করিল,—"তিনি দেখিতে কিরূপ দিদিমাণ?"

রায়-গৃহিণী উত্তর করিলেন—আমি অনেক দিন পূর্বে তাহাকে দেখিয়াছি। এখন বোধ হয়, বিভীষণের মত তাহার মুখ হইয়া থাকিবে। চক্ষু দুইটা জবা ফুলের মত হইয়া থাকিবে। ভগদত্তর হাতির মত তাহার শরীর হইয়া থাকিবে। নাকটা বাঁশের মত হইয়া থাকিবে।"

সুবালা বলিল,—"সর্বনাশ! কি ভয়ঙ্কর চেহারা!"

রায়-গৃহিণী বলিলেন,—"হাঁ, সে পাপাত্মার নাম করিও না; তোমার ভয় হইবে।"

পুনরায় বর্ষাকাল পড়িল। শ্রাবণ মাসে সুবালা কাকা-মহাশয়ের গৃহে গমন করিলেন। ক্রমে তিনি বড় হইতে লাগিলেন, সেইসঙ্গে খেলা-ধূলাও বন্ধ হইতে লাগিল। বিনয়ের সহিত আর তিনি সেরূপ খেলা করিতেন না। তবে মনে মনে দুইজনে বিলক্ষণ প্রণয় হইয়াছিল। সেই প্রণয় দিন দিন পরিবর্ধিত হইতে লাগিল। দেখা-সাক্ষাৎ করিবার

নিমিত্ত, এক স্থানে বসিয়া গল্প-গাছা করিবার নিমিত্ত, দুইজনে সর্বদাই উৎসুক হইয়া থাকিতেন। পূর্বের ন্যায় এখন আর ঘন ঘন দেখা হইত না। যখন দেখা হইত, তখন দুইজনে লেখা-পড়ার গল্প করিতেন।

গত বৎসর রক্ষাকালীর পূজা করিয়া গ্রামের লোক শাঁকচুন্নির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। এ বৎসরও তাহারা রক্ষাকালীর পূজা করিল। কালীর কৃপায় এ বৎসর ভাদ্রমাসে খাঁদা ভূত একেবারেই গ্রামে আসিল না। গ্রামের লোকের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। সকলে বলিল,—"রক্ষাকালী জাগ্রত দেবতা। ভূত-প্রেত সকলেই তাঁহাকে ভয় করে। তাঁহার কৃপায় খাঁদা ভূতের হাত হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইলাম।"

নানা বিপদে বিপন্ন হইয়া রায়মহাশয় ইদানীং গ্রামের লোককে উৎপীড়ন করিতেন না। সেজন্য শেষ অবস্থায় গ্রামবাসীদের সহিত তাঁহার কতকটা সদ্ভাব হইয়াছিল। তথাপি কেহ কেহ বলিল,—"রায়-মহাশয়ের পাপে খাঁদা ভূত এ গ্রামে আসিত। এখন তিনি নাই। সেজন্য খাঁদা ভূত এ গ্রামে আসে নাই।"

পর বৎসরও খাঁদা ভূতের উপদ্রব হইল না। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। খাঁদা ভূতের দেখা নাই; গ্রামের লোকে ক্রমে তাহাতে বিস্মৃত হইল। কিন্তু পাঠক! খাঁদা ভূতের জন্য দুঃখ করিবেন না। খাঁদা ভূতের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে। আর শাঁকচুন্নির হাড় দেখিয়া যদি;—থাক্, সে কথায় এখন কাজ নাই।

খাঁদা ভূত আর আসিল না। সেজন্য বড়ালমহাশয় ও রায়-গৃহিণীর আহ্লাদ হইল। রায়নীকে জীবিত রাখিবার নিমিত্ত বড়ালমহাশয় যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিলেন। "ইনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন আমি মাসিক পঞ্চাশ টাকা পাইব। রাজাবাবু আমাকে যাহা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা আমি পাই নাই। রায়-গৃহিণীকে সে কথা আমি বলিয়া দেখিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া বড়াল-মহাশয় রায়নীকে বাঁচাইয়া রাখিবার নিমিত্ত বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

রায়নী মনে মনে ভাবিতেছিলেন,—"যখন খাঁদা ভূতের দৌরাত্ম্য দূর হইল, তখন আর ভাবনা নাই। পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কেবল আর দুই বৎসর বাকী আছে। এ দুই বৎসর নিশ্চয়ই আমি বাঁচিয়া থাকিব। দুই বৎসর পরে শ্রাবণ মাস আসিলে সমুদয় বিষয় সুবালাকে আমি লিখিয়া দিব। তাহার পর সুবালার বিবাহ দিব। এই দুইটি কাজ হইয়া গেলে মরি—মরিব। সে মরণে আমার খেদ নাই। কিন্তু কিছুদিন হইতে রাত্রিতে আমার গলা খুশ খুশ করে। সে জল-কাশি, সে কিছু নহে।"

কিছু নহে?—তাহা বড় নয়। রাত্রিকালে সেই কাশির শব্দ ক্রমে বড়াল মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল। তাঁহার ভয় হইল। তিনি ডাক্তার আনাইলেন। ডাক্তার বলিলেন,—"আপাততঃ কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু আমার সন্দেহ হইতেছে।"

ডাক্তার ঔষধ দিয়া গেলেন। আপাততঃ কোন ভয় নাই বটে, কিন্তু রায়-গৃহিণী দিন দিন কৃশ হইতে লাগিলেন।

বর্ষাকালে সুবালা খুড়ামহাশয়ের গৃহে গমন করিয়াছিলেন। রায়নীকে সর্বদা তিনি পত্র লিখিতেন। একবার তিনি লিখিলেন,—"দিদিমণি! এ স্থানে বিনয় বলিয়া একটি লোক আছেন। ছেলেবেলা হইতে তাঁহাকে আমি জানি। তাঁহার বাড়ি কলিকাতা, এই গ্রামে তাঁহার মামার বাড়ি। তিনি বড়মানুষের ছেলে। তিনি চাকরি করিবেন না। সেজন্য তিনি বি-এ, এম-এ, পাশ করেন নাই। ছবি আঁকার দিকে তাঁহার ঝোঁক। ফটোগ্রাফ লইতে ও ছবি আঁকিতে তিনি উত্তমরূপ শিখিয়াছেন। আমার তিনি ফটোগ্রাফ লইয়াছেন। একখানি তোমার নিকট পাঠাইলাম। ঠিক যেন আমি। এখন রং দিয়া আমার বড় একখানি ছবি তিনি আঁকিতেছেন। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, এইরূপ তোমার একখানি ছবি আঁকা হয়। নামাবলী গায়ে দিয়া জপের মালা হাতে করিয়া তুমি বসিয়া আছ সেইরূপ ছবি আমার সাধ। আমি বিনয়কে বলিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ি গিয়া তোমার ছবি আঁকিতে তিনি সম্মত আছেন। তাঁহার পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক। কাহারও নিকট হইতে তিনি কিছু গ্রহণ করেন না।"

প্রত্যুত্তরে রায়-গৃহিণী লিখিলেন,—"আমি মেয়েমানুষ, হতভাগিনী। আমার আবার ছবি কেন? যাহা হউক, তোমার যদি সাধ হইয়া থাকে, সে সাধ আমি পূর্ণ করিব। যদি সে লোক সম্মত হন, তাহা হইলে তুমি যখন এখানে আসিবে, সেই সময় তাঁহাকেও আসিতে বলিবে।"

কার্তিক মাসে সুবালা বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। রায়-গৃহিণীর ছবি আঁকিবার নিমিত্ত অগ্রহায়ণ মাসে বিনয়ও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গায়ে নামাবলী ও হাতে জপের মালা দিয়া সুবালা তাঁহাকে বসাইতেন। বিনয় তাঁহার ছবি আঁকিতেন। প্রতিদিন এক ঘণ্টার অধিক রায়-গৃহিণী বসিতে পারিতেন না। কারণ, কাশি এখনও তাঁহার ভাল হয় নাই। ক্রমেই তিনি দুর্বল ও কৃশ হইয়া পড়িতেছিলেন। ছবি শেষ হইতে সেজন্য বিলম্ব হইতেছিল। বাহির-বাটীতে ভাল একটি ঘর বড়ালমহাশয় সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন। সেই ঘরে বিনয় বাস করিতেছিলেন।

যতক্ষণ ছবি আঁকা হইত, সুবালা ততক্ষণ সেই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। সেই সময় তিনজনে কথা-বার্তা হইত। বিনয় কত হাসির গল্প করিতেন। তাহা শুনিয়া রায়নীও হাসিতেন, সুবালাও হাসিতেন।

বিনয় ও সুবালার ভাব দেখিয়া রায়নীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। রায়-গৃহিণী ভাবিলেন,—"সুবালা এখন আর নিতান্ত বালিকা নহে। আমি দেখিতেছি যে, ইহাদের দুইজনে প্রণয় হইয়াছে। তাহা ভাল নহে। যুবক ব্রাহ্মণ বটে। কিন্তু ইহার পরিচয় আমি জানি না। সুবালার বাপ কিরূপ ব্রাহ্মণ, কুলীন কি বংশজ,—তাহা আমি জানি না। ছেলেটি ভাল, ধীর, শান্ত, মিষ্টভাষী। ইহার শরীরে কোন দোষ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? ইহার বাপ শুনিতেছি, বড়মানুষ। অনেক গোল। এখন আর খাঁদা ভূতের উপদ্রব নাই। সুবালাকে আর আমি তাহার কাকার বাড়ি যাইতে দিব না। সুবালার কাকাকে পত্র লিখিব। যদি হয়তো ভালই হয়। আমি নিশ্চিন্ত হই।"

চিত্র-অঙ্কনকালে ও অন্য সময়েও এইরূপ চিন্তা রায়-গৃহিণীর মনে উদয় হইত।

গুরু-মাকে সঙ্গে লইয়া বৈকাল বেলা সুবালা বাগানে বেড়াইতে যাইতেন, বিনয়ও কখন কখন সেই স্থানে যাইতেন। তিনজনে এ গাছ সে গাছ দেখিয়া বেড়াইতেন ও বেড়াইতে বেড়াইতে বিনয় নানারূপ গল্প করিতেন। সুবালা নিজে একটি ফুলের বাগান করিয়াছিলেন। বিনয় তাঁহাকে অনেক প্রকার বিলাতী ফুলের বীজ দিয়াছিলেন। সুবালা নিজ হাতে গাছগুলির গোড়া খুঁড়িয়া দিতেন, তাহাদের মূলে জলসেচন করিতেন। কোন্ গাছ অঙ্কুরিত হইতেছে, কোন্ গাছে মুকুল বাহির হইতেছে, কোন্ গাছে ফুল প্রস্ফুটিত হইতেছে, সেই সমুদয় দেখিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন।

বিনয় ও সুবালাকে একসঙ্গে দেখিলে হিংসায় ধনুকধারীর বুক ফাটিয়া যাইত। ধনুকধারী মনে করিত,—"ঝেঁকড়া-চুলো এ উপসর্গটা কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল? আমি এখন কেহ নই। ধনুকধারী লবণ লইয়া এস, ধনুকধারী লঙ্কা লইয়া এস, ধনুকধারী আমড়া পাড়িয়া দাও, ধনুকধারী এ কাজ কর, সে কাজ কর, তখন ধনুকধারী গোলাম ছিল,—এখন ধনুকধারী কেহ নয়। এখন ধনুকধারী কর্মচারীর শ্যালকপুত্র—কীটস্য কীট, পদদলিত করিবার উপযুক্ত পাত্র।"

চিত্র-অঙ্কন-কার্যে নিযুক্ত শিল্পকারগণ মাথায় বড় বড় চুল রাখিয়া দেন। প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিনয়ও মাথায় বড় বড় চুল রাখিয়াছিলেন। সেইজন্য ধনুকধারী দ্বারা তিনি 'ঝেঁকড়া-চুলো' উপসর্গ নামে অভিহিত হইলেন।

রাগে গর্ গর্ করিয়া, অন্তরাল হইতে ধনুকধারী তাঁহাদিগকে দেখিত। "দূর কর, আমি আর দেখিব না, দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়।" এই বলিয়া একদিন ধনুকধারী একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া চক্ষু বুজিয়া রহিল। অধিকক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া থাকিতে পারিল না। পুনরায় চক্ষু চাহিল। সেই সময় বিনয় সুবালাকে কি বলিলেন,

সুবালা হাসিয়া উঠিলেন। দূর হইতে হাসির শব্দ ধনুকধারীর কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। হাসি অতি সুমিষ্ট বটে, কিন্তু সে হাসি ঐ ঝেঁক্‌ড়া-চুলো ছবি-আঁকা ছোঁড়ার কথায় উৎপত্তি হইয়াছিল। ধনুকধারীর কানে যেন বিষ ঢালিয়া দিল।

দূর হইতে ভাল করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য ধনুকধারী এক অশ্বত্থ গাছের উপর উঠিল। অতি উচ্চ ডালের উপর বসিয়া বিরস-বদনে সুবালা ও বিনয়কে সে দেখিতে লাগিল।

'খুট' করিয়া গাছে একটু শব্দ হইল। বিনয়ের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। বিনয় বলিলেন,—"দেখ, দেখ। অশ্বত্থ গাছে কে একটা লোক বসিয়া রহিয়াছে।"

তিনজনে নিকটে আসিলেন। নিকটে আসিয়া সুবালা তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ধনুকধারী! তুমি গাছের উপর বসিয়া কেন?"

ধনুকধারী উত্তর করিল,—"বসিয়া আছি।"

গুরু-মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐ কি বসিয়া থাকিবার স্থান?"

ধনুকধারী উত্তর করিল,—"দোষ কি?"

সুবালা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। হাসিতে হাসিতে তিন-জনে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। অভিমানে, দুঃখে ও ক্রোধে ধনুক্‌ধারীর সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

ধনুকধারী ভাবিতে লাগিল,—"বেটার প্রখর দৃষ্টি দেখ! আমি গাছে বসিয়া আছি, তা তোর কি রে বেটা? আমি কেহ নই, কিছুতেই তোমাদের সমকক্ষ নই, আমি মানুষ নই। বটে! তোমরা ধনবান্, আমি গরীব, তোমরা ব্রাহ্মণ, আমি কায়েত, কোন বিষয়ে তোমাদের আমি সমকক্ষ নই, সেইজন্য আমাকে এত অবজ্ঞা, বটে!!"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

আর সে কাল নেই

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ধনুকধারী গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল। সে স্থানে এক ব্রাহ্মণকুমারের সহিত দেখা হইল। ব্রাহ্মণ বলিল,—"কি হে ধনুকধারী! বিরসবদন কেন?"

ধনুকধারী উত্তর করিল,—"তোমার কি?"

ব্রাহ্মণ বলিল,—"ইস! কেউটে সাপ! তোমার পিসেমহাশয় আমাদের দেখিলে জোড়হাতে প্রণাম করেন। তুমি মেজাজ করিয়া থাক। ভ্রূক্ষেপ কর না।"

ধনুকধারী উত্তর করিল,—"যাও যাও! আর সে কাল নাই। কলিকাতায় সভা হইয়াছে। নূতন শাস্ত্র বাহির হইয়াছে। এখন আর কায়স্থ নয়, বাছাধন! এখন ক্ষত্রিয়। গলায় এখন এই—সকলেই এখন পরিতেছে।"

ব্রাহ্মণ বলিল,—"যাহাদের গলায় সূতাগাছটা আছে, ভজকট ভাবিয়া তাহারা ফেলিয়া দিতেছে। যাহাদের নাই, তাহারা ইহার জন্য লালায়িত হইয়াছে। পৃথিবীর রহস্য কিছু বুঝিতে পারা যায় না। সে যাহা হউক, তোমার পিসেমহাশয় বড়াল। বড়াল কি কখনও কায়স্থ হয়?"

ধনুকধারী উত্তর করিল,—"বড়াল নহে, বটব্যাল। লোকে বড়াল বলে। বটব্যাল একটা গ্রামের নাম। তোমাদের যেমন খড়দহ। সেই গ্রামের নাম হইতে পিসেমহাশয়ের পদবী হইয়াছে। বড়াল ব্রাহ্মণ আছে, বণিক আছে, কায়স্থও আছে।"

ব্রাহ্মণ বলিল,—"তা যেন হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণ দেখিয়া প্রণাম করিবে না কেন?"

ধনুকধারী উত্তর করিল,—"সে এখন উঠিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ আমি দত্ত। দত্ত কাহারও ভৃত্য নহে। কায়স্থ, নামের পূর্বে আর "দাস" লিখিবে না। দাস ঘোষ, দাস বোস, এ সব এখন উঠিয়া

যাইবে। আমরা রামের জাতি, কৃষ্ণের জাতি, তোমাদিগকে এখন আমাদের পায়ে—না, আর অধিক কথার প্রয়োজন নাই, সেকেলে গোঁড়ারা রাগ করিবে।"

এই বলিয়া ধনুকধারী গজ গজ করিতে করিতে সেস্থান হইতে চলিয়া গেল।

ছবি অঙ্কন শেষ হইল। বিনয় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। রায়নী সুবালার কাকাকে পত্র লিখিলেন,—"আমার ছবি আঁকতে বিনয় বলিয়া যে ছেলেটি আসিয়াছিল, সে অতি ভাল ছেলে। তাহার রূপে ও গুণে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু তোমাদের কিরূপ বংশ, তাহার কিরূপ বংশ, সে সকল কথা আমি জানি না। তাহার মামার বাড়ি তোমাদের গ্রামে। যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে সুবালার সহিত তাহার সম্বন্ধ হয় না? আমার শরীর ভাল নহে। কাশি কিছুতেই ভাল হইতেছে না। দিন দিন আমি কৃশ ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছি। কোন একটি ভাল ছেলের হাতে সুবালাকে সমর্পণ করিয়া যাইতে পারিলে আমি সুখে মরিতে পারি।"

বাস্তবিক রায়নীর শরীরের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। ডাক্তারে বলিল যে, তাঁহার ক্ষয়কাশ হইয়াছে, তবে আশু বিপদের আশঙ্কা নাই।

বড়ালমহাশয়ের প্রাণ উড়িয়া গেল। কিরূপে আর দুইটা বৎসর তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন, সেজন্য তিনি ভাবিত হইলেন। ডাক্তার-দিগের নিকট অনেক মিনতি করিলেন। ডাক্তারগণ বলিল,—"ভগবান ভিন্ন মানুষের কেহ প্রাণ দিতে পারে না। দুই বৎসর দূরে থাকুক, এক-দিনের জন্য কেহ কাহারও পরমায়ু বৃদ্ধি করিতে পারে না। কোন কোন রোগে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বড়জোর ঘণ্টা কয়েক মানুষকে জীবিত রাখিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাও সন্দেহ।"

রায়-গৃহিণীর প্রথম ডাক্তারী চিকিৎসা হইল। কোন ফল হইল না। তাহার পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হইল, কিছুই হইল না। অবশেষে কবিরাজী চিকিৎসা হইল। কলিকাতা হইতে অনেক বৈদ্য

আসিলেন। রোগীকে তাঁহারা ঝুড়ি ঝুড়ি রংকরা কুইনাইনের বড়ি খাওয়াইলেন। বাঘিনীর দুগ্ধ, গণ্ডারের পিত্ত প্রভৃতি অনেক প্রকার দুর্লভ অনুপানের ব্যবস্থা করিলেন। বড়ালমহাশয় প্রাণপণে সে সমুদয় বস্তু আহরণ করিলেন। অবশেষে একজন বড় কবিরাজ আসিয়া বলিলেন,—"যদি কুম্ভীরের মাথার চুলের সাত শত একান্নটি উৎকুণ আনাইতে পারেন, তাহা হইলে রোগিণীকে আমি রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারি।"

বড়ালমহাশয় এইবার পরাস্ত হইলেন। সে বস্তু তিনি আনিতে পারিলেন না। এরূপ অনায়াসলভ্য দ্রব্য যদি না আনাইতে পারিলেন, তাহা হইলে রোগিণী কি করিয়া ভাল হইবেন!

সুবালার কাকামহাশয় রায়-গৃহিণীর পত্র পাইলেন। বিনয়ের বংশ-পরিচয় কাকামহাশয় প্রথম হইতেই অবগত ছিলেন। কুলমর্যাদা সম্বন্ধে দুই বংশে আদান-প্রদান হইতে পারে। বিনয়ের পিতা সঙ্গতি-পন্ন ব্যক্তি। মায়ের মাসীর কল্যাণে সুবালা নগদ টাকা ও ভূসম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন। তাহার পর, বিনয় পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র। সুবালা সম্বন্ধে অনেক দিন হইতেই লোকে তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া-ছিল। এই কথা লইয়া তাঁহাকে ও সুবালাকে অনেকে তামাসা করিয়াছিল। বিনয় যাহাতে সন্তোষ লাভ করেন, তাঁহার পিতা-মাতা নিশ্চয় তাহা করিবেন। সুবালার কাকামহাশয় মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে বিনয়ের মাতা সেই সময় পিত্রালয়ে ছিলেন। প্রথম স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে কথার সূচনা হইল। বিনয়ের মাতা সম্মত হইলেন।

তাহার পর কাকামহাশয় বিনয়ের পিতার নিকট গমন করিলেন। তিনিও এ বিবাহে সম্মত হইলেন। কথা হইয়া থাকিবে, কিন্তু কেন সুবালার এখন বিবাহ হইবে না, সে সমুদয় বৃত্তান্ত কাকামহাশয় বিনয়ের পিতাকে প্রদান করিলেন। কথাবার্তার সময় কাকামহাশয় সুবালার পিতার নাম করিলেন। সুবালার পিতা কে, সে সম্বন্ধে অধিক পরিচয় দিতে হইল না।

বিবাহের সম্বন্ধের সময় কেহ আর কন্যার মায়ের, মায়ের ভগিনীর স্বামীর পরিচয় প্রদান করে না। রায়মহাশয় সুবালার মায়ের মেসো ছিলেন, সুবালার সহিত তাঁহার অন্য কোন নিকট সম্বন্ধ ছিল না। সেজন্য বিবাহের কথাবার্তার সময় রায়মহাশয়ের নাম পর্যন্ত কেহ উল্লেখ করিল না। সুবালা যে রায়মহাশয়ের বাড়িতে প্রতিপালিত হইয়াছেন, সুবালা রায়মহাশয়ের সম্পত্তির যে উত্তরাধিকারিণী হইবেন, এ কথার বিন্দুবিসর্গ বিনয়ের পিতা জানিতে পারিলেন না। তিনি কেবল এইমাত্র শুনিলেন যে, কন্যার মাতার মাসীর ভূসম্পত্তি আছে। কন্যা সেই সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন। কন্যা মায়ের মাসীর নিকট থাকেন। বিনয়ের পিতা-মাতা সম্মত হইলেন। দুই বৎসর পরে, অর্থাৎ সুবালার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ হইলে বিবাহ হইবে। এখন কথা স্থির হইয়া রহিল। দুই পক্ষই এইরূপ সত্য করিলেন।

লোক-পরম্পরায় বিবাহের কথা ক্রমে সুবালার কানে উঠিল, বিনয়েরও কানে উঠিল। বলা বাহুল্য যে, দুইজনেই আহ্লাদিত হইলেন।

সুবালা ভাবিলেন,—"বিনয়কে দেখিয়া আমি কি করিয়া লজ্জা করিব? এখন আমি লজ্জা করিতে পারিব না। আমি যেন এ কথা শুনি নাই, সেইভাবে বিনয়ের সহিত কথোপকথন করিব।"

বিনয় ভাবিলেন,—"সুবালাকে যদি কেহ এ কথা এখনও না বলে তাহা হইলে ভাল হয়। এ কথা শুনিলে সুবালা হয় তো আর আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিবে না। যাহা হউক, আমি এ বিষয়ের বিন্দুমাত্র উল্লেখ করিব না।"

বিবাহের কথা যেন আমি শুনি নাই, এই ভাবে বিনয়ের সহিত আমি কথা কহিব"—সুবালা মনে মনে এইরূপ স্থির করিলেন বটে, কিন্তু কাজে তিনি তাহা করিতে পারিলেন না। স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা স্ত্রী-লোকের লজ্জা আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। বিনয়ের সহিত তিনি কথোপকথন করিতেন বটে, কিন্তু মুখ তুলিয়া আর বড় চাহিতে

পারিতেন না। একপ্রকার লজ্জিত, কুণ্ঠিত, শঙ্কিতভাবে তিনি বিনয়ের সহিত কথা কহিতেন।

ক্ষয়কাশ। দ্রুতবেগে রায়-গৃহিণীর পীড়া বৃদ্ধি হইল না বটে, কিন্তু শুষ্ক হইয়া দেহ তাঁহার অস্থি-চর্মসার হইয়া পড়িল।

প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। এ বৎসর শ্রাবণ মাসের ২০শে রোগিণীর বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবে। আষাঢ় মাস পড়িল। আর দুইটা মাস! দুইটা মাস কেন,—একমাস কুড়ি দিন। এত দিন কাটিয়াছে; এই কয়টা দিন কি আর কাটিবে না?

কিন্তু বর্ষা আরম্ভে রায়-গৃহিণী ফুলিয়া পড়িলেন। উদরের দোষও হইল। শ্রাবণ মাসের ২০শে পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবেন কি না,—ডাক্তার-বৈদ্য কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিল না।

বড়ালমহাশয় ও রায়-গৃহিণী দুইজনে পরামর্শ করিয়া এবার সকাল সকাল সুবালাকে কাকার বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন। সুবালা কিছুতেই যাইতে সম্মত হয় নাই। "দিদিমণির এমন অসুখ, কি করিয়া এ অবস্থায় তাঁহাকে আমি ফেলিয়া যাইব",—এই বলিয়া সুবালা কাঁদিতে লাগিলেন।

কিন্তু রায়-গৃহিণী তাঁহার কথা শুনিলেন না। "তুমি সেখানে না গেলে আমার প্রাণ সুস্থির হইবে না। মন অস্থির থাকিলে আমার পীড়া বৃদ্ধি হইবে। যদি বা কিছুদিন বাঁচিতাম, তোমার ভাবনায় তাহাও বাঁচিব না। যাও দিদি, যাও! আমার কথা অমান্য করিও না।" রায়-গৃহিণী এইরূপে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

সুবালা বলিলেন,—"তোমার কথা আমি অমান্য করিব না, আমি চলিলাম। কিন্তু দিদিমণি। তোমার পীড়া যদি বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে বড়ালমহাশয় তৎক্ষণাৎ যেন আমাকে সংবাদ দেন। সংবাদ পাইলেই আমি চলিয়া আসিব।"

বড়ালমহাশয় স্বীকৃত হইলেন। বিরসবদনে, ছল ছল নয়নে সুবালা খুড়ামহাশয়ের বাটীতে গমন করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়
পুনরায় উইল

রায়-গৃহিণীর অবস্থা আরও মন্দ হইল। ডাক্তার-বৈদ্যগণ হতাশ হইয়া পড়িলেন। ২০শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত তিনি যে বাঁচিয়া থাকিবেন, সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহ হইল।

এই সময় গ্রামের লোকের আর একটি বিপদ উপস্থিত হইল। এই দুর্ভাগা গ্রামের লোকের কি কপাল! বিধাতা কি ইহাদিগকে সুস্থির হইয়া কালযাপন করিতে দিবেন না? প্রথমে খাঁদা ভূতের জ্বালায় কয়েক বৎসর লোক জর্জরিত হইল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাহার ভয়াবহ হুহুঙ্কার রবে লোকের পেটের প্লীহা চমকিত হইল। তাহার পর শাঁকচুন্নি! একটা নহে দুইটা,—একজোড়া। লক্ লক্ জিহ্বায় কাহাকে খাই, কাহাকে খাই করিয়া কিছুদিন গ্রামের লোককে উৎপীড়িত করিল। শাঁকচুন্নির উপদ্রবের সময় শঙ্করা আরও দুই তিনবার দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়াছিল এবং শঙ্করাই গ্রামের লোককে শাঁকচুন্নির আকৃতি-প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিল। অতি কষ্টে এই দুই বিপদ হইতে লোক পরিত্রাণ পাইল। এখন আবার এক নূতন বিভীষিকা উপস্থিত হইল। একদিন প্রাতঃকালে যুধিষ্ঠির ঘোষের পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র হেরম্ব, পথে একটি নেকড়ার অর্থাৎ ছিন্নবস্ত্রের পুঁটুলি মাড়াইয়া ফেলিল। পথে তিনটি পুঁটুলি পড়িয়া ছিল। যে-সে পথ নহে, তিন মাথার পথ, অর্থাৎ তিনটি গ্রাম্য পথ এই স্থান হইতে তিন দিকে গিয়াছিল। তেমাথা পথের ঠিক সন্ধিস্থলে পুঁটুলি তিনটি পড়িয়া ছিল। লোকে ভাবিয়া দেখিল যে, গত রাত্রি শনিবারের রাত্রি ছিল। গ্রামের বিজ্ঞ লোকেরা আসিয়া পুঁটুলি তিনটি দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। ভয়ে তাহারা হতভম্ব অবাক্ হইয়া রহিল! বলিবে আর ছাইভস্ম কি! এ ঘোর সর্বনাশের কথা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারা যায় না। সেজন্য অতি গম্ভীরভাবে দুই-চারি বার ঘাড় নাড়িয়া তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কিন্তু গ্রামের লোক নির্বোধ নহে! বুঝিতে আর কিছু বাকি

রহিল না। উহাকে তুক্ বা গুণ বলে। অতি সাংঘাতিক তুক্। এ তুক্ মাড়াইলে বা ডিঙ্গাইলে আর রক্ষা নাই। গ্রামের লোকের এরূপ সর্বনাশ কে করিয়াছে, তাহাও কি আর বুঝিতে বাকী থাকে? কাহার অনেক টাকা আছে? মরণাপন্ন-রোগগ্রস্ত হইয়া কে বিছানায় পড়িয়া আছে? কে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে? বড়ালমহাশয়কে সকলে ছি ছি করিতে লাগিল।

দূর হইতে পুঁটুলি তিনটির উপর অনেক শুষ্ক খড় নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করা হইল। তাহা যেন হইল। কিন্তু যুধিষ্ঠির ঘোষের পুত্র হেরম্ব পুঁটুলির উপর যে পা রাখিয়াছিল, এখন তাহার উপায় কি? সকলে বলিল যে, সে আর কিছুতেই রক্ষা পাইবে না। তাহার পিতামহী, তাহার মাতা, তাহার জ্যেঠাই-মা, তাহার খুড়ী-মা সকলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। গ্রামের অন্যান্য স্ত্রীলোকও আসিয়া সেই ক্রন্দনে যোগদান করিল। ক্রন্দনের কোলাহলে গ্রাম পরিপূর্ণ হইল। বালক হেরম্ব তৎক্ষণাৎ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল। মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির হয় না, দেখিতে দেখিতে সে দুর্বল হইয়া পড়িল। রোগ নহে যে, ডাক্তার-বৈদ্য আসিয়া চিকিৎসা করিবে। যুধিষ্ঠির ঘোষ মাথায় হাত দিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল।

ভাগ্যে গ্রামে গৌরবিণী নামে এক বৃদ্ধা তিওরনী ছিল। সেকালে যখন ডাইনীর উপদ্রব অতিশয় প্রবল ছিল, তখন গৌরবিণী তাহার দিদিমায়ের নিকট হইতে অনেকগুলি আড়াই অক্ষরের মন্ত্র ও অনেকগুলি ঔষধ শিখিয়া রাখিয়াছিল। তুকের জনরব ও কান্নার রোল শুনিয়া লাঠি ধরিয়া ঠুক্ ঠুক্ করিতে করিতে গুড়ি গুড়ি গৌরবিণী বুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। "ভয় নাই, ভয় নাই, আমি ছেলেকে বাঁচাইব", এই বলিয়া সকলকে সে আশ্বাস প্রদান করিল। তাহার পর হেরম্বর নিকটে বসিয়া সে ঝাড়-ফুক আরম্ভ করিল। মন্ত্র ও ফুৎকারের প্রভাবে বালক উঠিয়া বসিল। গৌরবিণী বলিল যে, রাম-কবচের কর্ম নহে। এ ভূত নহে যে, রাম-কবচকে ভয় করিবে। ইহাকে যাদু বলে। অবশেষে সে ঔষধসম্বলিত একটি নেকড়ার পুঁটুলি অর্থাৎ মাদুলি বালকের

গলায় পরাইয়া দিল। তাহা পরিধান করিয়া বালক সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইল। গ্রামের লোক ভাবিল যে, গৌরবিণী অসাধ্য সাধন করিল, বলিতে গেলে মরা মানুষকে প্রাণদান করিল। সকলে তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। গৌরবিণীর আরও সুখ্যাতি এইজন্য হইল যে, মন্ত্র অথবা ঔষধের মূল্যস্বরূপ কাহারও নিকট হইতে সে একটি কপর্দকও গ্রহণ করে না। তবে কি জান যে যে, গাছের শিকড় ঔষধস্বরূপ ব্যবহৃত হয়, সে গাছকে প্রথম জানান দিতে হয়। পূর্ব রাত্রিতে সে গাছের মূলে পাঁচটা পয়সা, পাঁচ সের ধান, পাঁচ গণ্ডা পান, পাঁচ গণ্ডা সুপারি ও পাঁচ গণ্ডা বিচালি বা খড়ের আঁটি রাখিয়া আসিতে হয়।

গৌরবিণী বলিল,—"এবার আমি অনেক কষ্টে শিকড় পাইয়াছি। কিন্তু আজ রাত্রিতে ঐসকল দ্রব্য সেই গাছের গোড়ায় রাখিতে হইবে। যদি না রাখি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর আমি কখন ঔষধ পাইব না। শিকড় দূরে থাকুক, গাছটি পর্যন্ত অদৃশ্য হইয়া যাইবে।" পুত্রের প্রাণ পাইয়া যুধিষ্ঠির ঘোষ আহ্লাদে আটখানা হইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ গৌরবিণীকে সে ঐসকল দ্রব্য প্রদান করিল। গৌরবিণীর একটি গাই গরু ছিল।

তুক্ ক্ষান্ত হইল না। বুধবার দিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, গ্রামের কোন পথে কতকগুলি ছেঁড়া চুল, কোন পথে সিঁদূর, কোন পথে কানাকড়ি পড়িয়া আছে। দুর্বৃত্ত যাদুকর মঙ্গলবার রাত্রিতে এইরূপ গুণ করিয়াছিল। গ্রামের লোক অতি সাবধানে সে সমুদয় তুক্ পোড়াইয়া ফেলিল। এখানে পা ফেলিয়া, সেখানে পা ফেলিয়া, অতি সন্তর্পণে সকলে পথ চলিতে লাগিল। ফলকথা, এ গ্রামে বাস করা লোকের পক্ষে ভার হইয়া উঠিল। যাঁহারা এ সর্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বড়লোক। ভয়ে কোন কথা কেহ তাঁহাদিগকে বলিতে পারিল না। কি কুক্ষণে যে এ গ্রামে রায়মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী পদার্পণ করিয়াছিলেন, সকলে তাহাই ভাবিতে লাগিল। সকলে আরও বলিল যে, সুবালা দিদি এখানে থাকিলে আমাদের উপর এরূপ অত্যাচার হইত না। নিশ্চয় তিনি আমাদের দুঃখ দূর করিতেন। কত

আর সতর্ক হইয়া লোক পথ চলিতে পারে ? একদিন না একদিন কেহ না কেহ গুণের উপর পা ফেলিয়া বসিবে, অথবা গুণকে ডিঙ্গাইয়া যাইবে। সেই আশঙ্কায় লোক অস্থির হইয়া পড়িল। যাহাদের উপায় ছিল, তাহারা আপন আপন পুত্র-কন্যাদিগকে মাতুলালয়ে অথবা অন্য আত্মীয়স্বজনের নিকট পাঠাইয়া দিল। কিন্তু যাহাদের সে উপায় নাই, তাহারা করে কি ? এই দুঃসময়ে গৌরবিণী তাহাদিগকে রক্ষা করিল। গৌরবিণী বলিল যে, যেমন তুক্‌তাক্ গুণ-জ্ঞান হউক না কেন তাহারা সেই নেকড়ার পুঁটুলি অর্থাৎ মাদুলি গলায় পরিধান করিয়া সে তুক্ মাড়াইলে অথবা ডিঙ্গাইলে কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে না। তাহা শুনিয়া লোকের প্রাণ অনেকটা সুস্থির হইল। প্রাণ আগে না পয়সা আগে! অতি দীন দুঃখীও এক-একটি মাদুলির জন্য পাঁচটি পয়সা, পাঁচ সের ধান্য, পাঁচ গণ্ডা পান, পাঁচ গণ্ডা সুপারি ও পাঁচ গণ্ডা বিচালির আঁটি জানান দিতে লাগিল। পয়সা, ধান প্রভৃতির কথা যাউক, গৌরবিণীর জনমে যাহা হয় নাই, এবার তাহা হইল। তাহার বৃহৎ একটি খড়ের গাদা হইল। বৃদ্ধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু গৌরবিণীর দাঁত পড়িয়া যায় নাই। অনায়াসে সে পান চিবাইতে পারিত। এক্ষণে রাত্রিদিন পান খাইয়া সর্বদাই সে মুখ রাঙা করিয়া রাখিত। একগাল পান চিবাইতে চিবাইতে প্রফুল্লবদনে যখন সে বিনামূল্যে লোকদিগকে ঔষধ বিতরণ করিত, তখন তাহার সেই রক্তবর্ণে রঞ্জিত মুখ দেখিয়া লোকের মন ভক্তিরসে ভিজিয়া যাইত। রাত্রিতে উঠিয়া নিকটস্থ অন্যান্য গ্রামে গৌরবিণী ঔষধ তুলিতে যাইত। সেই সময় হইতে সে গ্রামেও তুক্ আরম্ভ হইত। কাজেই অন্যান্য গ্রামের লোকও আসিয়া গৌরবিণীর নিকট হইতে ঔষধ গ্রহণ করিত। অন্যান্য গ্রামেও এই সুযোগে পুরুষ-চিকিৎসক ও স্ত্রী-চিকিৎসকের আবির্ভাব হইল। গৌরবিণীর ন্যায় তাহারাও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতে লাগিল। কিন্তু ততদূর পসার-প্রতিপত্তি আর কাহারও হইল না।

গ্রামে মাতুঠাকুরানী অর্থাৎ মাতঙ্গিনী নামে এক বিধবা ব্রাহ্মণী বাস করেন। তাঁহার কয়েক বিঘা ভূমি আছে। ভাগে দিয়া তাহা হইতে

যে ধান্য লাভ করেন, তাহাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে তাঁহার দিন কাটিয়া যায়। সেজন্য মৃত্যুকে তিনি বড় ভয় করেন। তামাসা করিয়া কেহ তাঁহাকে 'মর' বলিলে আর রক্ষা থাকে না। গালি দিয়া সে লোকের তিনি প্রাণান্ত করেন। একদিন প্রাতঃকালে তিনি উঠিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার দ্বারে একটি শুষ্ক শুভ্রবর্ণের গরুর মাথা পড়িয়া রহিয়াছে। সর্বনাশ! মাথায় আবার সিন্দুর! গ্রামের লোক দলে দলে আসিয়া তাঁহার দ্বারে দাঁড়াইল। কিন্তু এ যে কিরূপ গুণ, কেহ তাহা ভাল বুঝিতে পারিল না। অবশেষে ধনুকধারী আসিয়া ইহার প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দিল। ধনুকধারী বলিল,—"এই যে তুক্‌টি তোমরা দেখিতেছ, এ ঘোর সর্বনাশের তুক্‌, এ যে-সে তুক্‌ নহে। হাঁ করিয়া গরুর মুখ বাড়ির দিকে রহিয়াছে। এই বাড়িতে গরু ঘাস-জল খাইবে, অর্থাৎ এই বাড়ির লোকের পরমায়ু সে ভক্ষণ করিবে।" এই কথা শুনিয়া মাতুঠাকুরানীর মুখ ভয়ে শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"তাই তো বলি যে, কাল রাত্রি হইতে আমার পেট এত হুটপাট করে কেন! ঐ গো-ভূত আমার পেটের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। শিশু বাছুরের ন্যায় আমার পেটের ভিতর সে ছুটাছুটি করিতেছে। গরুতে যেরূপ ঘাস ছিঁড়িয়া খায়, আমার পেটের নাড়ী-ভুঁড়ি সে সেইরূপ ছিঁড়িয়া খাইতেছে।" বলা বাহুল্য যে, বিধবার ঘোরতর ত্রাস হইল। তাঁহার গালাগালির শব্দে কয়েক দিন গ্রাম কম্পিত ও স্ফাটিত হইতে লাগিল। যাহা হউক, গৌরবিণী তাঁহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিল। কিন্তু তিনটি নেক্‌ড়ার মালা তাঁহাকে গলায় পরিধান করিতে হইল। ধনুকধারী আসিয়া যখন সে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তখন সকলে দেখিল যে, তাহার হাতে ও কাপড়ে সিঁদূর লাগিয়াছে। তাহা দেখিয়া সকলে বুঝিতে পারিল। বড়ালমহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া, আঙ্গুল মটকাইয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া, বিধবা রাত্রিদিন গালি দিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া বড়ালনী একদিন তাঁহার সহিত ঝগড়া করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু মহারথী কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া নকুলের যে দশা হইয়াছিল তাঁহারও তাহাই হইল। রণে ভঙ্গ দিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে পলায়ন

করিতে হইল। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গলায় বড় বড় নেকড়ার পুঁটুলি পরিধান করিল। কিছুদিন গ্রামের লোকের গলদেশ অপূর্ব শোভা ধারণ করিল।

গ্রামে নানারূপ তুক্ হইতে লাগিল। তুকের ভাব ক্রমে অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। গ্রামের লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। একদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, অনেকের দ্বারে তিনটি করিয়া গোবরের পুত্তলিকা পড়িয়া আছে। পুত্তলিকাগুলির কপালে সিঁদূর ছিল, যেন বলিদানের নিমিত্ত উৎসর্গ করা হইয়াছিল! তাহার পর তাহাদের গলদেশ কর্ত্তিত হইয়াছিল। গলা-কাটা পুত্তলি দেখিয়া গ্রামের লোকের প্রাণ উড়িয়া গেল। সকলে ভাবিল যে, তাহাদের প্রাণ-পুত্তলির গলদেশ এইরূপে কর্ত্তিত হইবে এবং তাহাদের পরমায়ু লইয়া রায়-গৃহিণীকে প্রদান করা হইবে।

অমাবস্যা আসিল। দৈবক্রমে সেইদিন শনিবার পড়িল। অতি সাংঘাতিক দিন। গ্রামে গ্রামে সেদিন হুলস্থুল পড়িয়া গেল। জনরব উঠিল যে, সেইদিন বড় বাড়ির লোকেরা নিশাজাগরণ করিবে অর্থাৎ সন্ধ্যার পর কালীর প্রতিমা সদ্য গড়িয়া তাঁহার পূজা হইবে। তাহার পর শিবাবলি প্রদত্ত হইবে। ছাগমাংস, কলামাংস, মহামাংস ভক্ষণ করিয়া, শৃগাল-শৃগালীগণ সম্মুখের দুই পা তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে। অবশেষে একটি ডাব-নারিকেল ছুলিয়া তাহার মুখ টাকার ন্যায় চক্রাকার করিয়া কাটিতে হইবে। টাকার ন্যায় খোলার কিয়দংশ এরূপ ভাবে নারিকেলের সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকিবে,যেন বাক্সর ডালার মত তাহাকে খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারা যায়। রাত্রি দুই প্রহরের সময় রায়-গৃহিণীর যাদুকর সেই নারিকেলটি লইয়া গ্রামবাসীদিগের দ্বারে আসিয়া তিনবার ডাক দিবে,—"শশধর! শশধর! শশধর!" শশধর যদি উত্তর প্রদান করে, তাহা হইলে, তাহার প্রাণ তৎক্ষণাৎ নারিকেলের ভিতর প্রবেশ করিবে ও গুণী ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ নারিকেলের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। সেই নারিকেলের জল রায়-গৃহিণী পান করিলে তিনি রোগ হইতে মুক্ত হইবেন। কিন্তু যে লোক উত্তর দিবে, তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে।

তিন ডাকে শশধর যদি উত্তর প্রদান না করে, তাহা হইলে গুণী ব্যক্তি হলধরের দ্বারে গিয়া ডাক দিবে। হলধর যদি উত্তর না প্রদান করে, তাহা হইলে গদাধরের বাড়ি যাইবে। গুণী ব্যক্তি এইরূপে সমস্ত রাত্রি লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিবে। আতঙ্কে গ্রামবাসীদিগের মন কম্পিত হইল। কি উপায়ে এই বিষম বিপদ হইতে প্রাণরক্ষা করি, তাহা ভাবিয়া সকলের মন আকুল হইল। সে রাত্রি গ্রামের সমস্ত লোক ছেলেপুলে লইয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া বসিয়া কাটাইল। গ্রামের লোক সতর্ক হইয়াছে, কেহই উত্তর দিবে না, এইরূপ ভাবিয়া বোধ হয় বড় বাড়ির লোক নিশাজাগরণ করিতে আগমন করিল না। অতিকষ্টে গ্রামবাসীদিগের প্রাণরক্ষা হইল।

রায়-গৃহিণীর কিন্তু কোন উপকার হইল না। কাশি, উদরাময় ও শোথ ব্যতীত তাঁহার শরীরের নানাস্থানে ক্ষত হইল। বড়ালমহাশয় ভাবিলেন যে, বিছানায় ক্রমাগত শয়ন করিয়া এইরূপ ক্ষত হইয়াছে। কিন্তু সে ক্ষত শুষ্ক হইল না। বড়ালমহাশয় হতাশ হইয়া পড়িলেন।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে তিনি কলিকাতা গমন করিলেন। সে স্থান হইতে ভাল একজন চিকিৎসক আনিলেন। ইনি পাশ-করা ডাক্তার নহেন, ইঁহার বয়স অধিক হয় নাই। কিন্তু বড়ালমহাশয় সকলকে বলিলেন যে, চিকিৎসা সম্বন্ধে ইঁহার অসাধারণ ক্ষমতা।

বাস্তবিক যেদিন হইতে ইনি চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন, সেইদিন হইতে রোগিণী অনেকটা সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। বড়ালমহাশয়, বড়ালমহাশয়ের স্ত্রী, ধনুকধারী ও নূতন চিকিৎসক, এই কয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোককে রোগিণী তাঁহার কাছে আসিতে দিতেন না। তিনি বলিতেন,—"আমি দুর্বল হইয়াছি, কথা কহিতে আমার কষ্ট বোধ হয়। পাঁচজনে আসিলেই দুই-একটা কথা কহিতে হয়, তাহাতে আমার অসুখ বৃদ্ধি হয়। আমার পীড়া হইয়াছে, ঘরে রথ-দোল হয় নাই যে, পুঞ্জ পুঞ্জ লোক দেখিতে আসিবে।"

উপরি-উক্ত কয়জন রোগিণীর সেবা করিতেন। তিনি কেমন আছেন, সে সংবাদ বাহিরের লোক তাঁহাদের নিকট হইতেই পাইত।

দিনের পর দিন ধীরে ধীরে অতিবাহিত হইতে লাগিল। ১৫ই শ্রাবণ আসিল ও গেল, ১৬ই শ্রাবণ গেল। আর গোটা কয়েক দিন। তাহা হইলেই সকলের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়। ১৮ই শ্রাবণ হইতে চিকিৎসক এক প্রকার নূতন ধরনের চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। সেই চিকিৎসায় প্রতিদিন দুই মণ বরফের আবশ্যক। প্রতিদিন কলিকাতা হইতে দুই মণ বরফ আসিতে লাগিল।

এই সময় বড়ালমহাশয় বিজয়বাবুকে পত্র লিখিলেন,—'আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাইচরণ রায় মহাশয় কিরূপ উইল করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনি অবগত আছেন। আগামী ২০শে শ্রাবণ আপনার ভ্রাতৃজায়ার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবে। তাহার পরদিন অর্থাৎ ২১শে শ্রাবণ তিনি উইল করিবেন। পাছে পরে কোন আপত্তি হয়, সেজন্য রায়মহাশয় পূর্ব হইতে আপনাকে সংবাদ দিতে বলিয়া গিয়াছেন। আপনি নিজে অথবা আপনার নিয়োজিত কোন লোক সেই সময় উপস্থিত থাকেন, আপনার ভ্রাতা সেইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেজন্য আপনাকে সংবাদ দিলাম।"

২০শে শ্রাবণ আসিল। রায়-গৃহিণীর বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল। আনন্দের আর সীমা রহিল না। বড়ালমহাশয় ধূমধাম করিয়া গ্রাম্য-দেবতার পূজা দিলেন। গ্রামের ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোকদিগকে সমারোহের সহিত ভোজন করাইলেন। "এ আনন্দের দিন দিদিমণি তুমি আমাকে লইয়া গেলে না।" এই বলিয়া সুবালা খেদ করিয়া রায়গৃহিণীকে পত্র লিখিলেন।

কলিকাতা হইতে বিজয়বাবু নিজে আসিলেন না, আপনার উকিলকে পাঠাইয়া দিলেন। বড়ালমহাশয়কে তিনি লিখিলেন,—ঐ সম্পত্তিতে আমার প্রয়োজন নাই। বড় বধূ-ঠাকুরানী যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে প্রদান করুন। আমি কিছুমাত্র গোল করিব না। কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া আমি আমার উকিলকে প্রেরণ করিলাম।"

বিজয়বাবু যে নিজে আসিবেন না, বড়ালমহাশয় তাহা বুঝিয়াছিলেন।

তিনি আসিবেন জানিলে, বড়ালমহাশয় বোধ হয় তাঁহাকে আহ্বান করিতেন না।

যাহা হউক, ২১শে শ্রাবণ রায়-গৃহিণী উইল করিলেন। বড়ালমহাশয়, ধনুকধারী, নূতন চিকিৎসক, রায়মহাশয়ের উকিল ও বিজয়বাবুর উকিল, এই কয়জন সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন। ধনুকধারী ব্যতীত আর সকলে উইলে সাক্ষী হইলেন।

নূতন চিকিৎসার গুণে রোগিণী কয়েকদিনে বিশেষ রূপ ফললাভ করিয়াছিলেন। ক্ষয়কাশ ও উদরাময় রোগে এতদিন যে তিনি ভুগিতেছিলেন, মুখশ্রী দেখিয়া তাহা বোধ হইল না। তবে অনেক দিন রোগে ভুগিলে যাহা হয়,—তিনি খিটখিটে ও রাগী হইয়াছিলেন। উইল করিবার সময় চিকিৎসকের আজ্ঞায় ধনুকধারী তাঁহাকে ঔষধ দিতে গেল। ঔষধে কি একটু পড়িয়াছিল। তাহা দেখিয়া ক্রোধে তিনি কাঁচের গেলাস ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। গেলাসটি মেজেতে ঝনাৎ শব্দে পড়িয়া শতখণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল। কার্য সমাপ্ত হইলে উকিল দুইজন একবাক্যে বলিলেন, "আপনাকে যে এরূপ সুস্থ অবস্থায় দেখিব, সে প্রত্যাশা আমরা করি নাই। আপনি যে কঠিন রোগে কষ্ট পাইতেছেন, আপনার মুখশ্রী দেখিয়া তাহা বোধ হয় না। ভরসা করি, শীঘ্রই আপনি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করিবেন।"

এই বলিয়া সকলে প্রস্থান করিলেন। রায়-গৃহিণী যে উইল করিলেন, তাহার মর্ম এইরূপ,—

প্রথম। স্থাবর-অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তির সুবালা অধিকারিণী হইবেন।

দ্বিতীয়। অনেকদিন বিশ্বাসের সহিত কাজকর্ম করিয়াছেন, সেজন্য পুরস্কারস্বরূপ বড়ালমহাশয় এক হাজার টাকা পাইবেন।

তৃতীয়। যতদিন বড়ালমহাশয় জীবিত থাকিবেন, ততদিন তিনি পঞ্চাশ টাকা হিসাবে মাসিক বেতন পাইবেন।

চতুর্থ। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী ভরণপোষণের নিমিত্ত ত্রিশ টাকা হিসাবে মাসিক বৃত্তি পাইবেন।

পঞ্চম। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার কর্মে ধনুকধারী নিযুক্ত হইবে। আপাতত সহকারী কর্মচারিস্বরূপ ধনুকধারী কুড়ি টাকা বেতন পাইবে।

নূতন চিকিৎসার গুণে রায়-গৃহিণী আরোগ্য লাভ করিবেন, সকলে এইরূপ আশা করিয়াছিল। কিন্তু সে আশা সফল হইল না। উইল করিবার তুইদিন পরে অর্থাৎ ২৩শে শ্রাবণ সহসা তাঁহার মৃত্যু হইল। সকলে বলিল যে, "সুবালার কি সৌভাগ্য। কেবলমাত্র তুইদিন পূর্বে যদি রায়-গৃহিণীর মৃত্যু হইত, তাহা হইলে সুবালা এ সম্পত্তি পাইতেন না। সুবালাকে বিষয় দিবার নিমিত্তই যেন তিনি জীবিতা ছিলেন।"

এই তুর্ঘটনার চারিদিন পরে বড়ালমহাশয় সুবালাকে আনাইলেন। সুবালার কাকা ও বিধবা পিসী সঙ্গে আসিলেন। কাকা কলিকাতায় কর্ম করেন। তিনি নিয়ত সুবালার কাছে থাকিতে পারিলেন না। সুবালার খুড়ীমাতা ছোট ছোট পুত্র-কন্যা লইয়া ব্যস্ত। তিনি আসিতে পারিলেন না। সুবালাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত পিসীমা তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। বড়ালমহাশয় সমুদয় কাজকর্ম করিতেন। কাকামহাশয় মাঝে মাঝে আসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন।

দিদিমণির জন্য সুবালা অনেক কাঁদিলেন। দিদিমণির মৃত্যুকালে তাঁহাকে আনয়ন করা হয় নাই, সেজন্য বড়ালমহাশয়কে তিনি অনেক ভৎর্সনা করিলেন। "দিদিমণির শেষ অবস্থায় তোমরা আমাকে তাঁহার সেবা করিতে দিলে না",—এই কথা বলিয়া সুবালা খেদ করিতে লাগিলেন।

রায়-গৃহিণীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। বিজয়বাবুকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু তিনি আসিলেন না অথবা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত কাহাকেও প্রেরণ করিলেন না। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রায়মহাশয়ের মৃত্যু হইলে কলিকাতায় তিনি স্বতন্ত্রভাবে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। বড় বধূ-ঠাকুরানীরও তিনি স্বতন্ত্রভাবে শ্রাদ্ধ করিলেন।

তাহার পর ধীরে ধীরে দিন কাটিতে লাগিল। সুবালা সমুদয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। বিধবা পিসীমায়ের সহিত তিনি বাস

করিতে লাগিলেন। কাকামহাশয় মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতেন শুনিতেন।

রায়মহাশয় ও রায়-গৃহিণীর পরলোকগমনে গ্রামের লোকের আনন্দ হইল। তাহারা ভাবিল যে, ভূতে অথবা মানুষে আর আমাদিগকে উৎপীড়িত করিবে না। সুবালা লক্ষ্মীস্বরূপা দেবী। তিনি আমাদের সকল দুঃখ দূর করিবেন। রায়বাড়ির লোকদিগের সহিত গ্রামবাসী-দিগের এখন বিলক্ষণ সদ্ভাব হইল। কিন্তু ধনুকধারীর উপর এখনও তাহাদের সম্পূর্ণ রাগ রহিল।

ষোড়শ অধ্যায়

সুবালা

পূর্ব হইতেই সুবালার গুণে গ্রামের লোক মুগ্ধ হইয়াছিল। শৈশবকাল হইতে তিনি এই গ্রামে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সকলে তাঁহাকে জানিত, তিনিও সকলকে জানিতেন। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তাঁহার একটা না একটা সুবাদ-সম্পর্ক ছিল। কাহাকেও দাদা, কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসী বলিয়া তিনি ডাকিতেন। গ্রামের লোকও তাঁহাকে সেইরূপ সম্পর্ক ধরিয়া ডাকিত। যথাসাধ্য তিনি লোকের দুঃখ দূর করিতেন। যাহার দুঃখ দূর করিতে পারিতেন না, সুমিষ্ট কথায় তাহাকে প্রবোধ দিতেন। তাঁহার দয়ামায়া সম্বন্ধে শত শত গল্প এই গ্রামে প্রচলিত আছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দুইটি ঘটনার বিষয় এ স্থানে কেবল উল্লিখিত হইল। এ সমুদয় ঘটনা রায়-গৃহিণী জীবিত থাকিতেই ঘটিয়াছিল। সকলে তাঁহার আত্মীয়, সকলে তাঁহাকে স্নেহ করে, সেজন্য সুবালা একেলা নির্ভয়ে এ-বাড়ি সে-বাড়ি করিয়া বেড়াইতেন। একদিন অপরাহ্নে তিনি গ্রামে গিয়াছিলেন। পথের পার্শ্বে সুগ্রীব চঙ্গের ঘর ছিল। সুগ্রীব গরিব মানুষ, মজুরি করিয়া সে দিনপাত করে। তাহার কেবল একখানি

চালাঘর। সুবালা দেখিলেন যে, সেই ঘরের দাওয়া অর্থাৎ পিঁড়ার একপার্শ্বে সুগ্রীবের স্ত্রী মায়া, ভাত রাঁধিতেছে। কিছুদূরে তাহার তিন কি চারি বৎসরের বালক থামি হাতে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে। সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মায়া! তোমার ছেলে কাঁদিতেছে কেন?" মায়া কোন উত্তর করিল না। সুবালা নিকটে আসিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভুলু কাঁদিতেছে কেন মায়া?" তবুও মায়া কোন উত্তর করিল না। সে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে আঁচল দিয়া সে চক্ষু মুছিতে লাগিল। সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন মায়া! কি হইয়াছে? তুমি কাঁদিতেছ কেন?" মায়া তবুও কোন উত্তর করিল না, কেবল কাঁদিতে লাগিল। মায়ার নিকট কোন উত্তর না পাইয়া সুবালা অবশেষে বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভুলু! তুমি কাঁদিতেছিলে কেন? তোমার মা কাঁদিতেছে কেন?" ভুলু বলিল—"মা আমাকে মারিয়াছে।" তাহার মা কেন কাঁদিতেছে, ভুলু তাহা জানে না, সে প্রশ্নের ভুলু কোন উত্তর দিল না। পীড়িত ও শয্যাশায়ী হইয়া সুগ্রীব ঘরের ভিতর পড়িয়াছিল। সুবালা তাহা জানিতেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সে কাজ করিতে গিয়াছিল। বসিয়া বসিয়া অতি কষ্টে সে দ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল,—"কাল ইহাদের কিছু হয় নাই, আজ এ পর্যন্ত কিছু হয় নাই। সেইজন্য ভুলু কাঁদিতেছে। যাও, দিদি তুমি বাড়ি যাও, তোমার এসব কথা শুনিয়া কাজ নাই।" সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিছু হয় নাই, তাহার মানে কি? তুমি আমাকে সব কথা বল, না বলিলে আমি বাড়ি যাইব না।" সুগ্রীব উত্তর করিল,—"আমি মজুরি করিয়া দিনপাত করি। রোজ আনি, রোজ খাই। আজ একমাস আমি বিছানায় পড়িয়া আছি। ঘরে ঘটি-বাটি যাহা কিছু ছিল, তাহা বেচিয়া এতদিন কোনরূপে চলিতেছিল। কিন্তু কাল আর কিছু ছিল না, সেজন্য কাল আমাদের রান্না হয় নাই।"

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কাল তোমরা কি খাইয়াছিলে?"

সুগ্রীব উত্তর করিল,—"আমি পীড়িত। আমার আহারের বড় প্রয়োজন নাই। মায়া কাল কিছু খায় নাই। দুইটি কলমী শাক তুলিয়া ভুলুকে সে সিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল।"

মায়া এখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দিদি! আমরা সকল সহ্য করিতে পারি; কিন্তু ভুলু কাল যখন 'আমাকে ভাত দাও, আমাকে ভাত দাও' বলিয়া ক্ষুধায় চীৎকার করিতে লাগিল, তখন আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তখন আমি ভাবিলাম যে, এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। ছেলেটিকে বুকে লইয়া জলে গিয়া ঝাঁপ দিই।"

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর আজ কি হইল?"

সুগ্রীব উত্তর করিল,—"বেচিয়া দুই পয়সা হয়, ঘরে এমন আর কোন দ্রব্য ছিল না। পিতল-কাঁসার সামান্য যাহা কিছু ছিল, তাহা সব ফুরাইয়া গিয়াছিল। আজ দুই প্রহরের সময় ছেলে যখন ক্ষুধায় বড় চীৎকার করিতে লাগিল, তখন আমার হঠাৎ মনে পড়িল যে, ঘরের দ্বারে এখনও কপাট-জোড়াটি আছে। কপাট-জোড়াটি করিতে আমার দুই টাকা খরচ হইয়াছিল, কিন্তু দুর্লভ বড়াই তাহার জন্য কেবল আমাকে চারি আনা পয়সা দিল। মায়া গিয়া চৌদ্দ পয়সার চাউল, এক পয়সার লবণ ও এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া আনিল। আমাকে ও ভুলুকে সে মুড়ি কয়টি ভাগ করিয়া দিল। ভুলু মুড়ি কয়টি খাইয়া আরও চাহিল। আমার ভাগ তখন আমি খাইয়া ফেলিয়াছিলাম, সেজন্য তাহাকে দিতে পারিলাম না। ভুলু কাঁদিতে লাগিল। মায়া তাহাকে দুইটি ভিজা চাউল দিল। কাল সমস্ত দিন, তাহার পর আজ এতক্ষণ পর্যন্ত উপবাস করিয়া আছে। সে বালক! সে কি জানে! ভিজা চাউল কয়টি খাইয়া, সে আরও চাহিল। না পাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সেজন্য মনের দুঃখে মায়া তাহাকে একটি চাপড় মারিয়াছিল।"

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ চারি আনা পয়সায় তোমাদের কয়দিন চলিবে?"

সুগ্রীব উত্তর করিল,—"আজ আর কাল অতি কষ্টে চলিবে। চৌদ্দ

পয়সার চাউল আমরা কিনিয়াছি। কেবল লবণ দিয়া ইহারা ভাত খাইবে।”

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তাহার পর কি হইবে?”

সুগ্রীব উত্তর করিল,—“ভগবান যাহা করিবেন, তাহাই হইবে।”

সুবালা আর কোন কথা বলিলেন না। নিজের হাতের একগাছি বালা খুলিয়া সুগ্রীবকে দিলেন। কিন্তু সে কিছুতেই লইতে চাহিল না। সে বলিল,—“তুমি ছেলেমানুষ। বাপ রে! তোমার বালা কি আমরা লইতে পারি। তাহা কখনই হইবে না।” সুবালা তাহার কথা শুনিলেন না। বালা ফেলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কিন্তু বাড়ি গিয়া সুবালার বড় ভয় হইল। রায়-গৃহিণী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিবেন, সেই ভয়ে তাঁহার সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন না।

সন্ধ্যার পর রায়-গৃহিণী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে সুবালা তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছু না বলিয়া তিনি রায়-গৃহিণীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন।

অনেক আদর করিয়া সুবালা বলিলেন,—“দিদিমণি! আজ আমি এক কাজ করিয়াছি। তাহার জন্য তুমি বোধ হয় আমাকে অতিশয় বকিবে। কিন্তু আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। বল যে, তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তবে তোমার আমি গলা ছাড়িয়া দিব। তাহা না বলিলে তোমার গলা আমি ছাড়িয়া দিব না।”

রায়-গৃহিণী ভাল মানুষ ছিলেন না। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষ যতই দোষী হউক না কেন, তাহার একদিকে না একদিকে একটু গুণ থাকে। রায়-গৃহিণী সুবালাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন। হাসিতে হাসিতে তিনি উত্তর করিলেন,–“তুমি যে মন্দ কাজ করিয়াছ, এ কথা কখনই আমার বিশ্বাস হয় না। যে জনমে একটিও কটুবাক্য বলে নাই, জনমে যে কাহারও মনে কষ্ট প্রদান করে নাই, তাহাকে আবার আমি ক্ষমা করিব কি? কি হইয়াছে দিদি! বল, নিশ্চয় আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম।”

আদ্যোপান্ত সমুদয় ঘটনা সুবালা রায়-গৃহিণীর নিকট বর্ণনা

করিলেন। মূল্যবান সোনার বালা তিনি দিয়া আসিয়াছেন, সেই কথা শুনিয়া অঙ্গীকার সত্ত্বেও রায়-গৃহিণী গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

এমন সময় একজন দাসী আসিয়া রায়-গৃহিণীকে বলিল,—"সুবালা দিদি কোথায় বালা ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। সুগ্রীবের স্ত্রী মায়া তাহা দিতে আসিয়াছে।"

"তুমি তবে বালা ফিরিয়া লইবে!"—এই কথা বলিয়া সুবালা কাঁদিতে লাগিলেন। সুবালার চক্ষুর জল দেখিয়া রায়-গৃহিণী আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,—"না দিদি! আমি বালা ফিরিয়া লইব না। আর যদি লই, তাহা হইলে মূল্য দিয়া লইব। সুগ্রীব বালা লইয়া কি করিবে? তাহাকে তো বেচিতে হইবে। আমি তাহার নিকট কিনিয়া লইব।"

এই কথা বলিয়া তিনি বড়ালমহাশয়কে ডাকিতে পাঠাইলেন। বড়ালমহাশয় আসিলে রায়-গৃহিণী তাঁহাকে বলিলেন,—"সুগ্রীব চঙ্গ পীড়িত হইয়াছে। তাহাদের বড় কষ্ট হইয়াছে। আপনার হাতের বালা খুলিয়া সুবালা তাহাকে দিয়াছিল। মায়া এখন সেই বালা ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছে। মূল্য দিয়া তাহার নিকট হইতে বালা আপনি ফিরাইয়া লউন।"

এই কথা বলিয়া রায়-গৃহিণী বড়ালমহাশয়কে চক্ষু টিপিয়া ইসারা করিলেন। তাহার অর্থ এই যে, যৎসামান্য কিছু দিয়া তাহাকে বিদায় করুন, বালার সম্পূর্ণ মূল্য তাহাকে দিবেন না।

সুবালা তবুও রায়-গৃহিণীর গলা ছাড়িয়া দিলেন না। আরও অধিক স্নেহের সহিত তাঁহাকে আদর করিতে লাগিলেন। "আমার লক্ষ্মী দিদিমণি!" এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার বক্ষঃস্থলে আপনার মস্তক রাখিলেন।

রায়-গৃহিণী বলিলেন,—"আবার কি? যাহা বলিলাম তাহা তো শুনিলে। এখন আমার গলা ছাড়িয়া দাও।"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"না দিদিমণি! আমার একটি নিবেদন

আছে। সে কথাটিও তুমি বড়ালমহাশয়কে বলিয়া দাও, তবে তোমার গলা ছাড়িয়া দিব।"

রায়-গৃহিণী বলিলেন,—"দেখ সুবালা! এই সমুদয় বিষয় তোমার। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই হইবে। পৃথিবীতে আমার কোন সুখ নাই। তুমিই আমার একমাত্র সুখ। আর কি চাই, বল?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"দেখ দিদিমণি! সুগ্রীবের শিশুপুত্রের কথা তোমাকে এইমাত্র বলিলাম। দুইদিন সে উপবাসী ছিল। ক্ষুধায় সে চীৎকার করিতেছিল। সেই সময় আমি পথ দিয়া যাইতেছিলাম। তাহাদের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আহা! যাহারা অতি শিশু, পৃথিবীর কথা তাহারা কি জানে? ক্ষুধা পাইলেই পিতামাতার নিকট শিশু ক্রন্দন করে। মনে করে, মা আমাকে আজ খাইতে দিতেছে না কেন? এইরূপ শিশু গ্রামে উপবাস করিয়া থাকিবে, আর আমি পাঁচ ব্যঞ্জন দিয়া ভাত খাইব, তাহা হইবে না। দিদিমণি! সে ভাত আমার পক্ষে বিষতুল্য হইবে। জোড়হাতে তোমার নিকট আমি প্রার্থনা করি, দিদিমণি! বড়ালমহাশয়কে তুমি আজ্ঞা কর, আজ হইতে এই গ্রামে কেহ যেন উপবাসী না থাকে।"

এই কথা বলিতে বলিতে সুবালা রায়-গৃহিণীর গলা ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার সম্মুখে তিনি জোড়হাত করিয়া রহিলেন। দরদর ধারায় তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। জলে পূর্ণ হইয়া তাঁহার সেই মৃদু নয়ন দুইটি উজ্জ্বল হইল। আহা! স্বর্গের শোভা তখন সেই চক্ষু দুইটিতে আবির্ভূত হইল। রায়-গৃহিণীর মন যতই নিষ্ঠুর হউক না কেন, সে অলৌকিক ভাব দেখিয়া তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইল। বড়ালমহাশয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিলেন,—"বড়ালমহাশয়! সুবালা যাহা বলিতেছে, তাহা আপনি করিবেন। আপনি দেখিবেন, যেন আজ হইতে এ গ্রামে কেহ উপবাসী না থাকে।"

কিন্তু নিজের স্বভাব তিনি একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি পুনরায় বড়ালমহাশয়ের প্রতি চক্ষু টিপিয়া ইসারা করিলেন।

তাহার অর্থ এই যে, "সুবালাকে এখন ভুলাইবার নিমিত্ত আমি এইরূপ আজ্ঞা করিতেছি, কাজে আপনি কিছু করিবেন না।"

কিন্তু সুবালা ছাড়িবার পাত্রী ছিলেন না। রায়-গৃহিণী যতই ইঙ্গিত করুন না কেন, তাঁহার সে ইঙ্গিত বিফল হইল। সুবালা তাঁহার সে আজ্ঞা কার্যে পরিণত করিলেন। বড়ালমহাশয় মন্দ লোক ছিলেন না। তিনি সুবালার পক্ষে হইলেন।

বালার সম্পূর্ণ মূল্য সুগ্রীবকে প্রদান করা হইয়াছিল কি না, সুবালা তাহা জানেন না। কিন্তু সেইদিন হইতে তাহার দুঃখ দূর হইল। সেইদিন হইতে তাহারা উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পাইল। সুগ্রীবের চিকিৎসাও হইল। অল্পদিন পরে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া পুনরায় সে কাজকর্ম করিতে সমর্থ হইল।

গ্রামে পাছে কেহ উপবাসী থাকে, সে সম্বন্ধে সুবালা সর্বদা খরতর দৃষ্টি রাখিতেন। গত কয়েক বৎসর যথাসময়ে ভালরূপ বৃষ্টি হয় নাই। সেজন্য ধানও ভালরূপ জন্মে নাই। তাহার পর নদীর বানে বালি পড়িয়া অনেকের ভূমি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। গ্রামের লোকের সেজন্য বড় কষ্ট হইয়াছিল। সুবালা যথাসাধ্য সকলের কষ্ট দূর করিতে লাগিলেন। অন্ততঃ অন্ন বিনা কাহাকেও উপবাসী থাকিতে হইল না। গ্রামের লোক ক্রমে জানিতে পারিল যে, সুবালাকে একবার বলিলেই তাহাদের দুঃখ দূর হইবে, কেহ তাহাদিগের উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে পারিবে না। দুই হাত তুলিয়া সুবালাকে সকলে আশীর্বাদ করিতে লাগিল। বড়ালমহাশয় এই কার্যে সুবালার বিশেষরূপে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তিনি সকল কথা রায়-গৃহিণীকে জানিতে দিতেন না। অধিক খরচ হইতেছে দেখিয়া রায়-গৃহিণী যদি বকিতেন, তাহা হইলে সুবালা আহার পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিতে বসিতেন। ।জই রায়-গৃহিণীকে চুপ করিয়া থাকিতে হইত।

সুবালা সম্বন্ধে আর একটি গল্প এই,—নফর ডোম নামক একজন গ্রামবাসী বাগানে কাঁচা তাল কাটিতে আসিয়াছিল। তালশাঁস ছাড়াইবে, সেজন্য তাহার স্ত্রী সঙ্গে আসিয়াছিল। দুই বৎসরের

শিশুকন্যা তাহার সহিত ছিল। সুবালা সেই কন্যার হাতে দুইটি সন্দেশ দিয়াছিলেন। সন্দেশ সে কখনও খায় নাই। সেরূপ উপাদেয় মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাহার মা বলিল,—"ইনি তোমার মাসী, সুবালা মাসী। ইহার পায়ে গড় কর।" শিশু বলিল,—"থুবালা মাথী।" সুবালা বলিলেন—"আহা! কেমন আধ-আধ স্বরে এ আমাকে থুবালা মাথী বলিল। তোমার কন্যার নাম কি?" তাহার মাতা বলিল,—"ইহার এখনও নাম হয় নাই, ইহাকে আমরা খুকী বলিয়া ডাকি।" কিছুদিন পরে সেই কন্যার জ্বরবিকার হইল। তাহার বাঁচিবার আশা কিছুমাত্র ছিল না। একদিন রাত্রিতে বিকারের ঘোরে সে বায়না লইল যে,—"আমি থুবালা মাথীর কাছে যাইব।" তাহার পিতা-মাতা তাহাকে বিধিমতে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। শিশু কিন্তু কিছুতেই শান্ত হইল না। সে ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিল,—"আমি থুবালা মাথীর কাছে যাব।" পরদিন প্রাতঃকালেও সেই কথা বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। রায়বাড়ির কেহ সেই কথা শুনিয়াছিল। চাকর-চাকরানীদের মধ্যে সেই বিষয় লইয়া হাস্য-পরিহাস হইতেছিল। তাহারা বলিতেছিল,—"নীচ লোকের একবার আস্পর্ধা দেখ! সুবালা দিদি নফর ডোমের কন্যাকে সন্দেশ দিয়াছিলেন। সে এখন পীড়িত হইয়াছে। সকলে বলিতেছে যে, সে বাঁচিবে না। কিন্তু সেই সন্দেশের লোভে কাল হইতে সে আবদার ধরিয়াছে যে, আমি সুবালা মাসীর কাছে যাব। নীচ লোকের একবার আস্পর্ধা দেখ!"

সুবালার কানে সেই কথা উঠিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ খানকয়েক বিস্কুট, গোটাকতক ঘড়ার খেজুর, একটু মিশ্রি ও একটি কমলালেবু লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। বরাবর নফর ডোমের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে গিয়া দেখিলেন যে, একটি অতি কদাকার ময়লা বালিশ মাথায় দিয়া একখানি চেটাইয়ের উপর শিশু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া আছে। তাহার মাতা নিকটে বসিয়া কাঁদিতেছে, তাহার মুখ হইতে মাছি তাড়াইতেছে, আর পিপাসায়

যখন সে হাঁ করিতেছে, তখন তাহার মুখে একটু জল দিতেছে। সুবালাকে দেখিয়া ডোমনী চমকিত হইয়া দাঁড়াইল। সে বলিল,—"তুমি দিদি, আমাদের এই কুঁড়েঘরে!"

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কন্যা এখন কেমন আছে, তাহা বল।"

ডোমনী উত্তর করিল,—"কাল সমস্ত রাত্রি খুকী ছট্‌ফট্‌ করিয়াছে ও মাথা চালিয়াছে। সেই সঙ্গে সে বায়না লইল যে, আমি সুবালা মাসীর কাছে যাইব। তোমাকে একবার মাত্র সে দেখিয়াছিল, তথাপি তোমার কথা তাহার মনে ছিল। তোমার ঐ চাঁদমুখখানি, দিদি, একবার যে দেখিয়াছে, তোমার মধুর কথা যে একবার শুনিয়াছে, সে কি আর কখন তাহা ভুলিতে পারে? আহা! বাছা আমার কি জানে যে, তুমি কে আর আমরা কি! তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত সে ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিল। কিছুতেই তাহাকে আমরা ভুলাইতে পারিলাম না। আজ প্রাতঃকালেও সেই কথা বলিয়া সে কাঁদিতেছিল। এখন চুপ করিয়াছে। বোধ হয়, আর বিলম্ব নাই!"

ডোমনীর চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।

সুবালা শিশুকে ডাকিতে লাগিলেন,—"খুকী! খুকী! খুকী!"

সে চক্ষু চাহিল না, অথবা কোন উত্তর করিল না। পুনরায় সুবালা ডাকিতে লাগিলেন,—"খুকী! খুকী! চাহিয়া দেখ, তোমার জন্য কেমন খাবার আনিয়াছি।"

এই বলিয়া কমলালেবুটি তাহার হাতে দিলেন। লেবুটি সে মুঠা করিয়া ধরিল। পুনরায় সুবালা তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন। বার বার ডাকের পর সে চক্ষু উন্মীলিত করিল। কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে সুবালার মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল। অবশেষে সে ব্যস্ত হইয়া হাত-পা নাড়িতে লাগিল। উশখুশ করিয়া,—"আমি উঠিয়া বসিব," —যেন এইরূপ ইচ্ছা সে প্রকাশ করিল। তাহার মা তাহাকে তুলিয়া বসাইল। তাহার পর দুই হাত সুবালার দিকে শিশু প্রসারিত করিয়া দিল।

তাহার মাতা বলিল,—"না, মা! তোমার সুবালা মাসী তোমাকে কোলে লইবেন না। তোমার জন্য তিনি কি সব আনিয়াছেন, দেখ। না, মা! তুমি তাঁহার কোলে যাইতে চাহিও না।"

এই বলিয়া ডোমনী বিস্কুট ও খেজুর তাহাকে দেখাইল। কিন্তু সেদিকে সে দৃক্‌পাত করিল না। সুবালার কোলে যাইবে, সেইজন্য হাত দুইটি প্রসারিত করিয়া একান্তমনে একদৃষ্টিতে সে সুবালার দিকে চাহিয়া রহিল।

শিশুর সেই উৎফুল্ল নয়ন দুইটি দেখিয়া সুবালা আর থাকিতে পারিলেন না। ডোমের কন্যাকে তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন।

"কি কর, দিদি! কি কর, দিদি!" ব্যস্ত হইয়া ডোমনী সুবালাকে নিষেধ করিতে উদ্যত হইল। সুবালা তাহার নিষেধ শুনিলেন না।

"ছি, ছি, আমরা ডোম। আমার কন্যাকে তুমি কোলে লইলে। কি করিলে, দিদি! আমাদের কি ছুঁইতে আছে? ও মা! রায়গৃহিণী এ কথা শুনিলে আমাকে কি বলিবেন? গ্রামের লোক আমাকে কি বলিবে? আর নয়, দিদি! খুকী এখন চুপ করিয়াছে। চেটাইয়ের উপর পুনরায় উহাকে শয়ন করাইয়া দাও। ও মা আমি কি করি!"

খুকী বাস্তবিক চুপ করিয়াছিল। অতি সন্তোষের সহিত দুই হাতে সুবালার গলা সে জড়াইয়া ধরিল। লেবুটির সহিত একহাত তাহার মুষ্টিবদ্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর সুবালার স্কন্ধে সে আপনার মস্তকটি রাখিল। মনের সুখে সে চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিল। তাহার মুখশ্রী শান্তিভাবে পূর্ণ হইল। সেই মুহূর্তে যেন তাহার সকল দুঃখ, সকল রোগ তিরোহিত হইল।

"ও মা, আমি কি করি!" এই কথা বলিয়া ডোমনী আপনার কপালে করাঘাত করিতে লাগিল। সুবালা তাহাকে প্রবোধ দিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—"চুপ, চুপ! খুকী নিদ্রা যাইবে। ঘুমাইলে তাহার জ্বর ছাড়িয়া যাইবে। চুপ, চুপ!"

নিরুপায় হইয়া ডোমনী চুপ করিল। ঘোরতর আশ্চর্যান্বিতা ও

ভীতা হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে সুবালার দিকে চাহিয়া, ঘরের দেয়াল ঠেস দিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

শিশুকে আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া সুবালা এদিকে-ওদিকে বেড়াইতে লাগিলেন। যথার্থই শিশু অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। জ্বর-মগ্ন হইবার উপক্রম হইল।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল সুবালা তাহাকে লইয়া বেড়াইলেন। যখন নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন অতি ধীরে ধীরে তিনি তাহাকে তাহার মায়ের কোলে সমর্পণ করিলেন। বৈকালবেলা পুনরায় আসিয়া দেখিব,"—এই কথা বলিয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

বাটী গিয়া বড়ালমহাশয়কে বলিয়া, কন্যাটির জন্য তিনি ভাল চিকিৎসক আনাইলেন। কিন্তু সুবালাকে দেখিয়া, সুবালার মধুর কথা শুনিয়া, সুবালাকে স্পর্শ করিয়া, সে রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিল। চিকিৎসা বড় আর আবশ্যক হইল না।

সেই অবধি গ্রামের লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, সুবালা লক্ষ্মী-স্বরূপা দেবী। তিনি একবার স্পর্শ করিলে রোগ দূরে পলায়ন করে। রোগ দ্বারা কেহ আক্রান্ত হইলে, আগ্রহসহকারে তাহার বাড়ির লোক সুবালাকে ডাকিয়া আনিত! অধিক বয়স্ক ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণী হইলে "সুবালা তাহার মস্তক একবার স্পর্শ করুন," এই বলিয়া তাহারা প্রার্থনা করিত। অপর জাতি হইলে সুবালার পদধূলি অতি ভক্তিভাবে মস্তকে গ্রহণ করিত।

সুবালা সম্বন্ধে এইরূপ অনেক গল্প গ্রামে প্রচলিত আছে। এ সমুদয় ঘটনা রায়-গৃহিণী জীবিতা থাকিতেই ঘটিয়াছিল।

"আমাদের সুবালা দিদি এখন গ্রামের অধীশ্বরী হইলেন। এ গ্রামে ভূত-প্রেত আর আসিতে সাহস করিবে না, তুক্‌তাক্ করিয়া আর আমাদের কেহ প্রাণ বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে না। অনাহারে অথবা বিনা চিকিৎসায় আর আমাদের মরিতে হইবে না। আমাদের সকল দুঃখ এইবার দূর হইবে!" এইরূপ ভাবিয়া গ্রামের লোকের

আনন্দের আর সীমা রহিল না।

বিধাতাও গ্রামের লোকের প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। কয়েক বৎসর যথাসময়ে সুবৃষ্টির অভাবে ভালরূপ ধান্য উৎপন্ন হয় নাই। এ বৎসর সুবৃষ্টি হইল। লোকের গোলায় ধান রাখিবার জন্য এ বৎসর স্থান হইবে না, এইরূপ সম্ভাবনা হইল। যে সমুদয় ভূমি বালি পড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এ বৎসর বন্যায় সেই বালি হয় ধুইয়া গেল অথবা তাহার উপর গভীরভাবে পলি পড়িল। সে সমুদয় ভূমি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উর্বরা হইল। সেজন্যও গ্রামের লোকের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না।

যেরূপ মানুষের প্রতি, জীবজন্তুর প্রতিও সুবালার সেইরূপ দয়ামায়া ছিল। পশুপক্ষীগণও তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

ধনুকধারীর বাসনা

ভাদ্র মাসের শেষ। নদীতে বান আসিয়াছে। গ্রাম যথারীতি জলপ্লাবিত হইয়াছে। একদিন বৈকাল বেলা সুবালা একেলা বাগানে গিয়াছিলেন। তিনি যে ফুলগাছগুলি পুঁতিয়া ছিলেন, তাহাদের শুষ্ক-পত্র ও শাখা-প্রশাখা ভাঙ্গিয়া দিতেছিলেন। এমন সময়ে সেই স্থানে ধনুকধারী গিয়া উপস্থিত হইল। সুবালা এক্ষণে প্রভুনী, ধনুকধারী তাঁহার বেতনভোগী ভৃত্য। কিন্তু বাল্যকালের কথা এখনও ধনুকধারী ভুলিতে পারে নাই। সুবালার সহিত "আপনি" বলিয়া কথা কহিতে কখনও তাহার অভ্যাস হয় নাই। তবে সুবালার নাম ধরিয়া ডাকিতে সে সাহস করিত না। আবশ্যক হইলে 'ও গো', 'হাঁ গো' বলিয়া কোনরূপে কাজ সারিত।

নিকটে গিয়া ধনুকধারী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ঘাড় হেঁট করিয়া পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

সুবালা বলিলেন,—"কিরূপ একটা গন্ধ বাহির হইল! ধনুকধারী! কি মনে করিয়া?"

ধনুকধারী উত্তর করিল—"একটি কথা বলিব।"

সুবালা বলিলেন,—"কি বলিবে, বল।"

ধনুকধারী বলিল,—"বাল্যকালে আমরা একসঙ্গে অনেক খেলা করিয়াছি। কত ফুল, কত ফল তোমাকে পাড়িয়া দিয়াছি। যখন চপলা ছিল, তখন কত আহ্লাদে-আমোদে আমরা কাল ক্ষেপণ করিয়াছি।"

সুবালা বলিলেন,—"এই কথা তুমি বলিতে আসিয়াছ?"

ধনুকধারী বলিল,—"যখন যাহা বলিয়াছ, তখন তাহা করিয়াছি। কুকুরের ন্যায় তোমার আজ্ঞা পালন করিয়াছি।"

সুবালা বলিলেন,—"এ আর নূতন কথা কি ? তুমি বড়ালমহাশয়ের আত্মীয়—সেজন্যও বটে, আর ছেলেবেলায় তুমি আমার সঙ্গী ছিলে—সেজন্যও বটে, দিদিমণি তোমার উপকার করিয়াছেন। কুড়ি টাকা বেতনে তোমাকে তিনি কর্ম দিয়াছেন। পরে তোমার আরও ভাল হইবে, সে ব্যবস্থাও তিনি করিয়া গিয়াছেন।"

ধনুকধারী বলিল,—"আমি চাকরী চাই না।"

সুবালা বলিলেন,—"চাকরী চাও না! তবে কি চাও, তা বল। কাকামহাশয় আসিলে তাঁহাকে আমি বলিব। যদি অসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে অবশ্য তিনি তোমার বাসনা পূর্ণ করিবেন।"

ধনুকধারী বলিল,—"পাছে তুমি রাগ কর, সেই ভয়ে সে কথা বলিতে আমার সাহস হইতেছে না।"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"কি গন্ধ! ঠিক যেন ব্রাণ্ডির গন্ধ। রাগের কথা তুমি কি বলিবে ?"

ধনুকধারী বলিল,—"আমি যাহা চাই, মনে করিলে তুমি তাহা দিতে পার। কাকামহাশয়কে বলিয়া কি হইবে ?"

সুবালা বলিলেন,—"তুমি কি চাও, তাহা না জানিলে কি করিয়া উত্তর দিব ?"

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে ধনুকধারী বলিল,—"ছেলেবেলা হইতে আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। তোমার জন্য আমি প্রাণ বিসর্জন করিতে পারি। আমি তোমাকে চাই।"

সুবালার মুখ রক্তবর্ণ হইল! স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ ধনুকধারীর দিকে তিনি চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি মদ খাইয়াছ ?"

ক্রমে ধনুকধারীর সাহস বৃদ্ধি হইল। সে বলিল,—"তোমাকে এ কথা বলিতে আমার সাহস হইত না, সেজন্য একটু মদ খাইয়াছি।"

সুবালা বলিলেন,—"ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়া তোমাকে আমি ক্ষমা করিলাম। যাও, বাড়ী যাও। যতক্ষণ না তোমার জ্ঞান হয়, ততক্ষণ শুইয়া নিদ্রা যাও।"

একে মনের আবেগে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহার উপর আবার সুরাপান করিয়াছিল। ধনুকধারীরও ক্রোধ হইল। সুবালার সহিত সমান উত্তর করিতে তাহার সাহস হইল। ধনুকধারী বলিল,—"বাল্যকাল হইতে আমি তোমার সঙ্গে আছি। যখন যাহা বলিয়াছ, তখন তাহা করিয়াছি। একসঙ্গে কত খেলা, কত আমোদ-আহ্লাদ করিয়াছি। আজ আমি কেহ হইলাম না, আর সেই ঝেঁকড়া-চুলো ছবি-আঁকা বেটা সব হইল? সে বড়মানুষের ছেলে, আমি গরীবের ছেলে। সেইজন্য তুমি আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিবে? সে ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ, সেইজন্য তুমি আমাকে পদদলিত করিবে? আর সেদিনই,—তা জান? কলিকাতায় সভা হইয়াছিল, তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, আমরা ক্ষত্রিয়। চারিদিকে কায়স্থরা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেছে। আর একমাস অশুচি নাই, এখন বারো দিন। এখন আর দাস নাই, এখন বর্ম্মা। যেমন দেবযানী—"

এইরূপ বলিতে বলিতে ধনুকধারীর যেন একটু সংজ্ঞা হইল। দেবযানীর গল্প বলিতে তাহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে বলিতে পারিল না, বলিতে বলিতে চুপ হইয়া গেল। তাহার পর ধীরে ধীরে সুমিষ্ট স্বরে সে বলিল,—"সুবালা! তোমাকে প্রাণ অপেক্ষা আমি ভালবাসি। যদি তুমি আমাকে বিবাহ না কর, তাহা হইলে এ প্রাণ আমি আর রাখিব না। এই দেখ, আমি একখানি ছোরা প্রস্তুত করিয়াছি। তোমাকে আমি কিছু বলিব না, কিন্তু এই ছোরা আমি নিজের বুকে মারিয়া প্রাণ বিসর্জন করিব।"

এই কথা বলিয়া, জামার ভিতর হইতে একখানি ছোরা বাহির করিয়া সে সুবালাকে দেখাইল।

সুবালা একটু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার কথায় রাগ করিব, কি হাসিব, তাহা আমি বুঝতে পারি না। তুমি পাগল হইয়াছ। উপন্যাস-পুস্তক পাঠ করিয়া তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যাও, বাড়ী যাও। তোমার মন্দ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু পুনরায় যদি ওরূপ কথা আমাকে বলিতে সাহস কর, তাহা হইলে আমি

বড়ালমহাশয়কে বলিয়া দিব। তিনি তোমাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিবেন।”

ধনুকধারী পুনরায় রাগিয়া উঠিল। পুনরায় সে ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। সে বলিল—“বড়ালমহাশয় আমাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিবেন? হা, হা, হা! ভাল কথা বটে! বড়ালমহাশয় আমাকে তাড়াইয়া দিবেন! হা, হা, হা!”

ধনুকধারী এই কথা বলিতে লাগিল, আর হা-হা রবে কিম্ভূতকিমাকার ভঙ্গী করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতে লাগিল। সুবালা আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরে সুবালা বলিলেন,—“তুমি মদ খাইয়াছ, তুমি পাগল হইয়াছে, তোমার এখন জ্ঞান নাই। কিন্তু তোমার মুখের ভঙ্গী ও কথার ভাব দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে। যাহা হউক, তোমার সহিত আমি তর্ক-বিতর্ক করিতে ইচ্ছা করি না। বড়ালমহাশয় কি করিয়াছেন, তাহা আমি জানি না, আর শুনিতে চাই না। তিনি বৃদ্ধ, তোমার পিসেমহাশয়। তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে চাও কর। কিন্তু তুমি এখন যে কথা আমাকে বলিলে, সে কথা যদি পুনরায় আমাকে বল, তাহা হইলে আমি নিজেই তোমাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিব। বাড়ি আমার।”

ধনুকধারী আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—“বাড়ি তোমার? হা, হা, হা, শুনিলে হাসি পায়। কাহার বাড়ী, বাছাধন? হা, হা, হা! জান, তোমার দর্প আমি চূর্ণ করিতে পারি? অধিক নয়, যদি একটা কথা আমি মুখ দিয়া বাহির করি, তাহা হইলে বাছাধন তোমার কি হয়?”

বিস্মিতা হইয়া সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ও আবার কি কথা?”

সুবালার মনে ঘোরতর সন্দেহ হইল। ধনুকধারীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইল যে, “এ সকল নিতান্ত মাতালের কথা নহে। এই সমুদয় কথার কোন গূঢ় অর্থ আছে।” কিন্তু ধনুকধারী প্রকাশ করিয়া কিছু বলিল না।

ধনুকধারীর এখন পুনরায় জ্ঞান হইল। রাগের মাথায় সে এইসব

কথা বলিয়াছিল। ভয়ে তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। সে বলিল,—"সুবালা! সত্য সত্যই আমি পাগল হইয়াছি। তোমাকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত মিছামিছি আমি ও কথা বলিয়াছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর! জোড়হাত করিয়া তোমার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি ক্ষিপ্ত হইয়াছি, এখন আমার জ্ঞান নাই। সুবালা! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি চলিলাম। এ সব কথা কাহাকেও বলিও না।"

এই বলিয়া ধনুকধারী সত্বর সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ডাকিলে কেন

সুবালা স্তম্ভিত হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ধনুকধারী যাহা বলিল, তাহা সুরাপানের উন্মত্তের কথা, অথবা তাহার মূলে কিছু সত্য আছে? তাহার কথার ভাবে বোধ হইল যে, সে মনে করিলে বড়ালমহাশয়কে জব্দ করিতে পারে, আমারও সে অনিষ্ট করিতে পারে। এ সব কথার অর্থ কি?—সুবালা এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন।

আবার ভাবিলেন।—"এ সম্পত্তি কি প্রকৃত আমার নহে? বাস্তবিক এ সম্পত্তির আমি কে? মায়ের মেসোর সম্পত্তি। আমার নিজের মেসো পর্যন্ত নয়! এ সম্পত্তির উপর আমার কি অধিকার আছে? আইন অনুসারে এ সম্পত্তি আমার নহে; তা যেন হইল। কিন্তু, বড়ালমহাশয়কে সে কিরূপে জব্দ করিতে পারে? ইহার মানে কি?"

ভাবিতে ভাবিতে সুবালা বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। ঘরে আসিয়া একখানি চৌকিতে তিনি বসিয়া পড়িলেন। সেই স্থানে বসিয়া ক্রমাগত তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর সমস্ত রাত্রি ধনুকধারীর ভাব-ভঙ্গী ও কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না।

প্রাতঃকালে উঠিয়াও সুবালা সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন,— "কাহাকে জিজ্ঞাসা করি? বড়ালমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারি না। ধনুকধারী তাঁহার আত্মীয়। কাহার সহিত পরামর্শ করি? কাকামহাশয়কেও বলিতে পারি না। এ কথা শুনিলেই তিনি হুলুস্থুল করিবেন, ধনুকধারীকে তৎক্ষণাৎ দূর করিয়া দিবেন। যদি সে সুরাপান পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে পরে তাহাকে তাড়াইতে হইবে। কিন্তু আপাততঃ তাহার মন্দ করিতে আমি ইচ্ছা করি না। উন্মত্ত অবস্থায় সে হয় তো প্রলাপ করিয়াছে; আমাকে সে যাহা বলিয়াছে, তাহা পাগলের কথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহা হউক, এ সম্পত্তি যদি প্রকৃত আমার না হয়, অথবা ইহার ভিতর যদি কোনরূপ জুয়াচুরি থাকে, তাহা হইলে, এ বিষয় আমি লইব না। যাহার বিষয়, তাহাকে ফিরিইয়া দিব। কিন্তু কাকামহাশয়কে এ কথা বলিতে পারি না। তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন না। কাহাকে জিজ্ঞাসা করি? কাহার সহিত পরামর্শ করি?"

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, লজ্জা-সরমে জলাঞ্জলি দিয়া, বিনয়কে তিনি পত্র লিখিলেন,—"বিশেষ একটা কথা আছে। একদিনের জন্য যদি তুমি এখানে আসিতে পার, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।"

বিনয়ের ঠিকানা তিনি জানিতেন না। তাঁহার পিতার নাম পর্যন্ত সুবালা জানিতেন না। বিনয়ের মাতুলালয়ে সেই চিঠি পাঠাইলেন। সৌভাগ্যক্রমে বিনয় সে চিঠি পাইলেন। দুইদিন পরে বৈকালবেলা বিনয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যথারীতি সুবালা তখন বাগানে গিয়াছিলেন। কোন ফুলগাছটিতে ফুল ফুটিয়াছে, কোন্‌টিতে মুকুল হইয়াছে, কোন্‌টিতে নবপল্লব বাহির হইয়াছে, এই সমুদয় দেখিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। এদিক ওদিক বেড়াইয়া গাছগুলি তিনি দেখিতেছিলেন। নিকটে দুইটি কাঠবিড়াল একবার এ গাছে উঠিতেছিল, পুনরায় তাহা হইতে নামিয়া দ্রুতবেগে অন্য গাছে উঠিতেছিল। চারি পাঁচটি নীলকণ্ঠ পক্ষী ফুলগাছের মূলে কীট-পতঙ্গের অনুসন্ধান করিতেছিল। ছাদের আলিসা হইতে একঝাঁক

গোলা পায়রা নামিয়া সুবালার চারিদিকে বিচরণ করিতেছিল।

বিনয় সেই স্থানে গমন করিলেন। সুবালা এখন অতি সলজ্জভাবে বিনয়ের সহিত কথোপকথন করিতেন। প্রথম, ফুলগাছ সম্বন্ধে তাঁহাদের নানারূপ কথাবার্তা হইল। তাহার পর বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুবালা! আমাকে তুমি কি কথা বলিবে?"

ধনুকধারী যাহা যাহা বলিয়াছিল, সুবালা আদ্যোপান্ত তাহা বর্ণনা করিলেন। সুবালাকে সে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, এই কথা শুনিয়া বিনয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু বড়ালমহাশয়ের নামে সে যেভাবে হাসিয়াছিল ও সুবালাকে সম্পত্তি সম্বন্ধে সে ইঙ্গিতে যাহা বলিয়াছিল, যখন তাহা তিনি শুনিলেন, তখন তিনি গম্ভীর ভাবে নীরব হইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিনয় বলিলেন,—"জুয়াচুরি আছে, তুমি সেই সন্দেহ করিতেছ?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"হাঁ, আমি যতই ভাবিতেছি, ততই আমার বিশ্বাস হইতেছে যে, ইহার ভিতরে কোনরূপ প্রতারণা আছে। সে প্রতারণা কি, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"

এতক্ষণ দাঁড়াইয়া কথা হইতেছিল। নিকটে একটি শুষ্ক বৃক্ষ পড়িয়া ছিল। সুবালা সেই কাষ্ঠের একপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন, বিনয় তাহার অপর পার্শ্বে বসিলেন।

বিনয় বলিলেন,—"সম্পত্তির তুমি অধিকারিণী হইয়াছ, রায়মহাশয় ও তাঁহার পত্নী যদি উইল করিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে রায়মহাশয়ের ভ্রাতা বিজয়বাবু ইহা পাইতেন। তিনি কোন আপত্তি করেন নাই, করিবেনও না। তবে প্রতারণা আছে কি না, সে অনুসন্ধান করিয়া ফল কি?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"প্রতারণা করিয়া আমি কাহারও সম্পত্তি ভোগ করিতে চাই না।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যদি প্রতারণা থাকে, তাহা হইলে তুমি যাহার বিষয় তাহাকে ফিরিয়া দিবে?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"নিশ্চয়! কিন্তু সে কথার এখন প্রয়োজন নাই। কোনরূপ গোলযোগ আছে কি না, যদি থাকে, তাহা হইলে কি, তাহাই আমি এখন জানিতে ইচ্ছা করি। যতদিন তাহা জানিতে না পারিব, ততদিন আমার প্রাণ সুস্থির হইবে না।"

চুপ করিয়া বিনয় ভাবিতে লাগিলেন। এই সম্পত্তি রায়মহাশয় কিরূপে পাইয়াছিলেন, রায়মহাশয় কিরূপ উইল করিয়াছিলেন, তাহার পর সুবালা ইহা কিরূপে পাইলেন, সে সকল কথা বিনয় পূর্বে শুনিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার দিদিমণির বয়ঃক্রম কবে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল? কবে তিনি উইল করিলেন? কবে তাঁহার মৃত্যু হইল?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"২০শে শ্রাবণ তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল; ২১শে শ্রাবণ তিনি উইল করিলেন; ২৩শে শ্রাবণ তাঁহার মৃত্যু হইল।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল? কে তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিল?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"তাঁহার ক্ষয়কাশি হইয়াছিল। শেষকালে উদরের দোষও হইয়াছিল। পূর্বে অনেক বড় বড় ডাক্তার ও বৈদ্য তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। শেষে বড়ালমহাশয় কলিকাতা হইতে একজন চিকিৎসক আনিয়াছিলেন। শুনিলাম যে, একপ্রকার উদ্ভট প্রণালীতে শেষ কয়দিন তিনি চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে প্রতিদিন দুই মণ করিয়া বরফ তিনি আনাইতেন।"

বিনয় বলিলেন,—"আশ্চর্য কথা! কাশ রোগে বরফ দিয়া চিকিৎসা। মৃত্যুকালে তাঁহার নিকটে কে ছিলেন?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"বড়ালমহাশয়, তাঁহার স্ত্রী, ধনুকধারী ও চিকিৎসক, এই কয়জন তাঁহার নিকট ছিলেন।"

বিনয় পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন,—"যদি কোন কথা থাকে, তাহা হইলে বড়ালনীর মুখ হইতে তাহা বাহির করিতে হইবে। দুইজন লোককে আমি পুলিসের কনেষ্টবল

সাজাইয়া আনিব। বড়ালনীকে তাহারা ভয় দেখাইবে। ভয়ে বড়ালনী বোধ হয়, সকল কথা বলিয়া ফেলিবেন। কিন্তু বড়ালমহাশয় কি ধনুকধারী উপস্থিত থাকিলে চলিবে না।"

সুবালা বলিলেন,—"বড়ালমহাশয় প্রাতঃকালে উঠিয়া কাজে গমন করেন। দুই প্রহর পর্যন্ত তিনি বাড়িতে থাকেন না। বড়ালমহাশয়কে বলিয়া পাঁচ ছয় দিনের নিমিত্ত ধনুকধারীকে আমি কোন স্থানে পাঠাইয়া দিব। তবে কথা এই, কৃত্রিম কোন বিষয় করিতে আমি ইচ্ছা করি না। সে এক প্রকার মিথ্যা কথা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

বিনয় বলিলেন,—"তবে অন্য কোনরূপ উপায় যদি স্থির করিতে পারি, তাহা আমি ভাবিয়া দেখিব। কিন্তু চারি পাঁচ দিনের নিমিত্ত ধনুকধারীকে তুমি অন্যত্র প্রেরণ করিবে।"

তাহার পর বিনয় পুনরায় বলিলেন,—"আমি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া আছি। কল্য আমি কোন কাজ করিতে পারিব না। পরদিন যাহা হয় একটা করিব। জ্যেঠাই-মায়ের ছবি ভাল স্থানে টাঙানো হইয়াছে?"

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জ্যেঠাই-মা আবার কে?"

বিনয় হাসিয়া বলিলেন,—"আশ্চর্য! ধনুকধারীর কথা শুনিয়া আমি অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম। তোমার দিদিমণির সে ছবি টাঙানো হইয়াছে?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"উত্তর দিকে যে ঘরে তিনি বাস করিতেন ছবি এখন সেই ঘরে আছে। কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে, মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে দিদিমণি পূর্ব দিকে চোরকুঠুরির নিকট ঘরে গিয়াছিলেন। সেই ঘরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমার ইচ্ছা যে, ছবি সেই ঘরে থাকে।"

বিনয় বলিলেন,—"কল্য আমি সেই ঘরের প্রাচীরের গায়ে ছবি ঝুলাইয়া দিব!"

বাহির-বাটীতে পূর্বে যে ঘরে ছিলেন, বিনয় এবারও সেই ঘরে বাস করিতে লাগিলেন। সুবালার ইচ্ছানুসারে বড়ালমহাশয় পরদিন ধনুকধারীকে কার্যোপলক্ষে নিকটস্থ একখানি গ্রামে প্রেরণ করিলেন। সে কার্য শেষ হইতে পাঁচ ছয় দিন লাগিবে।

পরদিন অপরাহ্ণে বিনয়, সুবালা ও তাঁহার পিসীমা রায়-গৃহিণীর ছবি লইয়া পূর্ব দিকের শয়নাগারে গমন করিলেন। কোন স্থানে ছবিটি ঝুলাইলে ভাল দেখাইবে, সেই স্থান তাঁহারা মনোনীত করিতে লাগিলেন।

সুবালার একটি কুকুর ছিল, তাহার নাম বাঘা; শৈশবকালে সুবালা তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। বড় হইয়া সেও সুবালার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। বাঘা ইহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া চোরকুঠরির দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া প্রথম সে ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে লাগিল। তাহার পর সে গর্জন করিয়া উঠিল।

বিনয় বলিলেন,—"চোরকুঠরির ভিতর ইঁদুর অথবা বিড়ালের গন্ধ পাইয়াছে। সেইজন্য বোধ হয় কুকুরটা এইরূপ করিতেছে।"

পিসীমা বলিলেন,—"গেল যা! কুকুরটার একবার আস্পর্ধা দেখ। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। সুবালা! তোমার কুকুরকে এত আদর দিও না।"

ঈষৎ হাসিয়া সুবালা বাঘাকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু প্রথম সে যাইতে সম্মত হইল না। চোরকুঠরির দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া সে গর্জন করিতে লাগিল। পরে সুবালা যখন ধমক দিয়া তাহাকে বাহির যাইতে বলিলেন, তখন সে অতি ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে গিয়া দ্বারের নিকট বারাণ্ডায় বসিয়া রহিল।

ছবির নিমিত্ত স্থান মনোনীত হইলে বিনয় বলিলেন,—"চাকরের নিকট হইতে পেরেক ও হাতুড়ি লইয়া আসি।" এই বলিয়া তিনি সে ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন।

পিসীমা ও সুবালা সেই ঘরে রহিলেন। সুবালা বলিলেন,—"পিসীমা! এই ঘরের পার্শ্বে যে ঘর, তাহাতে মা, দিদি ও আমি বাস করিতাম। তাহার পর এই ঘরে চপলা ও আমি থাকিতাম।"

পিসীমা বলিলেন,—"চপলার কথা আমি শুনিয়াছি। বড়ই আশ্চর্য কথা। সে বালিকাটির কোন সন্ধান হইল না?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"না পিসীমা! সকলে বলে যে, খাঁদা

ভূত তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সে কথা আমার বিশ্বাস হয় না। তবে কিরূপে কোথায় সে গেল, আজ পর্যন্ত তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।"

পিসীমা বলিলেন,—"খাঁদা ভূতের কথা আমি শুনিয়াছি। এ বাড়ির সে সর্বনাশ করিয়াছে।"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"হাঁ পিসীমা! এই বাড়ির সর্বনাশ করিয়াছে। অন্ততঃ তাহার হাঁকের পর এই বাড়িতে নানারূপ বিপদ ঘটিয়াছে। গভীর রাত্রিতে সে যে বিকট শব্দ করিত, তাহা আর তোমাকে কি বলিব! দাদামহাশয়ের জামাতা, তাঁহার কন্যা, আমার দিদি, আমার মা, চপলা, শেষে দাদামহাশয় নিজে,—খাঁদা ভূতের হাঁকের পর এতগুলি লোকের মৃত্যু হইয়াছে।"

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে খাঁদা-ভূত এখন কোথায় গেল?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"দাদামহাশয়ের মৃত্যুর পর আর সে এ গ্রামে আসে নাই।"

পিসীমা বলিলেন,—"তামাক-পোড়ার কৌটা লইয়া আসি।"

এই বলিয়া তিনি সে ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন। পিসীমা সে ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন, তাহা দেখিয়া বাঘা পুনরায় আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। চোরকুঠুরির দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া পুনরায় সে ফোঁস্ ফোঁস্ ও গর্জন করিতে লাগিল। সুবালা বলিলেন,—"চুপ বাঘা! চুপ! চুপ! চুপ, আয় এ দিকে আয়।"

সুবালা একেলা ঘরে রহিলেন। ঘরে একখানি খাট ও বিছানা ছিল। সেই খাটের উপর তিনি বসিয়া বাঘাকে নিম্নে মেজেতে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। সেই স্থানে বসিয়া চোরকুঠুরির দ্বারের দিকে একদৃষ্টিতে বাঘা চাহিয়া রহিল।

সুবালা ভাবিতে লাগিলেন,—"দিদিমণি যদি এখন ভূত হইয়া দেখা দেন, তাহা হইলে ভয়ে আমি চীৎকার করি, কি সহজ মানুষের মত তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহি? এই সময় যদি খাঁদা ভূত আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই বা কি করি? খাঁদা ভূত!"

শেষ দুইটি কথা—"খাঁদা ভূত!" সুবালা একটু পরিস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিলেন। ঠিক যেন তাহার প্রত্যুত্তরে অন্ধকার ঘর হইতে খোনা স্বরে কে বলিল,—"কেঁন ?"

সেই শব্দ শুনিয়া বাঘা গর্জন করিয়া উঠিল।

যে ঘরে সুবালা বসিয়াছিলেন, তাহার ঠিক পার্শ্বে অন্ধকার ঘর। দুই ঘরের মধ্যস্থলে দ্বার ছিল। দ্বারটি এখন বন্ধ ছিল। সেই ঘর হইতে "কেঁন" এইরূপ শব্দ আসিল।

ঘোরতর বিস্মিতা ও ভীতা হইয়া সুবালা সেই দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার কি ভ্রম হইয়াছে ? না, সত্য খোনা স্বরে কে বলিল "কেঁন ?"

অল্পক্ষণ পরে অন্ধকার ঘর হইতে পুনরায় কে বলিল,—"তুমি আঁমাকে ডাঁকিলেঁ কেঁন ?"

বাঘা পুনরায় গর্জন করিয়া উঠিল। সুবালা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

———

তৃতীয় অধ্যায়

সুবালা ও পশুপক্ষী

ভয়ে সুবালার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। ভয়ে তাঁহার পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। খাট হইতে তিনি যে পলায়ন করিবেন, অথবা সে স্থানে বসিয়া তিনি যে চীৎকার করিবেন, সে ক্ষমতা তাঁহার রহিল না। তবে বাঘা নিকটে আছে, সেজন্য কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার মন আশ্বাসিত হইল। পূর্বেই বলিয়াছি যে, সুবালা বাঘার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। বড় হইয়া সেও সে ঋণ পরিশোধ করিয়াছিল।

দীন-দুঃখী-পীড়িত-তাপিত মানুষদিগের প্রতি যেরূপ সুবালার দয়া মায়া ছিল, জীব-জন্তুর প্রতিও সেইরূপ দয়া ছিল। বাড়ীতে অনেকগুলি দুগ্ধবতী গাভী ছিল। তাহাদের ভালরূপ সেবা হইতেছে কি না,

প্রচুর পরিমাণে তাহারা আহার পাইয়াছে কি না, প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্বে সুবালা নিজে গোয়ালে গিয়া সে বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। কোন গরুর সম্মুখে আহার না থাকিলে কখন কখন তিনি নিজেই খড় কাটিতে বসিতেন। গোশালা সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিত। কোন স্থানে বিন্দুমাত্র গোময় বা গোমূত্র পড়িয়া থাকিত না। কোন গরুর গাত্রে বিন্দুমাত্র ময়লা লাগিয়া থাকিত না। কোন বিষয়ে অপরিষ্কার দেখিলে তিনি নিজে পরিষ্কার করিতেন।

মাতা উপদেশ দিয়াছিলেন যে,—"সুবালা! কখনও নিষ্ঠুর হইও না। চড়ুই পাখিটি ছাড়িয়া দাও।" জ্ঞান হইলে সুবালা বুঝিয়াছিলেন যে, পক্ষীদিগকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাদের ক্লেশ হয়, সেজন্য কখনও তিনি পক্ষী পালন করেন নাই। তবে ঘটনাক্রমে একবার একটি শালিক পাখী তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। বাগানে এক গাছের কোটরে দুইটি শালিক পাখীতে বাসা করিয়াছিল। তাহাদের দুইটি ছানা হইয়াছিল। দৈবক্রমে শাবক দুইটি নিম্নে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, একটি মরিয়া গিয়াছিল, অপরটি জীবিত ছিল; কিন্তু তাহার একটি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ছানাটিকে বাড়ি আনিয়া ভাঙ্গা পায়ে চুণ-হলুদ লেপন করিয়া, নেকড়ার ফালি দিয়া সুবালা তাহা বাঁধিয়া দিলেন। একটি চুবড়ীতে তূলা বিছাইয়া তাহার উপর ছানাটিকে রাখিয়া, পাখিদের বাসার নিকট গাছে সেই চুবড়ীটি তিনি ঝুলাইয়া দিলেন। ছানাটির মাতা-পিতা প্রথম নিকটে আসিতে সাহস করে নাই। নিকটস্থ ডালে বসিয়া কেচর-মেচর করিতে লাগিল। শাবককে বাসায় আসিবার নিমিত্ত যেন তাহারা ডাকিতে লাগিল। যখন দেখিল যে, ছানা ঘরে ফিরিয়া আসিল না, তখন ক্রমে ক্রমে নিকটে আসিয়া তাহারা তাহার মুখে আহার দিতে লাগিল। দূর হইতে সুবালা পাখি দুইটির ব্যবহার দেখিতেছিলেন। মাতা-পিতা সন্তানকে আহার দিতে লাগিল দেখিয়া সুবালার আনন্দ হইল। সন্ধ্যা হইলে সুবালা ছানাটিকে বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, বড় হইয়া উড়িতে শিখিলে সে তাহার মাতা-পিতার সহিত চলিয়া যাইবে। কিন্তু ততদিন

পর্যন্ত মাতা-পিতা তাহাকে প্রতিপালন করিল না। ছানাটি উড়িতে শিখিবার পূর্বেই তাহারা কোন স্থানে চলিয়া গেল। তখন হইতে সুবালাকে কাজেই তাহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে হইল। পাখিটি বড় হইয়া সর্বদা সুবালার নিকট থাকিত, তাঁহার কাঁধে বসিত, অথবা তাঁহার সহিত এ ঘর সে ঘর বেড়াইতে ভালবাসিত। রাত্রিকালে সে একটি আলমারির মাথায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইত। সুবালা কখনও তাহাকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন না। গ্রীষ্মকালে দিনের বেলা কখন কখন সে বাগানে যাইয়া কোন গাছের পত্রের ভিতর লুক্কায়িত থাকিত। কিন্তু সুবালা ডাকিলেই সে সাড়া দিত ও গাছ হইতে উড়িয়া তাঁহার মাথায় আসিয়া বসিত। দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন কোথা হইতে একটা উট্‌কো বিড়াল আসিয়া পাখিটিকে লইয়া পলায়ন করিল। তাহার শোকে সুবালা অনেক কাঁদিয়াছিলেন এবং তিন চারি দিন ভালরূপে আহারাদি করেন নাই।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই শালিক পাখীটি অন্যান্য পক্ষীদিগকে ডাকিয়া আনিয়া সুবালার সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া দিয়াছিল। একদিন প্রাতঃকালে সুবালা বাগানে গিয়াছিলেন। শালিক পাখিটি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। সুবালার হাতে একখানি বাসি রুটি ছিল। তাহা হইতে অল্প অল্প ছিঁড়িয়া তিনি শালিক পাখিকে দিতেছিলেন। সহসা পাখি গাছের দিকে উড়িয়া গেল। সুবালা ভাবিলেন, পাখি কোথায় গেল, কেন উড়িয়া গেল! অল্পক্ষণ পরে সে আর দুইটি শালিক পক্ষীকে লইয়া ফিরিয়া আসিল; কিন্তু তাহারা নিকটে আসিতে সাহস করিল না, দূরে বসিয়া পোষা পক্ষীর আহার দেখিতে লাগিল। রুটি ছিঁড়িয়া সুবালা তাহাদের জন্য দূরে নিক্ষেপ করিলেন। দূর হইতে আহার করিয়া সেদিন তাহারা প্রস্থান করিল। এই দুইটি পক্ষী পুনরায় আসে কি না, তাহা দেখিবার নিমিত্ত সুবালা পরদিন প্রাতঃকালে সেই গাছের গোড়ায় গিয়া বসিলেন। সেদিনও সেই বন্যপক্ষী দুইটি আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্বদিন অপেক্ষা তাহারা আরও নিকটে আসিয়া আহার করিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাছতলায় বসিয়া পক্ষীদিগকে

আহার প্রদানকরা সুবালার এক খেলা হইল। পুরাতন পক্ষীটির ন্যায় নূতন দুইটি পক্ষীও সম্পূর্ণরূপে পোষ মানিল। তাহাদের দেখাদেখি অন্যান্য শালিক পক্ষীও নিয়মিতরূপে আসিতে লাগিল। নির্ভয়ে সুবালাকে ঘিরিয়া, কেচর-মেচর করিয়া, প্রতিদিন তাহারা আহার করিতে লাগিল।

আকাশে উড়িতে উড়িতে কতকগুলি বন্য গোলা-পায়রা এই পক্ষভোজন দেখিতে পাইল। নিম্নে অবতরণ করিয়া ভয়ে ভয়ে সুবালার দিকে তাহারা অগ্রসর হইল। অল্লাধিক আহার করিয়া সেদিন তাহারা প্রস্থান করিল। পরদিন একঝাঁক গোলা-পায়রা আসিয়া উপস্থিত হইল। পায়রাদিগের জন্য সেদিন সুবালা ছোট মটর আনিয়াছিলেন। আনন্দে মটর ভোজন করিয়া কপোতগণ প্রস্থান করিল। তাহার পর ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা আসিয়া সুবালার প্রদত্ত আহার নিত্য নিত্য ভোজন করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিল যে, এ স্থানে যদি এরূপ আহারের আয়োজন আছে, তবে দূরে আর যাই কেন। রায়মহাশয়ের বাড়ির প্রাচীরগাত্রে আলিসার নিম্নে কেবল গুটিকতক কোটর ছিল। কয়েকজোড়া পায়রা গিয়া তাহা অধিকার করিল। কিন্তু সেই কোটর কয়টি লইয়া ভয়ানক কলহ উপস্থিত হইল। অন্য পায়রাগণ সেই কোটর বলপূর্বক অধিকার করিতে চেষ্টা করিল। সর্বদা এইরূপ বিবাদ হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া, বড়ালমহাশয়কে বলিয়া সুবালা ছাদের আলিসা আরও উচ্চ করিয়া গাঁথাইলেন ও পায়রা-দিগের বাসস্থানের উপযোগী অনেকগুলি ছিদ্র বা খোপ সেই প্রাচীরে রাখিয়া দিলেন। পূর্বে রায়মহাশয়ের বাটীতে একটিও পায়রাও ছিল না। এক্ষণে শত শত কপোত-কপোতী আসিয়া সেই সমুদয় কোটরে বাস করিল। কিন্তু তবুও তাহাদের মধ্যে বাদবিসম্বাদ একেবারে নিবারিত হইল না। এক একটি দুষ্ট পায়রা বিনা কারণে অন্যের গৃহ অধিকার করিতে চেষ্টা করিত। যাহাদের ঘর, তাহারা আপত্তি করিলে দুষ্ট পায়রা তাহাদিগকে অতি নিষ্ঠুরভাবে চঞ্চু ও পক্ষ দ্বারা প্রহার করিত। প্রায় প্রতিদিন সুবালাকে এইরূপ মোকদ্দমা মীমাংসা করিতে

হইত। শান্তশিষ্ট কপোত-কপোতীদিগকে তিনি আদর করিতেন ও নিজের হাত হইতে তাহাদিগকে আহার খুঁটিয়া খাইতে দিতেন। কিন্তু দুষ্টদিগকে তিনি অনেক ভৎ´সনা করিতেন ও তাঁহার হাত হইতে আহার করিতে দিতেন না। আশ্চর্য কথা এই যে, দুষ্টগণ সে অপমান বুঝিতে পারিত। বিরসমনে অধোবদনে দূর হইতে আহার করিয়া তাহারা চলিয়া যাইত ও কলহ-বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সুবালার প্রীতি-ভাজন হইতে চেষ্টা করিত। কোন কোন পায়রা সুবালার ক্রোড়ে বসিয়া তাঁহার নিকট হইতে আদর পাইতে চেষ্টা করিত।

কিছুদিন পরে পায়রাদিগের আর একটি নূতন শত্রু আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিন কোথা হইতে অনেকগুলি নীলকণ্ঠ পক্ষী আসিয়া পায়রাদিগের ডিম্ব ফেলিয়া দিল ও তাহাদের কোটর অধিকার করিতে চেষ্টা করিল। সেদিন বাড়ির ভৃত্যগণ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল; কিন্তু প্রতিদিন তাহারা আসিয়া এইরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ করিতে লাগিল; সেজন্য সুবালা তাহাদের জন্য গুটিকতক নূতন কোটর নির্মাণ করাইলেন। প্রথম তাহারা সে নূতন গৃহে যাইতে সম্মত হইল না। কিন্তু লাঠি হাতে করিয়া চপলার ভগিনী পাগলী পায়রাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। সেজন্য নিরুপায় হইয়া :তাহারা নূতন নির্মিত কোটরে গিয়া বাস করিল।

যে বৃক্ষতলে বসিয়া সুবালা পক্ষীদিগকে ভোজন প্রদান করিতেন, সেই বৃক্ষে দুইটি কাঠবেড়ালী বাস করিত। গাছে বসিয়া অনেকদিন ধরিয়া তাহারা দেখিতেছিল যে, তাহাদের বাড়ির নিকট প্রতিদিন সদাব্রত হইতেছে। এক মানব-কন্যা সেই পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই মানবীর মুখশ্রী অতি মৃদু, অতি মধুর, দয়ামায়াতে পরিপূর্ণ। তাঁহার নিকট গমন করা উচিত কি না, অনেক দিন ধরিয়া কাঠবিড়াল ও কাঠবিড়ালী এই চিন্তায় নিমগ্ন রহিল। সুবালা ও পক্ষীগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, কাঠবিড়াল দুইটি সভয়ে নিম্নে নামিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু উচ্ছিষ্ট পড়িয়া থাকিত, দুই হাতে তাহা ভক্ষণ করিত। তাহা দেখিয়া সুবালা কাঠবেড়ালীদের জন্য ছোলা আনিতে আরম্ভ করিলেন।

অন্যান্য পক্ষীদিগের ভোজন সমাপ্ত হইলে কাঠবেড়ালীদিগের জন্য সুবালা গাছতলায় ছোলা ছড়াইয়া যাইতেন। সুবালা চলিয়া গেলে, গাছ হইতে নামিয়া তাহারা সেই ছোলা ভক্ষণ করিত। দিন দিন তাহাদের সাহস বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহাদের ভয় দূর করিবার নিমিত্ত সুবালা আপনার পশ্চাৎদিকে ছোলা বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। মানব-কন্যা অন্যমনস্কা আছে, আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না, এইরূপ ভাবিয়া চুপি চুপি গাছ হইতে নামিয়া তাহারা সেই ছোলা খাইতে লাগিল। সুবালা ক্রমে নিজের পার্শ্বে ছোলা ছড়াইয়া দিলেন। নির্ভয়ে সে ছোলাও তাহারা ভক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পর সুবালা সম্মুখে ছোলা ফেলিলেন। সে স্থানের খাদ্যও তাহারা ভক্ষণ করিল। অবশেষে তাহারা সুবালার স্কন্ধে বসিয়া তাঁহার হাত হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না।

ছোলা দেখিয়া একঝাঁক টিয়া পাখিও আহারের লোভে সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শালিক পাখী, চড়ুই পাখী, পায়রা, টিয়া পাখি, কাক, কাঠবিড়াল প্রভৃতি পশু-পক্ষী দ্বারা পরিবৃতা হইয়া সুবালা যখন গাছতলায় বসিয়া থাকিতেন, তখন সে বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিয়া সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইত। গ্রামে কোন লোকের বাড়িতে কুটুম্ব আসিলে, তাহারা এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে আসিত। সকলে বলিত যে, সুবালা মনুষ্য নহেন। ইনি লক্ষ্মী অথবা সরস্বতী অথবা স্বয়ং ভগবতী মানুষের আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

বাগানের এক পুষ্করিণীতে সুবালা অনেকগুলি বড় বড় রুই মৎস্য পুষিয়া রাখিয়াছিলেন। সুবালার কণ্ঠস্বর তাহারা বুঝিতে পারিত। সানবাঁধা ঘাটে দাঁড়াইয়া সুবালা যখন তাহাদিগকে "আয় আয়" বলিয়া ডাকিতেন, তখন নিকটে আসিয়া তাহারা হুড়াহুড়ি করিত। মুড়ি ও ময়দার গুলি তিনি জলে নিক্ষেপ করিতেন। মৎস্যগণ তাহা ভক্ষণ করিত। ক্রমে তাহারা এত নির্ভয় হইয়াছিল যে, আহারীয় দ্রব্য হাতে করিয়া জলের ধারে বসিলে, সুবালার হাত হইতে তাহারা কাড়িয়া খাইত। একটি রোহিত মৎস্য বড়ই দুর্দান্ত হইয়াছিল। সুবালার

হাত হইতে সে সমুদয় কাড়িয়া খাইত, অন্য কাহাকেও তাঁহার নিকটে যাইতে দিত না।

পক্ষী ও মৎস্যদিগকে প্রথম প্রথম সুবালা একেলাই ভোজন প্রদান করিতেন। কিন্তু ছাদে যখন অনেক গোলা-পায়রা আসিয়া বাস করিল, তখন তাহাদিগকে আহার প্রদান করিবার নিমিত্ত রায়-গৃহিণী একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার দ্বারা এ কাজ ভালরূপে সম্পন্ন হইল না। পায়রা দেখাইবার নিমিত্ত রাধা গোয়ালিনী একদিন পাগলীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। সেই সময় নীলকণ্ঠ পক্ষিগণ পায়রাদিগের উপর উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। সুবালা বলিলেন,—"চঞ্চলা! এই লাঠি হাতে করিয়া এই স্থানে বসিয়া থাক। নীলকণ্ঠ পাখি আসিলে তাড়াইয়া দিও।"

পাগলী সে কাজ উত্তমরূপে করিল। তাহার ভয়ে নীলকণ্ঠ পাখিরা পায়রাদিগের উপর আর উপদ্রব করিতে সাহস করিল না। তাহাদিগের জন্য যে কয়টি নূতন খোপ প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই খোপে গিয়া তাহারা বাস করিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে সুবালা পক্ষি-ভোজনের সময় পাগলীকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। অন্য লোক নিকটে গেলে পক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ উড়িয়া পলাইত, কিন্তু পাগলীকে দেখিয়া তাহারা সেরূপ ভয় করিল না। একপ্রকার আশ্চর্য-জ্ঞানবলে তাহারা বুঝিতে পারিল যে, এ আমাদের অনিষ্ট করিবে না। সুবালা সেদিন পাগলীকে পরিবেষণ করিতে দিলেন। সুবালাকে পশু-পক্ষিগণ যেরূপ ভালবাসিত, ততটা না হউক, কিন্তু পাগলীর সহিতও তাহাদের সদ্ভাব হইল। গোশালায় গাভীদিগকে, ছাদে কপোতগণকে, জলাশয়ে মৎস্যগণকে ও বৃক্ষতলে পক্ষিগণকে আহার দিবার নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে সুবালা পাগলীকে নিযুক্ত করিলেন। কখন দুইজনে একসঙ্গে, কখন পাগলী একেলা, কখন সুবালা একেলা বৃক্ষতলে গিয়া পক্ষীদিগকে খাদ্য প্রদান করিতেন। সুবালা যখন খুড়ামহাশয়ের বাড়ি যাইতেন, তখন পাগলী একেলা এই কাজ করিত। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় তাহার মুখ সর্বদাই বিষণ্ণ

হইয়া থাকিত। জীবজন্তুদিগের সহবাসে তাহার মন এখন পূর্বাপেক্ষা প্রসন্নভাব ধারণ করিল। তাহার মাতা ও সুবালার সহিত দুই একটি কথা ব্যতীত অন্য কোন লোকের সহিত সে কথোপকথন করিত না। কিন্তু নিভৃতে গোয়ালে বসিয়া গরুদিগের সহিত অথবা ছাদে পায়রাদিগের সহিত, অথবা ঘাটে মৎস্যদিগের সহিত, অথবা গাছতলায় পক্ষী ও কাঠবিড়ালদের সহিত সে অনেক গল্প-গাছা করিত। কিন্তু নিকটে মানুষ গেলেই অমনি সে নীরব হইত, তাহার মুখ হইতে তখন আর একটিও কথা বাহির হইত না।

বাঘার গল্প করিতে করিতে অন্যান্য পশুপক্ষীর কথা বাহির হইয়া পড়িল। সুবালা যখন সাত কি আট বৎসরের বালিকা ছিলেন, তখন একদিন তিনি গ্রামের ভিতর বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, জনকয়েক বালক ছোট একটি কুকুর-শাবকের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে পুষ্করিণীর জলে ফেলিতেছে ও তুলিতেছে! নিদারুণ যাতনায় কুকুরছানাটি কাঁপিতেছে। তাহার ক্লেশ দেখিয়া নিষ্ঠুর বালকগণ হাততালি দিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। তাহাদের নিষ্ঠুরতা দেখিয়া, সুবালার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। অনেক ভর্ৎসনা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কুকুরছানাটি তিনি কাড়িয়া লইলেন। জলে ও কাদায় তাহার সর্বশরীর ময়লা ও ভিজিয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থাতেই সুবালা তাহাকে বুকে লইয়া বাড়ি আসিলেন। ছানাটিকে তিনি প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং তাহার নাম বাঘা রাখিলেন। কালক্রমে বাঘা সাহসী ও বিক্রমশালী কুকুর হইয়া উঠিল। দৌড়াদৌড়ি করিয়া সুবালার সহিত খেলা করিতে অথবা তাঁহার সঙ্গে সকল স্থানে যাইতে বাঘা বড় ভালবাসিত। কিন্তু অন্য কুকুরের সহিত সে ঝগড়া করিত, বিড়াল দেখিলে তাড়া করিয়া যাইত, পক্ষীদিগকে সে ভয় দেখাইত, সেজন্য সকল সময়ে সুবালা তাহাকে সঙ্গে যাইতে দিতেন না।

বাঘাকে লইয়া সুবালা একদিন বাগানে গিয়াছিলেন। বাঘা ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছিল। সহসা নদীর দিকে একটা কলরব উপস্থিত হইল। বাঘা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কুকুর পাছে সেই দিকে

দৌড়িয়া যায়, সেজন্য নিকটে ডাকিয়া সুবালা তাহার গলার অলঙ্কৃত সুন্দর বক্‌লসটি ধরিয়া রহিলেন। সুবালার পশ্চাৎদিকে কোলাহল ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সুবালার হাত হইতে মুক্ত হইয়া সেই দিকে যাইবার নিমিত্ত বাঘা লম্ফ ঝম্ফ করিতে লাগিল। মাটিতে বসিয়া দুইহাতে প্রাণপণে সুবালা তাহার গলার বক্‌লস ধরিয়া রহিলেন। কিন্তু বাঘা এত লাফালাফি করিতে লাগিল যে, তাহাকে ধরিয়া রাখা ভার হইল। পশ্চাৎ দিকের গোলমাল আরও নিকটবর্ত্তী হইল। বাঘাকে লইয়া সুবালা ব্যস্ত ছিলেন। পশ্চাৎ দিকে কেন এত গোলমাল হইতেছিল, তাহা দেখিবার নিমিত্ত তিনি অবসর পাইতেছিলেন না। পশ্চাৎ দিকে ত্রিলোচন ও শঙ্করার কণ্ঠস্বর তিনি শুনিতে পাইলেন। উচ্চৈঃস্বরে তাহারা চিৎকার করিতেছিল,—"সুবালা দিদি পলাও, সুবালা দিদি, পলাও!" সেই মুহূর্ত্তে সম্মুখ দিক্ হইতে বড়ালমহাশয় চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"সুবালা দিদি, বাঘাকে ছাড়িয়া দাও। শীঘ্র বাঘাকে ছাড়িয়া দাও।"

সুবালা বাঘাকে ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর ফিরিয়া দেখিলেন যে,—সর্বনাশ! একটা হন্যা বা ক্ষিপ্ত শৃগাল নক্ষত্রবেগে তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। তাহার পশ্চাতে ত্রিলোচন, শঙ্করা ও অন্যান্য অনেক লোক লাঠি হাতে করিয়া দৌড়িতেছে। কিন্তু সে দ্রুতগামী ক্ষিপ্ত শৃগালের সহিত কে দৌড়িতে পারে? তাহারা অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিল। সম্মুখ দিকে বড়ালমহাশয়ও অনেক দূরে দৌড়িয়া আসিতেছিলেন। কি পশ্চাতের, কি সম্মুখের কেহই সুবালাকে রক্ষা করিতে পারিত না। তাহারা সেস্থানে পৌঁছিবার পূর্বেই শৃগাল সুবালার উপর পড়িয়া তাঁহাকে দংশন করিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিত। নিকটস্থ কয়েকখানি গ্রামে অনেকগুলি মানুষ ও গরুকে দংশন করিয়া সেই শৃগাল রায়মহাশয়ের বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল। যে সকল মানুষ ও গরুকে সে দংশন করিয়াছিল, তিনমাসের মধ্যে তাহারা সকলেই ভয়ানক জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সেজন্য সুবালাকে যদি হন্যা শৃগাল কামড়াইত, তাহা হইলে বড়ই বিপদ ঘটিত।

বাঘাকে ছাড়িয়া, পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া, সুবালা দেখিলেন যে, শৃগাল তখন প্রায় বিশহাত দূরে রহিয়াছে। কিন্তু এত দ্রুতবেগে সে দৌড়িয়া আসিতেছিল যে, নিমিষের মধ্যে সে সুবালার উপর আসিয়া পড়িত। ভাগ্যে বড়ালমহাশয় বাঘাকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, ভাগ্যে সুবালা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, তাই সুবালার প্রাণরক্ষা হইল। চক্ষুর পলকে বাঘা গিয়া শৃগালের উপর পড়িল। তাহার টুঁটি ধরিয়া দুই চারিবার তাহাকে এ-দিকে ও-দিকে ঝাঁকাইল। সামান্য আঘাতেই ক্ষিপ্ত শৃগালের প্রাণবিয়োগ হয়। তীক্ষ্নদন্ত দ্বারা তাহার গলদেশ ধরিয়া বাঘা যেই তাহাকে দুই চারিবার এ-দিকে ও-দিকে নাড়িল, আর তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল। বাঘা এইরূপ কৌশলে তাহাকে ধরিয়াছিল যে, শৃগাল তাহাকে কামড়াইতে অবসর পায় নাই। কিন্তু শৃগাল যদি দংশন করিত, তাহা হইলে বাঘারও প্রাণসংশয় হইত। পশ্চাৎ ও সম্মুখদিকের লোকসকল আসিয়া মৃত শৃগালের নিকট দাঁড়াইল। ঘোর বিপদ হইতে সুবালা রক্ষা পাইলেন, সেজন্য সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। বাঘাকে সকলে আদর করিতে লাগিল। অস্থি-সম্বলিত ভাল মাংস আনাইয়া রায়-গৃহিণী সেদিন বাঘাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। শৈশবকালে সুবালা বাঘার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, বাঘা এক্ষণে সেই ঋণ পরিশোধ করিল।

অন্ধকার ঘর হইতে খোঁনা স্বরে কে যখন বলিল,—"তুমি আঁমাকে ডাঁকিলে কেঁন?" তখন বাঘা সেইদিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জনে গোঙাইতে লাগিল। "সুবালাকে একেলা ফেলিয়া যাওয়া উচিত নহে," বোধ হয় এইরূপ ভাবিয়া বাঘা সে স্থান হইতে উঠিল না, অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে সে চেষ্টা করিল না।

"বাঘা আমার নিকট আছে," এইরূপ ভাবিয়া সুবালার মনে অনেকটা সাহসের সঞ্চার হইল। তথাপি ভয়ে তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইল, ভয়ে তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইল, ভয়ে তাঁহার হস্তপদ কাঁপিতে লাগিল। মানুষ যতই সাহসী হউক না কেন, বড় বড় বীরপুরুষের মনেও ভূতের নামে কিরূপ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ব্যাঘ্র-ভল্লুকের

সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিতে যাহারা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না, রণক্ষেত্রে অকাতরে যাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে, এরূপ লোকের হৃদয়ও ভূতের ত্রাসে কম্পিত হয়।

———

চতুর্থ অধ্যায়

বড়াল-গৃহিণী

ভাগ্যক্রমে এই সময় বিনয় পেরেক প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইলেন। সুবালার মুখ দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইয়াছে ?"

হাত দিয়া সুবালা অন্ধকার ঘর দেখাইলেন।

ঘোরতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও ঘরে কি ?"

সুবালা উত্তর দিতে না দিতে চোরকুঠরি হইতে খোনা স্বরে শব্দ আসিল,—"এঁ ঘঁরে আঁমি! আঁমি কাঁলাঁ বাঁবাঁ। আমি খাঁদা ভূঁত।"

সাতিশয় আশ্চার্য্যন্বিত হইয়া বিনয় কিছুক্ষণ সেই অন্ধকার ঘরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভীরু বলিয়া বাঙ্গালী জাতির অপবাদ আছে, বিনয় তাহা পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন। সে জন্য তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন যে,—"আমা হইতে যতটুকু হয়, আমি এ অপবাদ দূর করিতে চেষ্টা করিব। প্রাণ থাকে আর যায়, কোন কাজে আমি ভয় করিব না।"

খাঁদা ভূতের ভয়ে তিনি ভীত হইলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, —"দিনের বেলা ভূত! তুমি মানুষ না ভূত ?"

সে উত্তর করিল,—"আমি জীবিঁত মাঁনুষঁ।"

সন্ন্যাসী কালা-বাবা অনেক দিন হইতে খাঁদা ভূত নামে পাঠকদিগের নিকট পরিচিত হইয়াছে। সেজন্য তাহাকে আমরা খাঁদা ভূত বলিয়া ডাকিব। নাসিকাবিহীন হইয়া তাহার স্বর খোনা হইয়া গিয়াছে।

খোনা কথা লিখিতে ও পড়িতে কষ্ট হইবে। সেজন্য সহজ ভাষায় তাহার কথা আমরা এ স্থানে লিখিব।

বিনয় বলিলেন,—"যদি তুমি জীবিত মানুষ, তাহা হইলে ও ঘর হইতে এ ঘরে এস।"

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—"তোমাদের কুকুর আমাকে কামড়াইবে। ঘর হইতে কুকুর বাহির করিয়া দাও।"

সুবালার দিকে চাহিয়া বিনয় আস্তে আস্তে বলিলেন,—"এ আবার এক নূতন ব্যাপার! বৃত্তান্ত কি, জানিলে ভাল হয় না?"

সুবালা বাঘাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। কিন্তু তাঁহাকে এ ভয়ের মাঝে ছাড়িয়া যাইতে বাঘা স্বীকৃত হইল না। সুবালা তাহাকে সঙ্গে লইয়া নীচের তলায় গমন করিলেন। চাকরের নিকট বাঘাকে রাখিয়া, সত্বর তিনি প্রত্যাগমন করিলেন। মাঝের দ্বার দিয়া খাঁদা ভূত তখন সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, নাসিকা-বিহীন, পলিত-কেশ,—বিকট মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি দিনের বেলা দেখিলে ভয় হয়, রাত্রির তো কথাই নাই।

তাহার আকৃতি দেখিয়া বিনয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যথার্থই কি তুমি জীয়ন্ত মানুষ?"

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—"আমাকে বরং তুমি টিপিয়া দেখ।"

ঈষৎ হাসিয়া বিনয় তাহার হাত টিপিয়া দেখিলেন। যথার্থই রক্তমাংসের শরীর বটে!

বিনয় বলিলেন—"তোমার পূর্ব-কাহিনী আমি অনেক শুনিয়াছি। তুমিই সেই কালা বাবা? তুমিই খাঁদা ভূত সাজিয়া এ গ্রামের লোককে উৎপীড়িত করিয়াছিলে? কিজন্য পুনরায় এ স্থানে আসিয়াছ?"

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—"আজ তিনদিন উপবাসী আছি। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় আমার জঠর জ্বলিয়া যাইতেছে; আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। যদি তোমাদের দয়া-ধর্ম থাকে, তাহা হইলে আমাকে প্রথম কিছু আহার প্রদান কর। পরে কথা বলিব।"

সুবালা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিনয় বলিলেন,—"তোমার

পিসীমাকে এখন এখানে আসিতে মানা করিবে। বলিবে যে, পূর্ব দিকের সিঁড়ি দিয়া একজন বাহিরের লোক আসিয়াছে।”

মুড়ি, দুগ্ধ ও গুড় লইয়া অল্পক্ষণ পরে সুবালা ফিরিয়া আসিলেন। আহার করিয়া খাঁদা ভূত পরম পরিতোষ লাভ করিল।

“বিনয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি জন্য এ স্থানে আসিয়াছ? বিনা অনুমতিতে ভদ্রলোকের অন্তঃপুরে কেন প্রবেশ করিয়াছ?”

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—“আমি শুনিয়াছি যে, রায়মহাশয় নামক একব্যক্তি এখন এ বাড়ীর কর্ত্তা। তিনি কোথায়? তাঁহার সহিত আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে।”

বিনয় উত্তর করিলেন,—“রায়মহাশয়ের কাল হইয়াছে।”

খাঁদা ভূত জিজ্ঞাসা করিল,—“তবে এ বাড়ীর এখন কর্ত্তা কে? তাঁহার সহিত আমার অতি আবশ্যকীয় কথা আছে।”

সুবালাকে দেখাইয়া বিনয় উত্তর করিলেন,—“ইনিই এখন এ বাড়ীর কর্ত্রী।”

খাঁদা ভূত জিজ্ঞাসা করিল,—“ইঁহার এখনও বিবাহ হয় নাই?”

বিনয় উত্তর করিলেন,—“না।”

খাঁদা ভূত বলিল,—ইনি ক্ষেত্রজ্ঞা অথবা অম্বিকা কুমারী। শাস্ত্রে বলিয়াছে—‘ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মী দ্বিসপ্তা পীঠনায়িকা; ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ ষোড়শে চাম্বিকা স্মৃতা’।”

খাঁদা ভূত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—“তুমি কে?”

বিনয় উত্তর করিলেন,—“আমি ইঁহাদের বন্ধু! কুটুম্ব বলিলেও চলে।”

সুবালাকে সম্বোধন করিয়া খাঁদা ভূত অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিল,—“মা। আমি ঘোর পাপিষ্ঠ। আমার কথা কিছু না কিছু তুমি শুনিয়া থাকিবে। দয়ার উপযুক্ত পাত্র আমি নই। কিন্তু, মা, আমি বড় দুঃখে পড়িয়াছি। যদি নিজগুণে তুমি আমাকে কৃপা কর, তাহা হইলে কৃতার্থ হই।”

সুবালা উত্তর করিলেন,—“আমি সামান্য বালিকা, আমার নিকট

কেন আপনি ঐরূপ বিনয় করিতেছেন? পাপরূপ বীজ হইতে সকল দুঃখই উৎপন্ন হয়। সুতরাং পাপ-পুণ্যের বিচার করিয়া যদি দয়া করিতে হয়, তাহা হইলে কাহারও প্রতি দয়া করা হয় না। আমি কে যে, পাপ-পুণ্যের বিচার করিব! সে বিচার ভগবান্ করিবেন।”

খাঁদা ভূত বলিল—‘তোমার মুখশ্রী দেখিয়া বোধ হয় যে, তুমি মা, দয়াময়ী। তুমি মা, সাক্ষাৎ ভগবতী। নানা আকারে সেই মহাশক্তি আবির্ভূতা হন। রুধির-বসনা শ্যামারূপে তিনি বিশ্বসংসারকে চর্বণ করেন। [গ্রসনাৎ সর্বসত্ত্বানাং কালদন্তেন চর্বণাৎ। তদ্রক্তসঙ্ঘো দেবেশ্যা বাসোরূপেণ ভাবিতম্।] অন্নপূর্ণারূপে তিনি জীবগণকে আহার প্রদান করেন, আবার জগদ্ধাত্রীরূপে তিনি মাতার ন্যায় সকলকে প্রতিপালন করেন। তুমি মা দয়ারূপিণী মহাশক্তি। তুমি মা, আমার প্রতি কৃপা কর।”

সুবালা বলিলেন,—“আপনার কি উপকার করিতে পারি, তাহা বলুন।”

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—“দিন কয়েকের জন্য আমি ঐ অন্ধকার ঘরে লুক্কায়িত থাকিব। প্রথম, সেই অনুমতি আমি প্রার্থনা করি।”

সুবালা বলিলেন,—“যদি আপনি কাহাকেও বধ করিয়া, অথবা চুরি করিয়া অথবা কোনরূপ দুষ্কর্ম করিয়া এ স্থানে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি করিয়া আপনাকে আমরা আশ্রয় প্রদান করি?”

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—“না, মা! সেরূপ কোন মন্দকর্ম করিয়া আমি আগমন করি নাই। আমাকে আশ্রয় দিলে কাহারও বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হইবে না। বরং তোমার মঙ্গল হইবে।”

সুবালা বলিলেন,—“আপনার দুঃখ দূর করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু দেখুন, আমি সামান্য বালিকা। কর্তৃপক্ষদিগের বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করা আমার উচিত নহে। বড়ালমহাশয়কে আপনি জানেন? এস্থানে তিনি আমার রক্ষক ও অভিভাবক। তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া আমি কোন উত্তর দিতে পারি না।”

খাঁদা ভূত বলিল,—“তবে, মা, তাঁহাকে একবার ডাকিয়া পাঠাও।

আমার প্রতি পূর্বে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু বুঝাইয়া বলিলে, এখন বোধ হয়, আমার এ প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইবেন।"

সুবালা বলিলেন,—"বড়ালমহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। প্রাতঃকালে তিনি কাজে গিয়াছিলেন। দুই প্রহরের পর বাটী প্রত্যাগমন করিয়া আহারাদি করিয়া একটু শয়ন করিয়াছেন। এখন তাঁহাকে আমি ডাকিব না। একঘণ্টা পরে তিনি আপনি উঠিবেন। তখন তাঁহাকে ডাকিয়া আনিব।"

চুপ করিয়া বিনয় দুইজনের কথোপকথন শুনিতেছিলেন ও মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি উঠিয়া ঘরের বাহিরে বারান্দায় গমন করিলেন। সে স্থানে সুবালাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নিতান্তই কি তুমি উইল সম্বন্ধে তদন্ত করিবে? উইল সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিয়া আর আবশ্যক কি? এ সম্পত্তি যদি আইনানুসারে তোমার না হয়, তাহা হইলে বিজয়বাবুর হইবে। কিন্তু বিজয়বাবু বড়ালমহাশয়কে লিখিয়াছেন যে এ সম্পত্তিতে তাঁহার প্রয়োজন নাই। তিনি কোনরূপ আপত্তি করিবেন না। আর আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, উইল যদি কৃত্রিমও হয়, তাহা হইলে তোমাকে বঞ্চিত করিয়া কিছুতেই তিনি এ বিষয় লইবেন না। তবে উইলের কথা তুলিয়া আর আবশ্যক কি?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"সত্য কি, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। যতদিন তাহা না জানিতে পারি ততদিন আমার প্রাণ সুস্থির হইবে না। মূহুর্মুহুঃ আমি মনে করিতে থাকিব যে, পরের ধন আমি অপহরণ করিতেছি। বিজয়বাবু কি করিবেন, না করিবেন, সে কথায় আমার প্রয়োজন কি? আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই আমি করিব।"

বিনয় বলিলেন,—"[illegible] এতক্ষণ চিন্তা করিয়া আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি। খাঁদা-ভূতের দ্বারা বড়ালনীকে ভয় দেখাইব, ভয় দেখাইয়া তাঁহার মুখ হইতে সকল কথা বাহির করিব।"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"না তাহা হইবে না। বড়াল-দিদিকে ভয় দেখাইতে পারিবে না।"

বিনয় বলিলেন,—"তবে কি করিয়া আমি প্রকৃত তত্ত্ব বাহির করিব। কৃত্রিম পুলিসের লোক তুমি আনিতে দিবে না। বড়ালনীকে একটু ভয় দেখাইতে দিবে না। যদি কোনরূপ প্রতারণা থাকে, তাহা হইলে তুমি কি মনে করিয়াছ যে, বড়ালনী সহজে তাহা প্রকাশ করিবেন? কিছুতেই নহে। এ বিষয়ে তুমি আর কোন আপত্তি করিও না, একটু ভয় পাইলে তোমার বড়াল-দিদি গলিয়া যাইবেন না।"

সুবালা চুপ করিয়া রহিলেন। দুইজনে পুনরায় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

খাঁদা ভূতকে সম্বোধন করিয়া বিনয় বলিলেন,—"একঘণ্টা পরে বড়ালমহাশয় আসিলে, তোমার সম্বন্ধে যাহা হউক একটা স্থির হইবে। আপাততঃ সামান্য একটু তুমি ইহার উপকার করিবে?"

খাঁদা ভূত জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি ইহার উপকার করিব! আমি ইহার কি উপকার করিতে পারি?"

বিনয় বলিলেন,—"কোন একটি গোপনীয় বিষয় ইনি জানিতে ইচ্ছা করেন। বড়ালনী বোধ হয় তাহা অবগত আছেন; কিন্তু সহজে তিনি তাহা প্রকাশ করিবেন না। খাঁদা ভূত সাজিয়া তাঁহাকে একটু ভয় দেখাইতে হইবে। ভয়ে তিনি হয় তো সে কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিবেন।"

ঈষৎ হাসিয়া খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—"বড়ালনীকে একটু ভয় দেখাইলে যদি ইহার উপকার হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তাহা করিব। কুমারীকে সন্তুষ্ট করিলে মানুষ অক্ষয় পুণ্য লাভ করে;—'পূজিতাঃ প্রতিপূজ্যন্তে নির্দ্দহন্ত্যবমানিতা। কুমারী যোগিনী সাক্ষাৎ, কুমারী পরদেবতা।' যাহারা কুমারী পূজা করে, তাহারা সর্বত্র পূজনীয় হয়। কুমারীকে অবজ্ঞা করিলে দেবী সবংশে তাহাকে ধ্বংস করেন; কারণ কুমারীই সাক্ষাৎ যোগিনী, কুমারীই সাক্ষাৎ পরম দেবতা। আবার জ্ঞানার্ণবে উক্ত হইয়াছে,—'কুমারীপূজয়া দেবি ফলং কোটিগুণং ভবেৎ। পুষ্পং কুমার্য্যৈ যদ্দত্তং তন্মেরুসদৃশং ফলম্॥' কুমারীপূজা দ্বারা কোটিগুণ ফললাভ হয়। কুমারীকে একটি পুষ্প দান করিলেও সুমেরুসদৃশ পুষ্পদানের ফল হয়।"

বিনয় বলিলেন,—"তবে তুমি পুনরায় অন্ধকার ঘরে গমন কর বড়ালনীকে আমি ডাকিতে পাঠাই। চুপি চুপি আমি তাঁহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিব। তিনি যদি না বলেন, তাহা হইলে আমি সঙ্কেত করিব। তখন প্রথম তুমি কথায় ভয় দেখাইবে। তাহাতেও যদি তিনি না বলেন, তাহা হইলে পুনরায় আমি সঙ্কেত করিব। তখন এই মাঝের দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া তুমি তাঁহাকে ভয় দেখাইবে।"

খাঁদা ভূত অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। বিনয় মাঝের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর বারান্দাতে গিয়া বড়ালনীকে ডাকিবার নিমিত্ত একজন চাকরকে তিনি আদেশ করিলেন।

বড়ালনী উপস্থিত হইলেন। বসিবার নিমিত্ত সুবালা মাদুর পাতিয়া দিলেন। সুবালা বলিলেন,—"বড়াল-দিদি! এই ঘরে দিদিমণি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ছবি আমি এই ঘরে রাখিব। ভাল হইবে না? বড়াল-দিদি!"

বিনয় বলিলেন,—"চুপি চুপি কথা কহ। ঐ অন্ধকার ঘরে কে আছে। সে যেন শুনিতে না পায়।"

বড়ালনী চুপি চুপি বলিলেন,—"ছবি এখানে রাখিলে উত্তম হইবে।"

সুবালাও আস্তে আস্তে কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শেষ অবস্থায় দিদিমণি আমার নাম করিতেন?"

বড়ালনী উত্তর করিলেন,—"তোমার নাম করিবেন না? তোমার নাম তাঁহার জপমালা হইয়াছিল। তোমাকে বিষয় লিখিয়া দিতে পারিলেন না, সেজন্য তাঁহার দুঃখের সীমা ছিল না।"

বিনয় সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উইলে তবে কে সহি করিয়াছিল?"

অন্যমনস্কভাবে বড়ালনী বলিয়া ফেলিলেন,—"কেন, আমি—"

এই কথা বলিয়াই তিনি চমকিত হইলেন। কথা ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন,—"তা, এ সকল বিষয় আমি কি জানি, বল। আমি স্ত্রীলোক। আমরা গরিব মানুষ। উইলের কথা আমরা

কি জানি। যখন উইল হয়, তখন আমি সে স্থানে উপস্থিত ছিলাম না। ডাক্তারের সম্মুখে বাহির না হইলে চলিত না। সেজন্য তাঁহার সম্মুখে বাহির হইতাম। উইল করিবার সময় দুইজন উকিল উপস্থিত ছিলেন। আমি সে স্থানে ছিলাম না। কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে, উকিল উইল লিখিয়াছিলেন, রায়-গৃহিণী তাহাতে সহি করিয়াছিলেন।"

পঞ্চম অধ্যায়
প্রকৃত বিবরণ

বিনয় বলিলেন,—"বড়াল-দিদি! আর গোপন করা চলিবে না। এখন সামান্য একটু কথার সূচনা হইয়াছে, ক্রমে সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তখন বড় বিপদ ঘটিবে; এমন কি, এ বিষয়ে যাঁহারা লিপ্ত আছেন, তাঁহাদিগকে হয়তো জেলে যাইতে হইবে। তুমি স্ত্রীলোক, তোমার বয়স হইয়াছে। এই বৃদ্ধবয়সে তোমাকে এবং বড়ালমহাশয়কে যদি জেলে যাইতে হয়, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে।"

বড়ালনীর হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু মুখে তিনি বলিলেন, —"আমি কি জানি, ভাই! আমি কি বলিব? আমাকে জেলে দিতে হয়, দাও; কাটিয়া ফেলিতে হয়, ফেল; আমি কিছুই জানি না।"

বিনয় সঙ্কেত করিলেন। অন্ধকার ঘর হইতে খোঁনা স্বরে কে বলিয়া উঠিল,—"বঁল, বঁল, সত্যঁ কঁথা বঁল. না বঁলিলে এখনি তোঁর ঘাঁড় মটকাঁইব।"

বিনয় বলিলেন,—"সর্বনাশ!"

বড়ালনী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। পুনরায় অন্ধকার ঘর হইতে শব্দ আসিল,—"বল বল, সত্য কথা বল, না বলিলে তোকে খাইয়া ফেলিব।"

বিনয় বলিলেন,—"সর্বনাশ! খাঁদা ভূত!"

বড়ালনী তথাপি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

বিনয় পুনরায় সংকেত করিলেন। মাঝের দ্বার অল্প খুলিয়া খাঁদা ভূত আসিয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইল। বড়ালনীর কথা দূরে থাকুক, এখন তাহার সেই ত্রিভঙ্গ-মুরারি বিকট রূপ দেখিয়া সুবালারও মুখ শুষ্ক হইয়া গেল।

কাঁপিতে কাঁপিতে অপরিস্ফুট স্বরে বড়ালনী বলিলেন—"উহাকে সরিয়া যাইতে বল। ঐ দেখ, হাঁ করিতেছে। চপলার মতো আমাকে আস্তো গিলিয়া ফেলিবে। আমি সকল কথা বলিতেছি। তাহার পর আমার কপালে যাহা থাকে, তাহাই হইবে।"

খাঁদা ভূতকে সরিয়া যাইবার নিমিত্ত বিনয় আদেশ করিলেন। দ্বারের নিকট হইতে খাঁদা ভূত সরিয়া গেল। বিনয় পুনরায় দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

সুবালা বলিলেন,—"বড়াল-দিদি! শৈশবকাল হইতে তোমরা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছ; প্রাণ থাকিতে তোমাদের কোন অনিষ্ট হইতে আমি দিব না। নির্ভয়ে সমস্ত কথা বল। তোমার কোন ভয় নাই।"

বড়ালনী উত্তর করিলেন,—"সুবালা দিদি! ভাল বল, মন্দ বল, যাহা আমরা করিয়াছি, সে কেবল তোমার মঙ্গলের জন্যই করিয়াছি। তোমার দিদিমণি বুঝিয়াছিলেন যে, উইল করিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইবে। যাহা কিছু আমরা করিয়াছি, তাঁহার আজ্ঞাক্রমেই করিয়াছি। তিনি এই কাজ করিবার নিমিত্ত কিরূপ কাতরস্বরে আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা যদি দেখিতে, তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে দোষ দিতে না। আমি লেখাপড়া জানি না। নিজের কাছে বসাইয়া তাঁহার মতো স্বাক্ষর করিতে শিখিবার নিমিত্ত প্রতিদিন তিনি আমাকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। প্রতিদিন তাঁহার কাছে বসিয়া শত শত বার তাঁহার নাম আমাকে লিখিতে হইত। তাহার পর সেই কাগজ তাঁহার সাক্ষাতে আমি পোড়াইয়া ফেলিতাম। উইলের সময় তিনি জীবিত ছিলেন না। রায়-গৃহিণী সাজিয়া আমি এই খাটের উপর শয়ন করিয়াছিলাম। উইলে আমি সহি করিয়াছিলাম। যাহা করিয়াছি, তাঁহার

আত্মসাৎ করিয়াছি, আর সুবালা দিদি! তোমার ভালর জন্যই করিয়াছি। সকল কথা বলিয়া ফেলিলাম। এখন আমাদিগকে রাখিতে হয় রাখ; মারিতে হয় মার; যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা কর।”

দিদিমণির জন্য সুবালা কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিনয় বলিলেন,—“কাঁদিলে আর কি হইবে। বড়ালমহাশয়কে এখন ডাকিতে পাঠাও। এতক্ষণে তিনি বোধ হয় উঠিয়া থাকিবেন। তিনি আসিলে প্রথমে তাঁহাকে উইলের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। তাহার পর খাঁদা ভূতের কথা।”

চক্ষু মুছিতে মুছিতে সুবালা বাহিরে গিয়া বড়ালমহাশয়কে ডাকিতে পাঠাইলেন। বড়ালমহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিনয় বলিলেন,—“আস্তে আস্তে কথা কহিবেন। ঐ অন্ধকার ঘরে একজন আছে। সে যেন আমাদের কথা শুনিতে না পায়। আমরা সকল কথা শুনিয়াছি। আর গোপন করা বৃথা। সুবালার নামে যে উইল হইয়াছে, তাহা প্রকৃত নহে।”

সকোপ নয়নে পত্নীর দিকে দৃষ্টি করিয়া বড়ালমহাশয় বলিলেন,—“কে বলে যে উইল প্রকৃত নহে? দুইজন উকিলের সাক্ষাতে সে উইল হইয়াছিল। সুবালা দিদির সহিত তোমার বিবাহ হইবে, তাহাই জানি। এই সম্পত্তির তুমি একদিন অধিকারী হইবে, তাহাই জানি। সুবালা দিদির সহিত শত্রুতা করিয়া তুমি যে তাঁহাকে এই সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিবে, স্বপ্নেও তাহা ভাবি নাই।”

বিনয় উত্তর করিলেন,—“সুবালার আমি অনিষ্ট করিব না। উইল প্রকৃত হউক অথবা নাই হউক, সুবালার কোন অনিষ্ট হইবে না। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, সুবালার কোন অনিষ্ট হইবে না। তবে প্রকৃত ঘটনা কি হইয়াছিল, সুবালা তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন। জাল উইল প্রস্তুত করা সামান্য অপরাধ নহে। আমার বোধ হয়, ধনুকধারী সকল কথা অবগত আছে। ধনুকধারীকে বিশ্বাস করিবেন না। তাহার কথাতেই সুবালার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সমস্ত বিষয় সাধারণের নিকট প্রকাশ হইলে

বিপদ ঘটিতে পারে। কি ঘটিয়াছিল, একমাত্র আমরা জানিয়াছি। কিন্তু বিস্তারিত বিবরণের জন্য বড়ালদিদিকে আমরা উৎপীড়িত করিতে ইচ্ছা করি না। সেই জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।”

সুবালা বলিলেন,—“বড়ালমহাশয়! পিতাকে আমি জানি না। আমি যখন শিশু, তখন তাঁহার পরলোক হইয়াছিল। তাহার পর বড় ভগিনী ও মাতাও আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। পিতা-মাতার ন্যায় স্নেহ-মমতা করিয়া আপনারাই আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। তাহার পর এই উইলও আমার মঙ্গলের জন্যই আপনারা করিয়াছেন। আমি যে আপনাদের অনিষ্ট করিব, সে চিন্তা মনেও স্থান দিবেন না।”

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—“তুমি আমার মন্দ করিবে, সে ভয় আমার হয় নাই। পাছে তুমি আমাদের সমুদয় পরিশ্রম বিফল কর, সেই ভয় আমার হইতেছে। বাল্যকাল হইতে তোমাকে আমি জানি। সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় ধনরত্ন যদি এক দিকে হয়, আর সত্য যদি অপর দিকে হয়, তাহা হইলে সেই ধনরত্নকে তুচ্ছ করিয়া, সত্যকেই তুমি গ্রহণ করিবে। সুবালা দিদি! যাহা শুনিয়াছ, তাহা শুনিয়াছ; আর অধিক কথা জানিয়া আবশ্যক নাই।”

সুবালা উত্তর করিলেন,—“যাহা শুনিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট; তবে অকারণ কেন আপনি বিস্তারিত বিবরণ গোপন করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। এখন বলুন, কবে দিদিমণির পরলোক হইয়াছিল, উইলই বা কবে হইয়াছিল?”

কিছুক্ষণ নীরবে বড়ালমহাশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—“যখন সকল কথা শুনিয়াছ, তখন আর গোপন করা বৃথা। ১৮ই শ্রাবণ অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার দুইদিন পূর্বে তোমার দিদিমণির মৃত্যু হইয়াছিল। ২২শে শ্রাবণ উইল হইয়াছিল।”

বিনয় বলিলেন,—“আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ সুবালা জানিতে ইচ্ছা করেন।”

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন, –“এ সম্বন্ধে অধিক কথা কিছু নাই।

শ্রাবণ মাসের প্রথমে চিকিৎসকগণ জবাব দিল। সকলে বলিল যে, সম্ভবতঃ সাত-আট দিনের মধ্যে রোগিণীর মৃত্যু হইবে। রায়-গৃহিণী নিজেও বুঝিলেন যে, তাঁহার আয়ু শেষ হইয়াছে। আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। যদি কোন প্রতিকার করিতে পারি, সেজন্য আমি কলিকাতায় গমন করিলাম। সেস্থানে সেই নূতন চিকিৎসকের সন্ধান পাইলাম। সকলে বলিল যে, সন্ন্যাসিপ্রদত্ত স্বপ্নলব্ধ নানারূপ ঔষধ তিনি অবগত আছেন। ডাক্তার-বৈদ্য কর্তৃক পরিত্যক্ত অনেক পীড়িত ব্যক্তির প্রাণ তিনি রক্ষা করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে লইয়া আসিলাম। রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার-বৈদ্যগণ যাহা বলিয়াছিলেন তিনিও তাহাই বলিলেন। ২০শে শ্রাবণ পর্যন্ত জীবিত থাকা সম্ভব নহে, রায়গৃহিণীকেও তাহা বোধ হয় তিনি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন। রোগিণী ও চিকিৎসক দুইজনে ফুস্ ফুস্ করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। দিন দুই পরে, একদিন রায়-গৃহিণী আমাকে বলিলেন—'বড়ালমহাশয়! আমার একটি কথা রাখিতে হইবে। আমার নিকট একটি সত্য করিতে হইবে।' ডাক্তার সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি সত্য করিতে হইবে?' রায়-গৃহিণী উত্তর করিলেন,—'উইলের সময় পর্যন্ত যদি আমি জীবিত না থাকি, তাহা হইলে সুবালা যাহাতে সম্পত্তি পায়, তাহা আপনাকে করিতে হইবে। সে কার্যে ডাক্তারমহাশয় আপনার সহায়তা করিবেন।' আমি উত্তর করিলাম,—'কি করিয়া তাহা আমি করিব? আমি সামান্য ব্যক্তি। আমার ক্ষমতা কি?' ডাক্তার বলিলেন,—ধনবান লোকদিগের ঘরে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। আমি উইল করিব, ধনবান লোক এইরূপ মানস করেন। আজ করিব কাল করিব, বলিয়া দিনপাত করিতে থাকেন। অবশেষে হঠাৎ একদিন তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার কর্মচারিগণ অথবা আত্মীয়-স্বজন একখানি উইল প্রস্তুত করেন। ইহাতে কোন পাপ নাই। কারণ, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, উইল সেই ভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইবে। রায়মহাশয় যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ইনি এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন, উইল ঠিক সেইরূপ হইবে।

ভগবান্ করুন, ইহার অবর্তমানে আমাদিগকে এ কাজ না করিতে হয়। অদ্য আমি যে ঔষধ প্রদান করিয়াছি, তাহার গুণে ইনি হয়তো অনেক দিন জীবিত থাকিবেন।"

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"প্রথম রায়-গৃহিণীর কাকুতি-মিনতি, তাহার পর সুবালা দিদির মঙ্গল কামনা—আমি সম্মত হইলাম। রায়গৃহিণীর নিকট আমি সত্য করিলাম। বলিলাম—যে কার্য করিলে সুবালা দিদির মঙ্গল হইবে, প্রাণপণে আমি সে কার্য করিব। তাহার জন্য আমাকে যদি কারাবাসে যাইতে হয়, তাহাও স্বীকার। কিন্তু ভয় এই—রায়মহাশয় কিরূপ উইল করিয়া গিয়াছেন, সেকথা চাকর-বাকর, গ্রামের লোক, রায়মহাশয়ের ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেই অবগত আছে। কবে ইঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবে, সকলে তাহা শুনিয়াছে। অতএব তাহার পূর্বে যদি কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে, তাহা হইলে কি হইবে?"

ডাক্তার উত্তর করিলেন,—"সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা নাই। আমরা তাহা গোপন রাখিব।"

"সেইদিন হইতে রোগিণীর নিকট বাহিরের লোক কেহ যাইতে পাইত না। কেবল ডাক্তার, আমি, আমার স্ত্রী ও ধনুকধারী, এই কয়জনে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতাম। তোমার দিদিমণি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারের আদেশে কলিকাতা হইতে প্রতিদিন দুই মণ বরফ আসিতে লাগিল। কাশিরোগের চিকিৎসার জন্য শীতল বরফ! সকলে আশ্চর্য হইল, কিন্তু কেহ কিছু বলিল না। ডাক্তার বরফ ব্যবহার করিতেন না। ঐ অন্ধকার ঘরে পড়িয়া বৃথা গলিয়া যাইত। ডাক্তারের আজ্ঞায় চারি হাত লম্বে ও দুই হাত প্রস্থে একটি কাঠের বাক্স আমি প্রস্তুত করাইলাম। তাহাও তিনি ঐ অন্ধকার ঘরে রাখিয়া দিলেন।"

বড়ালনী বলিলেন,—"কি করিয়া তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিতে হয়, এই সময় রায়-গৃহিণী আমাকে শিক্ষা দিতেছিলেন।"

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"হাঁ, পূর্ব হইতেই তিনি নিজে স্থির

করিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার স্ত্রী উইলে সহি করিবেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। ১৮ই শ্রাবণ সন্ধ্যাকালেও তিনি গল্প করিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার নাড়ী ছাড়িয়া গেল, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতে লাগিল। প্রবল শ্বাসের ভিতরও তিনি বলিতেছিলেন,—'আমি চলিলাম। দেখিবেন, যাহা বলিয়াছি, তাহার যেন অন্যথা না হয়, সুবালা যেন এই সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হয়। এইজন্যই সুবালাকে আমি তাড়াতাড়ি তাহার কাকার বাড়ি পাঠাইয়া দিলাম। সুবালা এ স্থানে থাকিলে আপনারা কিছুই করিতে পারিতেন না। আমার কি সাধ নহে যে, সুবালার চাঁদ মুখখানি দেখিতে প্রাণত্যাগ করি!' বিনয়বাবু, তোমার নামও তিনি অনেকবার করিয়াছিলেন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

বড়ালমহাশয়ের কথা

বড়ালমহাশয় বলিতেছেন,—"রায়-গৃহিণীর প্রাণত্যাগ হইলে, ডাক্তারের আদেশে তাঁহার মৃতদেহ আমরা সেই বাক্সের ভিতর রাখিলাম। উপরে ও নীচে বরফ দিয়া বাক্সটি পূর্ণ হইল। সেজন্য মৃতদেহ নষ্ট হইল না। ডাক্তার কেন যে আমাকে কাঠের বাক্স প্রস্তুত করাইতে বলিয়াছিলেন ও কেন যে তিনি কলিকাতা হইতে প্রতিদিন দুই মণ বরফ আনাইতেছিলেন, তাহার মর্ম এখন বুঝিতে পারিলাম। রায়-গৃহিণীর যে পরলোক হইয়াছে, কেহই তাহা জানিতে পারিল না। মৃত্যুর চারিদিন পূর্বে তাঁহাকে আমরা এই ঘরে আনিয়াছিলাম। ডাক্তার, আমি, আমার গৃহিণী ও ধনুকধারী পূর্বের ন্যায় সর্বদা এই ঘরে বসিয়া থাকিতাম। পূর্বের ন্যায় যথাসময়ে এই ঘরে রোগিণীর পথ্যাদি আসিতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুর তিনদিন পরে উইল হইল। উইলের পরদিন আমরা তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করিলাম ও যথাবিধি তাঁহার

মৃতদেহের সৎকার করিলাম। রায়মহাশয়ের পরলোক হইলে বিজয়বাবুকে আমি পত্র লিখিয়াছিলাম। সেই পত্রের তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে আমি বুঝিলাম যে এ সম্পত্তি তিনি একেবারেই গ্রাহ্য করেন না। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি আসিবেন না। সেজন্য এবারও আমি তাঁহাকে পত্র লিখিলাম যে, আপনার ভ্রাতৃজায়ার বয়ঃক্রম শীঘ্রই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবে। তিনি উইল করিবেন। সে সময় আপনি উপস্থিত থাকেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। বিজয়বাবু নিজে না আসিয়া একজন উকিল পাঠাইয়া দিলেন। আমার গৃহিণী সমুদয় শরীর ঢাকিয়া রোগিণী সাজিয়া ঐ খাটে শয়ন করিলেন; রায়মহাশয় ও রায়-গৃহিণীর আজ্ঞায়, সুবালা দিদির মঙ্গলকামনায়, আমরা এই উইল প্রস্তুত করিলাম।"

দিদিমণির মৃতদেহ বাক্সর ভিতর বরফ দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল, সেই কথা শুনিয়া সুবালা বড়ই কাঁদিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার নিমিত্ত বড়ালমহাশয়কে বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে ডাক্তারকে কত টাকা দিতে হইয়াছিল?"

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—"অধিক নহে। রায়-গৃহিণী নিজে তাঁহাকে আড়াই শত টাকা দিয়াছিলেন। তাহার পর আমি তাঁহাকে আর আড়াই শত টাকা দিয়াছিলাম। খাতায় চিকিৎসা খরচ বলিয়া তাহা লেখা আছে।"

তাহার পর সুবালার দিকে দৃষ্টি করিয়া বড়ালমহাশয় পুনরায় বলিলেন,—"সুবালা দিদি! বৃথা রোদন করিও না। তোমার দিদিমণির প্রাণরক্ষা করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা সম্বন্ধেও কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। সকলেই আমরা প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়াছিলাম। কয়দিন তাঁহাকে বরফে রাখিতে হইয়াছিল সত্য, কিন্তু নিরুপায় হইয়া আমাদিগকে এ কাজ করিতে হইয়াছিল।"

বিনয় বলিলেন,—"তাহাতে আর দোষ কি? বশিষ্ঠ মুনি মহারাজ দশরথের মৃতদেহকে কিরূপে রাখিয়াছিলেন, তাহা একবার স্মরণ করিয়া দেখ।"

সুবালা একটু স্থির হইলে, বড়ালমহাশয় পুনরায় বলিলেন,—"এ সমুদয় কথা আমার বোধ হয় কিছুতেই প্রকাশ হইত না। ডাক্তারের উপদেশে সমুদয় কার্য হইয়াছিল। তিনি প্রকাশ করিবেন না। ভয় কেবল ধনুকধারীকে। আমি বিলক্ষণ জানি যে, সে ভাল লোক নহে। কিন্তু ধনুকধারীও এ কার্যে সম্পূর্ণ লিপ্ত ছিল। আদালতে দণ্ডের ভয়ে সেও বোধ হয় এ কথা প্রকাশ করিবে না। উকিল দুইজন কখনও রায়-গৃহিণীকে দর্শন করেন নাই। তাঁহারা কিছু বুঝিতে পারেন নাই। বাকী আমরা দুইজন। তোমরা যদি আমাদিগকে উৎপীড়িত না করিতে, তাহা হইলে আমরা কখনও এ সম্বন্ধে একটিও কথা মুখ দিয়া বাহির করিতাম না। সকল বিবরণ এক্ষণে শ্রবণ করিলে; কিন্তু তাহাতে কি লাভ হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। এক্ষণে আমার অনুরোধ এই যে, এ কথা আর কেহ যেন না জানিতে পারে। সুবালা দিদি সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছেন। অগ্রহায়ণ মাস আসিলে তুমিও ইহার অধীশ্বর হইবে। সে সম্বন্ধেও রায়গৃহিণী আমাকে বার বার সত্যে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, তোমরা দুইজনে সুখে-স্বচ্ছন্দে এই সম্পত্তি ভোগ করিতে থাক। বিনয়বাবু! এই উইলে তোমার সম্পূর্ণ স্বার্থ রহিয়াছে। দেখিও, যেন এ কথা আর অধিক প্রকাশ হয় না।"

ঈষৎ হাসিয়া বিনয় বলিলেন,—"উইলে আপনার কিঞ্চিৎ স্বার্থ আছে।"

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—"ঐ এক হাজার টাকার কথা বলিতেছ? আমাকে এক হাজার টাকা দিবার নিমিত্ত রায়মহাশয় অনুমতি করিয়াছিলেন। যে রাত্রিতে কালা-বাবার নাসিকা ছেদন হয়, সেই রাত্রিতে রাজাবাবুও আমাকে এক হাজার টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন। অন্তত: এক হাজার টাকা মূল্যের একখানি সোনার ইট দিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।"

আশ্চর্য হইয়া কিছু উচ্চৈঃস্বরে বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সোনার ইট! সে আবার কি?"

আর চুপি চুপি কথা না কহিয়া, বড়ালমহাশয়ও সহজ স্বরে উত্তর করিলেন,—"রাজাবাবু সকল বিষয়ে বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন। কিন্তু টাকা-কড়ি সম্বন্ধে তাঁহার ভাব অনেকটা সেকালের লোকের ন্যায় ছিল। একবার তাঁহার অনেকগুলি মূল্যবান্ নোট ও খানকয়েক কোম্পানির কাগজ উইপোকায় নষ্ট করিয়াছিল। সেই অবধি তিনি নোট অথবা কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিতেন না। লম্বা লম্বা ছোট ছোট সোনার ইট গড়াইয়া তিনি রাখিয়া দিতেন। চৌকোণা কাষ্ঠখণ্ড দেখিয়াছ? ইটগুলির আকৃতি ঠিক সেইরূপ ছিল। অথবা কাপড়-কাচা বিলাতি সাবান—যাহাকে বার-সোপ বলে, ইটগুলি সেইরূপ ছিল; তবে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল। এইরূপ অনেক টাকার ইট তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হাজার টাকার সেইরূপ একখানি ইট তিনি আমাকে দিবেন বলিয়াছিলেন।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যখন এ বাটী পরিত্যাগ করিয়া তিনি বিদেশে গমন করিলেন, তখন সেই ইট তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন?"

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—"না, সে ইট এই বাড়িতে কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে। পূর্বে বলিয়াছি যে, টাকা-কড়ি সম্বন্ধে তাঁহার ভাব অনেকটা সেকালের লোকের মতো ছিল। বোধ হয়, কোন স্থানে সেই সমুদয় ইট তিনি পুঁতিয়া রাখিয়াছেন, অথবা কোনরূপ নূতন উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি তাহা লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। সুবালা দিদি রাগ করিও না। আমি ভাবিলাম যে, এ কথা যদি প্রকাশ করি, তাহা হইলে রায়মহাশয়ের আজ্ঞায় সকলে এ বাড়ি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবে। একটি পয়সাও আমি পাইব না। সেজন্য আমি নিজেই চুপি চুপি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে করিলাম যে, যদি পাই, তাহা হইলে একখানি ইট রাখিয়া বাকীগুলি রায়মহাশয়কে প্রদান করিব। এই বাড়ির অনেক ঘরের মেজে খুঁড়িয়া দেখিয়াছি, অনেক ঘরের দেয়াল ভাঙিয়া দেখিয়াছি, বাগানে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি; ফলকথা খুঁজিতে আমি কিছু বাকী রাখি নাই, কিন্তু সে ইটের আমি সন্ধান পাই নাই। যাহা হউক, এতদিন পরে এ কথা আজ আমি

প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে প্রকাশ্যভাবে পুনরায় অনুসন্ধান করিব।"

অন্ধকার ঘর হইতে খোনা স্বরে শব্দ আসিল,—"সে সোনার ইট আঁমার। রাঁজাবাঁবু আঁমাকে দিঁয়াছেন।"

চমকিত হইয়া বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও কে?"

একটু হাসিয়া বিনয় উত্তর করিলেন,—"খাঁদা ভূত।"

ঘোরতর বিস্মিত ও ভীত হইয়া বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"খাঁদা ভূত! দিনের বেলা খাঁদা ভূত!"

বিনয় হাসিতে লাগিলেন। সুবালার মুখে এইবার একটু হাসি দেখা দিল। বড়ালনী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

মাঝের দ্বার খুলিয়া বিনয় বলিলেন,—"খাঁদা ভূত! এই স্থানে এস।"

খাঁদা ভূত আসিয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইল। বড়ালমহাশয় এক দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন, সে-ও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অবশেষে বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জীয়ন্ত মানুষ, না ভূত?"

বিনয় উত্তর করিলেন,—"জীয়ন্ত মানুষ। কালা-বাবা মরে নাই, ইনিই সেই কালা-বাবা।"

বিনয়ের দিকে চাহিয়া বড়ালনী বলিলেন,—"বটে! আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি অতি ভাল মানুষ; মিছামিছি ভয় দেখাইতেছিলে!"

বিনয় ঈষৎ হাস্য করিলেন।

বড়ালমহাশয় খাঁদা ভূতকে বলিলেন,—"কি মনে করিয়া পুনরায় আসিয়াছ, বাপু? রাজাবাবুর সংসার ছারেখারে দিয়াছ। রায়মহাশয়ের সর্বনাশ করিয়াছ। আবার কি মনে করিয়া আসিয়াছ, বাপু?"

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—"রাজাবাবু সম্বন্ধে আমাকে দোষী বলিলেও বলিতে পার। কিন্তু রায়মহাশয়ের আমি কি করিয়াছি? শুনিয়াছি যে, কে একজন রায়মহাশয় আসিয়া এই বিষয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন। আরও শুনিয়াছি যে, কয়েক বৎসরের ভিতর তাঁহার পরিবারের অনেকগুলি লোক মারা গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার

দোষ কি? যাহাদের কাল পূর্ণ হইয়াছিল, তাহারা মরিয়া গিয়াছে।"

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শাঁকচুন্নি আনিয়া এ গ্রামে ছাড়িয়াছিলে কেন?"

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—"শাঁকচুন্নি! শাঁকচুন্নি আমি কোথায় পাইব?"

বড়ালমহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গরীব চপলাকে তুমি খাইয়াছ কেন?"

বিস্মিত হইয়া খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—"চপলা! কে?"

বড়ালমহাশয় ভাবিলেন, সত্য বটে। এ যদি জীবিত মানুষ, ভূত নহে, তাহা হইলে চপলাকে ও কি করিয়া ভক্ষণ করিবে? সেজন্য সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া তিনি অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এইমাত্র বলিলে যে, রাজাবাবু তোমাকে সোনার ইটগুলি দিয়াছেন, রাজাবাবুর সহিত তোমার কোথায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—"রাজাবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই, তাঁহার ভূতের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।"

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"তাঁহার ভূতের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল! সে কিরূপ কথা?"

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—"সে অনেক কথা। যদি শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে গোড়া হইতে সকল বিবরণ আপনাদিগকে আমি প্রদান করি।"

সপ্তম অধ্যায়
খাঁদা ভূতের কাহিনী

খাঁদা ভূতের বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল জন্মিয়াছিল। বিনয় তাহাকে বসিতে বলিলেন। উপবেশন করিয়া সে আপনার বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল।—

খাঁদা ভূত বলিল,—"বড়ালমহাশয়! কিরূপ অবস্থায় এ স্থানে প্রথম আমি আগমন করি, তাহা তুমি অবগত আছ। আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, নানা দেশে আমরা ভ্রমণ করি। এই গ্রামের কিছু উপরে ডোঙ্গা উল্টাইয়া পড়িল। নদীতে তখন বান আসিয়াছিল। প্রবল স্রোতে ভাসাইয়া তোমাদের বাগানের নিম্নে আমাকে ফেলিয়া দিল। তখন আমার জ্ঞান ছিল না, কিন্তু আমি জীবিত ছিলাম। আমরা সন্ন্যাসী, দেবতাগণ দ্বারা রক্ষিত, সহজে আমাদের মৃত্যু হয় না।

অরক্ষিতং তিষ্ঠতি দৈবরক্ষিতং
সুরক্ষিতং দৈবহতং বিনশ্যতি।
জীবত্যনাথোঽপি বনে বিসর্জিতঃ,
কৃতপ্রযত্নোঽপি গৃহে বিনশ্যতি ॥

অর্থাৎ দেবতা দ্বারা রক্ষিত হইলে নিঃসহায় লোকও রক্ষা পায়। দেবতা দ্বারা হত হইলে সুরক্ষিত লোকও বিনাশ পায়। বনে বিসর্জিত অনাথও জীবিত থাকে, কিন্তু অনেক যত্ন সত্ত্বেও মানুষ গৃহে বিনষ্ট হয়।

যাহা হউক, রাজাবাবুর গৃহে আমি বাস করিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, তাঁহার পত্নী জপতপরতা ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোক। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে সদ্‌গুরু লাভ হয় নাই। সেজন্য আমি তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলাম। ক্রমে যখন তাঁহার জ্ঞানের উদয় হইল, তখন শক্তি-রূপে আমি তাঁহাকে বরণ করিলাম। কারণ শাস্ত্রে বলিয়াছে,—

শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ।
শক্তিরিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহা ধ্রুবং ॥

কিন্তু রাজাবাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ইহাতে যে কত পুণ্য হয়, বড়ালমহাশয়, তুমিও তাহা বুঝিতে পার নাই। আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া রাজাবাবু আমাকে বাড়ি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। নদীকূলে শিব-মন্দিরে গিয়া আমি বাস করিতে লাগিলাম। ধর্মশিক্ষার জন্য রাত্রিকালে প্রচ্ছন্নভাবে সোনা-বৌ সে স্থানে গমন করিতেন। আমিও এ বাড়িতে আসিতাম। রাজাবাবু তাহা জানিতে পারিলেন। এদিকে

ক্রমে আমার চক্ষুও প্রস্ফুটিত হইল। প্রস্ফুটিত জ্ঞানচক্ষু দ্বারা আমি দর্শন করিলাম যে, রাজাবাবু দেবীর ভক্ষ্য, তাঁহাকে বলি দেওয়া কর্তব্য।"

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"নরাধম! পাষণ্ড!"

খাঁদা ভূত বলিল,—"আমি ভাবিলাম যে, এ গ্রামে রাজাবাবুর জ্ঞাতি-গোত্র কেহ নাই। বলিরূপে তাঁহাকে দেবীপদে অর্পণ করিলে সোনা-বৌ সমুদয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন। তখন তাঁহা দ্বারা অনেক সৎকার্য সাধিত হইবে। দেবীও এই বলি লাভ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইবেন। কারণ, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"ছাগে দত্তে ভবেদ্বাগ্মী মেষে দত্তে কবির্ভবেৎ।
মহিষে ধনবৃদ্ধিঃ স্যান্মৃগে মোক্ষফলং লভেৎ।
পক্ষিদানে সমৃদ্ধিঃ স্যাদ্গোধিকায়াং মহাফলং।
নরে দত্তে মহর্দ্ধিঃ স্যাদষ্টসিদ্ধিরনুত্তমা॥"

ছাগদানে বাগ্মী, মেষদানে কবি, মহিষদানে ধন-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন, মৃগদানে মোক্ষ-ফল-ভোগী, পক্ষিদানে ধনবান্, গোধিকাদানে মহাফল-ভোগী এবং নরবলি প্রদানে মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও অষ্টসিদ্ধির অধিকারী হয়।

কিরূপ প্রকরণ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে বলিরূপে প্রদান করি? এক্ষণে সেই চিন্তা আমার মনে উদয় হইল। শিরশ্ছেদন করিলে, শোণিত প্রভৃতি নানারূপ চিহ্ন থাকিবে। তাহা করা উচিত নহে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শূল প্রয়োগে তাঁহাকে শূলিনী দেবীর তৃপ্ত্যর্থে সমর্পণ করিব এইরূপ স্থির করিলাম। চমৎকার তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল ও ক্ষুদ্র একটি শূল নির্মাণ করাইলাম। সে শূলের সৌন্দর্য অবলোকন করিলে, বড়ালমহাশয়! তুমিও বোধ হয় তাহা গ্রহণ করিয়া স্বর্গে যাইতে বাসনা করিতে।"

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"পাপিষ্ঠ!"

খাঁদা ভূত বলিল,—"হাঁ, আমিও ভাবিলাম যে, সকলের প্রকৃতি সমান নহে। চাক্‌চিক্যশালী সুন্দর শূল দেখিয়া রাজাবাবু হয়তো মুগ্ধ হইবেন না। আপনি যেরূপ এখন বলিলেন, তিনিও হয়ত সেইরূপ শূলে

যাইতে আপত্তি করিবেন। সেজন্য প্রথম তাঁহাকে অজ্ঞান করিবার ব্যবস্থা করিলাম। সোনা-বৌ আপত্তি করিলেন। রাজাবাবু মুক্ত হইবেন, সোনা-বৌ মুক্ত হইবেন, আমি মুক্ত হইব,—শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলাম। তাঁহাকে আরও বলিলাম যে, 'শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।' অর্থাৎ শিব রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারে না। পুনশ্চ —'গুরোর্হিতং প্রকর্ত্তব্যং বাঙ্মনঃ কায়কর্ম্মভিঃ।' অর্থাৎ বাক্য, মন, শরীর ও কর্ম দ্বারা গুরুর হিতসাধন করিবে।

পূজার দিনস্থির হইল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় নিঃশব্দে আমরা রাজাবাবুর শয়নাগারে অর্থাৎ ইহার পাশের ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঔষধ প্রয়োগে তাঁহাকে অজ্ঞান করিলাম। যথাবিধি মন্ত্র পাঠ করিয়া শূলিনী দেবীর অর্চনা আরম্ভ করিলাম।—জ্বল জ্বল শূলিনী দুষ্টগ্রহ হুঁ ফট্ স্বাহা। শূলিনি দুর্গে হুঁ ফট্ স্বাহা। শূলিনি বরদে হুঁ ফট্ স্বাহা। শূলিনী বিন্ধ্যবাসিনি হুঁ ফট্ স্বাহা। শূলিনী অসুরমর্দ্দিনি যুদ্ধপ্রিয়ে ত্রাসয় ত্রাসয় হুঁ ফট স্বাহা। শূলিনি দেবসিদ্ধপ্রপূজিতে নন্দিনি রক্ষ রক্ষ মহাযোগেশ্বরি হুঁ ফট স্বাহা ইত্যাদি। কিন্তু সোনা-বৌয়ের দোষে সমুদয় পরিশ্রম বিফল হইল।

বীরু আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। তুমি দৌড়িয়া আসিলে। আমাকে তোমরা বাঁধিয়া ফেলিলে। রাজাবাবুকে সচেতন করিলে। তোমরা পশু, নিষ্ঠুর, ধর্মাধর্ম-জ্ঞানশূন্য। তোমরা বুঝিলে না যে, আমি সাক্ষাৎ শিব।

"শূদ্রো বা যদি বান্ত্যোহপি চণ্ডালোহপি জটাধরঃ।
দীক্ষিতঃ শিবমন্ত্রেণ, স ভস্মাঙ্গী শিবো ভবেৎ॥"

তোমরা আমার নাসিকা ছেদন করিলে। রক্তাক্তকলেবরে আমি শিবমন্দিরে প্রত্যাগমন করিলাম। দেখিলাম যে, সে স্থানে সোনা-বৌ গিয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া রোদন করিতেছেন। তুমি, বড়ালমহাশয়, বলিয়া দিয়াছিলে যে,—এ গ্রামে পুনরায় আমাকে দেখিলে, অথবা আদালতে আমি কোনরূপ অভিযোগ উপস্থিত করিলে, তোমরা আমার

প্রাণবধ করিবে। আমি বিদেশী, সহায়হীন, নির্ধন। তাহার পর সোনা-বৌ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃতা হইলেন না। নিরুপায় হইয়া প্রাণভয়ে আমি পলায়ন করিলাম। সোনা-বৌ আর কোথায় যাইবেন, তিনিও আমার সঙ্গে গমন করিলেন। প্রথম আমরা কাশী যাইলাম। সে স্থানে রাজাবাবু গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভয়ে কাশী হইতে বেরেলি নামক স্থানে আমরা পলায়ন করিলাম। সে স্থান হইতে আলমোড়া ও তাহার পর টেহরি গমন করিলাম। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমরা জলন্দর নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রাজাবাবু আর আমাদের সন্ধান পাইলেন না।

সোনা-বৌয়ের সহিত রাত্রিদিন আমার কলহ কচকচি হইতে লাগিল। আমার প্রতি তাঁহার ভক্তি একেবারে লোপ হইল। দিবারাত্রি তাঁহার ভর্ৎসনায় জীবন আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি শুনিলাম যে, কাঙ্গড়া নামক স্থানে নাসিকার চিকিৎসক আছে। রণজিৎসিংহের রাজত্বকালে রাজদণ্ডে অনেকের নাসিকা কর্তিত হইত। চিকিৎসকগণ ললাটের চর্মখণ্ড লইয়া নূতন নাসিকা প্রস্তুত করিয়া দিত। নূতন নাসিকা লাভ কামনায় সোনা-বৌয়ের গহনাগুলি লইয়া একখানি একা ভাড়া করিয়া কাঙ্গড়া অভিমুখে আমি যাত্রা করিলাম। পথে একাওয়ালা সমুদয় গহনাগুলি কাড়িয়া লইল ও গুরুতর প্রহারে মৃতবৎ করিয়া এক নির্জন স্থানে আমাকে ফেলিয়া গেল। সংজ্ঞালাভ করিয়া আমি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ঘোর কৃষ্ণকায় নাসিকা-বিহীন ব্যক্তিকে দেখিয়া গ্রামের কুক্কুরগণ আমাকে তাড়া করিল, বালকগণ ঢিল বর্ষণ করিতে লাগিল, গৃহস্থগণ দূর দূর করিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিল। কেহই আমাকে ভিক্ষা প্রদান করিল না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জর্জরীভূত হইয়া আমি জ্বালামুখী গিয়া পৌঁছিলাম। সে স্থানে একদল সন্ন্যাসী আমার প্রতি কৃপা করিয়া আশ্রয় প্রদান করিলেন। তাঁহাদের সহিত আমি তীর্থপর্যটনে প্রবৃত্ত হইলাম।

যয়োরেব সমং বিত্তং যয়োরেব সমং কুলম্।
তয়োর্মৈত্রী বিবাহশ্চ ন তু পুষ্টবিপুষ্টয়োঃ॥

এইরূপে কিছুকাল কাটিয়া গেল। ভাদ্র মাস। রাত্রিকাল। দক্ষিণদেশে এক ধর্মশালায় আমি শয়ন করিয়া আছি। সহসা আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি উঠিয়া বসিলাম। সম্মুখে দেখিলাম যে, রাজাবাবু দণ্ডায়মান আছেন। আমি অতিশয় ভীত হইলাম। কিন্তু রাজাবাবু আমাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিলেন,—"তোমার ভয় নাই। মন্ত্রপূত করিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে তুমি আমাকে উৎসর্গ করিয়াছিলে। দেবী আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। আমি স্বর্গে গমন করিয়াছি। কিন্তু এখনও তোমার দক্ষিণা প্রদান করা হয় নাই। তুমি অবগত আছ যে অনেকগুলি সোনার ইট আমি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। দক্ষিণাস্বরূপ সেই ইটগুলি আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। যাও আমার বাটীতে গমন কর। সুবর্ণনির্মিত সেই ইটগুলি গিয়া গ্রহণ কর।"

এই কথা বলিয়া রাজাবাবু তখন অন্তর্ধান হইলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি ক্ষিপ্ত হইলাম। ঠিক উন্মাদ নহে, কারণ, আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ রহিল। কিন্তু আমার মুখ দিয়া মাঝে মাঝে হুহু, হুহু, এইরূপ একটা শব্দ নির্গত হইতে লাগিল! অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি আমার কণ্ঠরোধ করিতে সমর্থ হইলাম না। তাহার পর লাফালাফি ছুটাছুটি করিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইল। অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাও আমি নিবারণ করিতে পারিলাম না। গ্রাম হইতে তৎক্ষণাৎ আমি বাহির হইলাম। হুহু, হুহু শব্দ করিতে করিতে আমি গাছে উঠিতে লাগিলাম। গাছে উঠিয়া বানরের ন্যায় এ শাখা হইতে সে শাখায় লাফাইতে লাগিলাম। আমার শরীরে অসুরের বল হইল। সহজ অবস্থায় সে সমুদয় শাখা-বিহীন, পিচ্ছিল, উচ্চ গাছে কিছুতেই উঠিতে পারিতাম না। এখন সেই সমুদয় বৃক্ষে অনায়াসে উঠিতে পারিলাম। সহজ অবস্থা অপেক্ষা এখন প্রায় চারি পাঁচ গুণ দূরে লম্ফ দিয়া যাইতে সমর্থ হইলাম। বৃক্ষে আরোহণ করিয়া পর্বতের উপর লম্ফঝম্ফ করিয়া নদীতে সাঁতার দিয়া আমি রাত্রি কাটাইলাম। আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল, কিন্তু হুহু শব্দ উচ্চারণ করিবার অথবা লাফালাফি করিবার প্রবৃত্তি আমি কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিলাম না। কি গাছে, কি পাহাড়ে,

মাঝে মাঝে আমার সম্মুখে রাজাবাবু আসিয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন,—'যাও যাও, গিয়া সোনার ইট লও।' তাঁহার কথায় উত্তেজিত হইয়া আমি বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি ক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিতাম। সেই সময় পথ অতিক্রম করিতাম। প্রাতঃকালে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইতাম। সমস্ত দিন কোন নির্জন স্থানে পড়িয়া থাকিতাম, রাত্রি আগমনে ক্ষিপ্ত হইয়া হুহু করিতে করিতে কখন পথ চলিতাম, কখন গাছে উঠিতাম, কখন দৌড়াদৌড়ি অথবা লম্ফঝম্ফ করিতাম। সে অঞ্চলে অনেক নারিকেল গাছ আছে। ক্ষিপ্ত অবস্থায় নারিকেল খাইয়া জীবন ধারণ করিতাম। এইরূপে সাত কি আট দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় কোন এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া এ শাখা হইতে সে শাখায় লাফাইতেছিলাম, এমন সময় আমার মুখ হইতে সহসা এক প্রকার অতি ভয়ঙ্কর অতি বিকট হুহুঙ্কার শব্দ আপনা-আপনি নির্গত হইল। হু হু হু, হু হু হু, হু হু হু, তিন বার এই প্রকার ভয়ানক শব্দ আমার মুখ হইতে নির্গত হইল। সে শব্দ শুনিয়া আমার নিজের মন আতঙ্কে কম্পিত হইল। কাক, পক্ষী, বন্য পশুগণ পর্যন্ত সে শব্দ শুনিয়া ঘোরতর ভীত হইয়া কলরব করিয়া উঠিল।"

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"সে হুহুঙ্কার শব্দ আমরা কয় বৎসর উপর্যুপরি শ্রবণ করিয়াছি। অতি ভয়ানক শব্দ বটে।"

খাঁদা ভূত বলিল,—"আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেই আমার মুখ হইতে সে শব্দ নির্গত হইল, আর আমি সুস্থ বোধ করিলাম। মনে আমার শান্তি হইল। আমার ক্ষিপ্ত অবস্থা তিরোহিত হইল। তখন হইতে রাজাবাবু আর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। এ গ্রামে আসিতে তখন আমার সাহস হইল না। তখন হইতে আমি এ-দিক ও-দিক ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। ভিক্ষা করিয়া অথবা ফলমূল পাড়িয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলাম।

এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। পুনরায় ভাদ্র মাস আসিল। পুনরায় ঘোর নিশীথে রাজাবাবু আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন

ও সোনার ইট লইবার জন্য আমাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। পুনরায় আমি ক্ষিপ্ত হইলাম। পুনরায় আমি লাফালাফি, ছুটাছুটি করিয়া ও বঙ্গদেশ-অভিমুখে অগ্রসর হইয়া রাত্রিযাপন করিতে লাগিলাম। দিনের বেলা সুস্থ হইয়া কোন স্থানে পড়িয়া থাকিতাম। সাত-আট দিন পরে পূর্বরূপ সেই ভয়াবহ অনিবার্য হুহুঙ্কার শব্দ আমার মুখ দিয়া নির্গত হইল। তাহার পর পুনরায় আমি সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম।"

অষ্টম অধ্যায়
খাঁদা ভূতের প্রার্থনা

খাঁদা ভূত বলিতেছে,—"প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে আমি এইরূপ ক্ষিপ্ত হইতে লাগিলাম। সেই সময় রাজাবাবুর উত্তেজনায় বঙ্গদেশের দিকে আসিতে লাগিলাম। ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয়, সাত-আট বৎসর পরে ক্ষিপ্ত অবস্থায় এই গ্রামের সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম। এ স্থান হইতে দুই ক্রোশ দূরে এক পরিত্যক্ত পুরাতন নীলকুঠি আছে। সে কুঠিতে এখন মানুষের গতায়াত নাই। দিনের বেলা আমি সেই নীলকুঠিতে লুকাইয়া রহিলাম। রাত্রিকালে সম্পূর্ণ উন্মত্ত অবস্থায় আমি এই গ্রামে প্রবেশ করিলাম। গাছে এবং লোকের চালে বসিয়া এই গ্রাম সম্বন্ধে নানা সংবাদ সংগ্রহ করিলাম। লোকের কথোপকথনে বুঝিতে পারিলাম যে, রায়মহাশয় নামে কোন ব্যক্তি রাজাবাবুর সম্পত্তির অধিকারী হইয়া তাঁহার গৃহে বাস করিতেছেন। তাঁহার বাড়িতে গিয়া সোনার ইট লইতে রাজাবাবু ক্রমাগত আমাকে উত্তেজিত করিতেছিলেন। আমি তাঁহার বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। কিন্তু সে সোনার ইট কোথায় তিনি লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, রাজাবাবু সেকথা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলিলেন নাই। তিনি কেবল বলিতেছিলেন, —'যাও, যাও, সোনার ইট লও।' বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া এ-দিক ও-দিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া কর্তার শয়নাগারের সম্মুখে বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলাম। কাচের জানালায় উঁকি মারিয়া তাঁহাকে দেখিলাম।

মনে করিলাম,—ইনিই রায়মহাশয়। জাগরিত হইয়া তিনি আমাকে তাড়া করিলেন। আমি সত্বর পলায়ন করিলাম। প্রথম বৎসর কয়দিন আমি এইরূপে কাটাইলাম। দিনের বেলা নীলকুঠিতে লুক্কায়িত থাকিতাম, রাত্রিকালে এই গ্রামে আসিয়া কখন গাছে, কখন লোকের চালে বসিয়া থাকিতাম। ক্রমে গ্রামের কয়জনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। 'ভূত! ভূত!' বলিয়া তাহারা পলায়ন করিল। গ্রামের লোক আমার নাম খাঁদা ভূত রাখিল। কিন্তু এই খাঁদা ভূত যে সেই কালা-বাবা, তাহা কেহ জানিতে পারিল না।"

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"সে বৎসর না হউক পরে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, তুমিই খাঁদা ভূত।"

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—"নাসিকা ছেদনের গোসাঞি তুমি, তুমি বুঝিতে পারিবে না কেন?"

"আমি মনে করিলাম যে, ভালই হইল। চোর বলিয়া কেহ আমাকে ধরিতে সাহস করিবে না। ভূতের ভয়ে রাত্রিতে কেহ গাছতলায় পাকা তাল কুড়াইতে যাইবে না। কারণ, ক্ষিপ্ত অবস্থায় এই গ্রামে আসিয়া পাকা তাল খাইয়া আমি জীবন-ধারণ করিতেছিলাম।"

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"কেবল পাকা তাল খাইয়া তুমি জীবনধারণ কর নাই।"

ঈষৎ হাসিয়া খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—"হাঁ। প্রথম বৎসর একটি অবনত বেলগাছের উপর আমি বসিয়াছিলাম। দক্ষিণ হাতে লাঠি ও বাম হাতে কাঁসার বাটি লইয়া নীচে দিয়া কে যাইতেছিল। গাছের উপর বসিয়া খুপ করিয়া তাহার হাত হইতে বাটীটি আমি তুলিয়া লইলাম। সে লোক চীৎকার করিয়া পলায়ন করিল। কাঁসার পাত্রে রাঁধা মাংস ছিল। অতি উত্তম পাক হইয়াছিল। সেই উপাদেয় সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম। আর এক বৎসর, রায়মহাশয়ের বাটীতে অরন্ধনের অন্ন, ব্যঞ্জন, মৎস্য প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়াছিলাম। আর এক বৎসর বড়ালমহাশয়, তোমার বাটীতেও অরন্ধনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার কচু-শাক আমার

সহ্য হয় নাই। তৎক্ষণাৎ আমার উদরে বেদনা উপস্থিত হইল। সেই বেদনার বশীভূত হইয়া কি করিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহা তুমি অবগত আছ। পরদিন প্রাতঃকালে বড়াল-গৃহিণীর কষ্ট হইয়া থাকিবে।"

বড়ালমহাশয় চুপি চুপি বলিলেন,—"নরাধম!" তাহার পর একটু স্পষ্টস্বরে তিনি বলিলেন,—"জাতি বিচার তোমার নাই,—না? সদ্‌গোপনীর ভাত খাইতে দোষ নাই,—না?"

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—"ব্রহ্মে অর্পণ করিলে কোন বস্তুতে দোষ থাকে না। শাস্ত্রে বলিয়াছে—

গঙ্গাতোয়ে শিলাদৌ চ স্পৃষ্টাদোষোঽপি বর্ত্ততে।
পরব্রহ্মার্পিতে দ্রব্যে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন বিদ্যতে॥

গঙ্গাজলে ও শালগ্রাম শিলায় বরং দোষ হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মার্পিত বস্তুতে স্পর্শ-দোষ হইতে পারে না। তাহা ব্যতীত আমি বীর; কুলাচারী। খাদ্যাখাদ্যের বিচার আমাদের নাই। তবে লোকাচারের বশবর্ত্তী হইয়া কখন কখন আমাদিগকে নিরামিষভোজী হইতে হয়। অথবা দুগ্ধ পান করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়।"

খাঁদা ভূত পুনরায় বলিল,—"গভীর রাত্রিতে বাটীতে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে সোনার ইটের অনুসন্ধান করিতাম। কিন্তু কোথায় সে ইট রাখিয়াছেন, রাজাবাবু ঠিক করিয়া তাহা আমাকে বলিলেন না। সেজন্য ইটের আমি কোন সন্ধান পাইলাম না। প্রথম বৎসর কয়েক দিন পরে ঘোর দুর্যোগের সময় আমি এই বাগানে তেঁতুল গাছে বসিয়া ছিলাম। এমন সময় সেই ভয়াবহ হুহুঙ্কার শব্দ আমার মুখ হইতে বহির্গত হইল। আমি সুস্থ হইয়া এ বাগানে থাকিতে আর সাহস করিলাম না।

এক বৎসর এ স্থানে সে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলাম। ভাদ্রমাসে পুনরায় আমি ক্ষিপ্ত হইলাম। রাজাবাবু সেই সময় পুনরায় আমাকে এই গ্রামে টানিয়া আনিলেন। এই বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া পুনরায় আমি সোনার ইট অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্তু রাজাবাবু স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন না। সুতরাং ইট আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রতি বৎসর এইরূপ চলিতে লাগিল। প্রতি বৎসর এইরূপ হতাশ

হইয়া আমাকে প্রত্যাগমন করিতে হইল। কেবল এক বৎসর রাজাবাবু আমাকে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিয়াছেন,—'ঐ অন্ধকার ঘরে যাও। ঐ অন্ধকার ঘরে গিয়া দক্ষিণা গ্রহণ কর।' পরদিন রাত্রিতে একজন কৃষকের বাড়ী হইতে গোপনে একটি খন্তা আনিয়া ঐ অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দিয়াসালাইয়ের কাঠি জ্বালাইয়া দেখিলাম যে, ইহার সেই পুরাতন মেজে নাই, নূতন মেজে হইয়াছে। একবার ভাবিলাম যে, যে লোক মেজে খনন করিয়াছিল, লুক্কায়িত অর্থ হয়তো তাহার হস্তগত হইয়াছে। আবার ভাবিলাম যে, না—তাহা হইলে রাজাবাবু আমাকে সোনার ইট লইতে অনুরোধ করিতেন না। প্রাচীরের অনেকটা আমি খনন করিলাম। কিন্তু কিছুই পাইলাম না। কয় বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল।"

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রায়মহাশয়ের ঘরে ঢিল ফেলিয়াছিলে কেন? জান যে, তাহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল!"

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—"তাহা আমি জানি না। প্রতি বৎসর বাড়ির ভিতর বারান্দায় দাঁড়াইয়া ঘরে উঁকি মারা আমার অভ্যাস হইয়াছিল। সে বৎসর সে দিকের জানালা তিনি বন্ধ রাখিয়াছিলেন। সে দিক দিয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া আমি সেই ঘরের পার্শ্বে বাগানে গিয়া দাঁড়াইলাম। সে দিকের জানালা উন্মুক্ত ছিল। সেই দিক দিয়া তাঁহার ঘরে দুই তিনটি ঢিল নিক্ষেপ করিলাম। কেন ঢিল ফেলিলাম, তাহা আমি জানি না। তখন আমার ক্ষিপ্ত অবস্থা। উন্মাদ দ্বারা অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যের কারণ থাকে না। তোমরা বলিবে যে, যখন সে সময়ের সমস্ত ঘটনা তোমার স্মরণ রহিয়াছে, তখন তুমি উন্মাদ কি করিয়া? সত্য বটে! সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হই। ক্ষিপ্ত দশায় আমার জ্ঞান থাকে; কিন্তু মনের উপরে, শরীরের উপরে, কার্যের উপরে আমার কিছুমাত্র প্রভুত্ব থাকে না। আমি মনে করি যে, কেন আমি বৃক্ষে আরোহণ করি, কেন আমি লম্ফঝম্ফ করি, রাজাবাবু আমাকে দণ্ড দিতেছেন, কেন আমি তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার বাটীতে গমন করি, কেন আমি হুহু করি, কেন আমি আমার কণ্ঠ

হইতে ভয়াবহ হুহুঙ্কার শব্দ নিঃসারিত হইতে দিই। মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়াও আমি আপনাকে ঠিক রাখিতে পারি না। কে যেন বলপূর্ব্বক সেই সমুদয় কাজ করিতে আমাকে বাধ্য করে।”

বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“গত পাঁচ-ছয় বৎসর কোথায় ছিলে?”

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—“শেষ বৎসর এ স্থান হইতে গিয়া একদিন ক্ষুধায় বড়ই প্রপীড়িত হইয়াছিলাম। ‘বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং, ক্ষীণা জনা নিষ্করুণা ভবন্তি।’ ক্ষুধার্ত্ত লোক না করিতে পারে এমন কাজ নাই। কোন এক গ্রামের নির্জন পথে নানা অলঙ্কারে বিভূষিত এক বণিকপুত্রকে দেখিয়া তাহার গহনা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। গ্রামের লোকে আমাকে ধরিয়া ফেলিল। চৌর্য্য ও নরহত্যা-চেষ্টার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া আমার পাঁচ বৎসর কারাবাসের দণ্ড হইল। যখন ভাদ্র মাস আসিল, তখন কারাবাসের কর্তৃপক্ষগণ জানিতে পারিল যে, আমি ক্ষিপ্ত। তাহারা আমাকে পাগলা-গারদে প্রেরণ করিল। সে স্থানে লোকে ক্রমে জানিতে পারিল যে, বৎসরের মধ্যে কেবল একবার, দিন কয়েকের জন্য আমি ক্ষিপ্ত হই ও সে সময় কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট করি না। যে কারণেই হউক, পাঁচ বৎসর পরে আমাকে মুক্ত করিয়া দিল। তাহারা আমার জটা কাটিয়া দিয়াছিল।”

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এখন কি তোমার ক্ষিপ্ত অবস্থা।”

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—“না, এখন আমার সহজ অবস্থা। কিন্তু ক্ষিপ্ত-কাল আগতপ্রায়।”

বড়াল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এখন তবে কি জন্য আসিয়াছ?”

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—“কারাগারে ও পাগলা-গারদে বাসের সময় যখন ক্ষিপ্ত হইতাম, তখন রাজাবাবু সর্ব্বদাই আমার নিকট আসিতেন। দক্ষিণা গ্রহণের নিমিত্ত এই বাড়ীতে আসিতে ক্রমাগত তিনি আমাকে বলিতেন। গুপ্তস্থান নির্দেশ করিয়া দিবার নিমিত্ত তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু বার বার বিফলমনোরথ হইয়া আমি হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। আমি ভাবিলাম যে, রাজাবাবু স্থান দেখাইয়া

দিলেও গৃহস্বামীর সহায়তা ব্যতীত আমি কিছুতেই এ অর্থ লাভ করিতে পারিব না। সেজন্য আমি স্থির করিলাম যে, এবার সুস্থ অবস্থায় গিয়া তাঁহাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিব। রাজাবাবু স্থান নির্দেশ করিয়া দিলে সমুদয় অর্থ তাঁহার সম্মুখে বাহির করিব। রাজাবাবু সমস্ত আমাকে দিয়াছেন সত্য ; কিন্তু আমি ভাবিলাম যে, বর্তমান গৃহস্বামী তাহা আমাকে দিবেন না। সমুদয় অর্থ না হউক, অন্ততঃ তাহার কিয়দংশ তিনি আমাকে প্রদান করিবেন, তাহা লইয়া হিমালয় পর্বতের কোন নির্জন প্রদেশে অবস্থান করিয়া আমি অবশিষ্ট জীবন তপস্যায় অতিবাহিত করিব। এই মানসে—"

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে তোমার নাকের জন্য এ স্থানে তুমি আগমন কর নাই ?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—"নাক! আমার নাসিকা তোমরা ছেদন করিয়াছ। নাসিকা আর আমি কোথায় পাইব ?"

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"তোমার নাক কোনও স্থানে আছে।"

ঘোরতর আগ্রহ সহকারে খাঁদা ভূত জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় ? কোথায় ? কোথায় ?"

কর্তিত নাসিকার জন্য তাহার মনের আবেগ ও কাতরভাব দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন।

খাঁদা ভূত খেদ করিয়া বলিতে লাগিল,—"হায়, আমার নাক! ক্ষিপ্ত অবস্থায় নাকের শোকে আমার হৃদয় যে কিরূপ সন্তপ্ত হয়, তাহা আর তোমাদিগকে কি বলিব! গঙ্গামৃত্তিকা দিয়া লোকে যেরূপ শিবলিঙ্গ গড়িয়া পূজা করে ও তাহার পর জলে নিক্ষেপ করে, আমিও সেইরূপ নদীকূলে বসিয়া বার বার মৃত্তিকা দ্বারা নাসিকা নির্মাণ করি ও মুখমণ্ডলে পরিধান করিয়া জলে তাহা নিক্ষেপ করি। কোথায় আমার নাক ? বড়ালমহাশয়! বল, কোথায় আমার নাক ? সে কর্তিত গলিত শুষ্ক নাসিকা পাইলেও আমি অনেকটা শান্তিলাভ করি।"

তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া সকলে ভাবিলেন যে, খাঁদা ভূতের এইবার

বুঝি ক্ষিপ্তদশা উপস্থিত হইল। সেজন্য অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া বড়ালমহাশয় নাকের কথা চাপা দিতে চেষ্টা করিলেন।

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সোনার ইট সম্বন্ধে এক্ষণে তোমার মানস কি?"

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—"এখন ভাদ্র মাসের শেষভাগ। প্রতি বৎসর এই সময় আমি ক্ষিপ্ত হই। এবার নিশ্চয় ক্ষিপ্ত হইব। রাজাবাবু সেই সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ও কোন্ স্থানে সোনার ইট লুক্কায়িত আছে, তাহা তিনি আমাকে দেখাইয়া দিবেন। তোমাদের সহায়তায় আমি তাহা বাহির করিব। তাহার কিয়দংশ তোমরা আমাকে প্রদান করিবে। তাহা লইয়া আমি প্রস্থান করিব। আর কখনও এ গ্রামে আসিব না। আমার আর একটি নিবেদন এই যে, গ্রামবাসীদিগের সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি না। কালা-বাবা বলিয়া একদিন তাহারা আমাকে পূজা করিত। পূজনীয় সেই কালা-বাবা নাসিকা-বিহীন খাঁদা ভূত হইয়া তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলে সকলে আমাকে অতিশয় ঘৃণা করিবে। আমার প্রার্থনা এই যে, ভাদ্র মাসের অবশিষ্ট কয়টা দিন আমাকে তোমরা ঐ অন্ধকার ঘরে লুক্কায়িত থাকিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান কর। লুক্কায়িত ধন বাহির হইলে, ক্ষিপ্ত অবস্থা গত হইলে, আমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব।"

সুবালা ও বিনয়কে সঙ্গে লইয়া বড়ালমহাশয় বারান্দায় গমন করিলেন। সে স্থানে চুপি চুপি তাঁহারা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"রাজাবাবুর পিতা ও তিনি নিজে অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই ধন এই বাড়িতে কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে। আমার সমুদয় অনুসন্ধান বৃথা হইয়াছে। এই অর্থ পাইলে অনেক উপকার হইবে। নদীকূলে বাঁধ বাঁধিয়া দিলে বানে আর গ্রামের লোকের অনিষ্ট হইবে না। অতএব খাঁদা ভূতের প্রস্তাবে আমাদের সম্মত হওয়া উচিত।" বিনয়ও সেইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। সুবালা চুপ করিয়া রহিলেন।

সকলে পুনরায় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। খাঁদা ভূতকে সম্বোধন করিয়া বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"এ কয়দিন তোমাকে আমরা ঐ চোরকুঠুরিতে বাস করিতে দিব। কিন্তু ঘরের দুই দ্বারে তালা দিয়া আমি বন্ধ করিয়া রাখিব। কেবল সন্ধ্যার পর একবার তোমাকে আমি ছাড়িয়া দিব। ক্ষিপ্ত অবস্থায় যদি তুমি অধিক উপদ্রব কর, তাহা হইলে তোমাকে আমি বাঁধিয়া রাখিব। যদি গুপ্তধন তুমি বাহির করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তাহার এক অংশ তোমাকে আমরা প্রদান করিব।"

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—"আমারও সেইরূপ ইচ্ছা। ক্ষিপ্ত হইয়া যদি আমি পূর্বরূপ দৌড়াদৌড়ি করি, তাহা হইলে সকলেই জানিতে পারিবে। অতএব সেই সময় আমাকে বাঁধিয়া রাখাই উচিত। যে সময় রাজাবাবু আসিয়া লুক্কায়িত ধন আমাকে দেখাইয়া দিবেন, সেই সময় যেরূপ কর্তব্য, তাহা তোমরা করিবে।"

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করি। এ বাটীর সদর ও খিড়কি দ্বার বন্ধ থাকিত। কিরূপে তুমি বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতে, কিরূপেই বা তুমি বাহির হইয়া পলায়ন করিতে?"

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—"তুমি কি তাহা জান না? এই ঘরের নিম্নে যে ঘর,—যাহার ভিতর তোমাদের কাঠ, ঘুঁটে পাতা প্রভৃতি থাকে, সেই ঘরের পূর্বধারে বাগানের দিকে কাষ্ঠনির্মিত গরাদ-সম্বলিত দুইটি জানালা আছে। একটি জানালার দুইটি কাঠের গরাদ অনায়াসে খুলিতে ও পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে পারা যায়। আমি সেই পথ দিয়া এই বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতাম ও সেই পথ দিয়া বহির্গত হইতাম। কল্য রাত্রিতেও সেই পথ দিয়া এই বাটীর ভিতর আসিয়াছিলাম। তাহার পর সামান্য একটি লৌহশলাকার সহায়তায় ঐ অন্ধকার ঘরের তালা খুলিয়াছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, এই গমনাগমনের পথ বড়ালমহাশয় তুমি অবগত আছ। কারণ, একদিন রাত্রিকালে সেই ঘরের পার্শ্বে ঠিক জানালার নিকট বাগানের ভিতর

তুমি বসিয়াছিলে। সে স্থানে একাকী বসিয়া তুমি কি করিতেছিলে। জানালা-পথে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিব, এই মানসে আমি আসিয়াছিলাম। কিন্তু তখনও রাত্রি অধিক হয় নাই, সেজন্য ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। জানালার নিকট আসিয়া দেখিলাম যে, কে একটা লোক সেই স্থানে বসিয়া-একবার এদিকে, একবার সেদিকে হাত নাড়িতেছে। আমার ভয় হইল। অন্ধকার রাত্রি। প্রথম তোমাকে আমি চিনিতে পারি নাই। মনে করিলাম, এ একটা ভূত, কি পাগল! তাহার পর দেখিলাম যে, তুমি। সেই মুহূর্তে তোমার দৃষ্টিও আমার উপর পড়িল। তুমি ভয়ে দ্রুতপদে পলায়ন করিলে। আমিও সে রাত্রি এ বাটীতে প্রবেশ করিতে সাহস করিলাম না। আমি পলায়ন করিতে উদ্যত হইলাম। বাগানের অতি অল্পদূর অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় আমার সম্মুখ দিকে কে একজন 'মা গো!' বলিয়া চীৎকার করিল। সেই মুহূর্তে আমার পশ্চাদ্দিকে, ঠিক যে স্থানে তুমি বসিয়াছিলে, সেই স্থানে আর-একজন কে 'মা গো!' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমার বড় ভয় হইল। বাগানের ভিতর এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া আমি লুক্কায়িত রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার হুহুস্কার আসিয়া গেল। তাহার পর আমি সুস্থ বোধ করিলাম। এ গ্রাম হইতে পলায়ন করিলাম। সে স্থানে বসিয়া তুমি কি করিতেছিলে?"

বড়ালমহাশয় সে প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। একটু চিন্তা করিয়া কেবল বলিলেন,—"বটে।"

অন্ধকার ঘরে গোপনভাবে খাঁদা ভূতের বাসের জন্য যথাপ্রয়োজন দ্রব্যাদির তিনি আয়োজন করিয়া দিলেন। খাঁদা ভূত অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। বড়ালমহাশয় দুই দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান করিবার পূর্বে বড়ালমহাশয় বিনয় ও সুবালাকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শাঁকচুন্নির হাড় কখনও দেখিয়াছ?"

বিনয় হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"শাঁকচুন্নির হাড়! সে আবার কি?"

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"আজ নয়। কাল প্রাতঃকালে সকল কথা বলিব। বোধ হয় শাঁকচুন্নির হাড়ও দেখাইতে পারিব।"

নবম অধ্যায়
ভারতের বুশিডো (Bushido)

সন্ধ্যা হইতে তখনও বিলম্ব ছিল। ফুলগাছগুলি দেখিবার নিমিত্ত সুবালা তাড়াতাড়ি বাগানে গমন করিলেন। দূরে পুষ্করিণীর ঘাটে দাঁড়াইয়া পাগলী পালিত মৎস্যদিগকে আহার প্রদান করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া চপলার কথা সুবালার মনে পড়িল। বৃক্ষের শুষ্ক কাষ্ঠের উপর তিনি বসিয়া পড়িলেন। সে স্থানে বসিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"উইলের প্রকৃত তত্ত্ব এখন অবগত হইলাম। খাঁদা ভূত যে ভূত নহে,—মানুষ, তাহাও এখন বুঝিলাম। কিন্তু চপলা কোথায় গেল ?"

ধীরে ধীরে বিনয় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাষ্ঠের অপর পার্শ্বে তিনিও উপবেশন করিলেন। বিনয় বলিলেন,—"চিন্তার বিষয় বটে! আশ্চর্য কথা আজ আমরা শুনিলাম। এরূপ ঘটনা উপন্যাস-পুস্তকেই কল্পিত হয়। গৃহস্থের সংসারে এইরূপ ঘটনা সত্য-সত্য প্রায় ঘটে না।"

সুবালা বলিলেন,—"চপলার কথা আমি ভাবিতেছি। চপলা কোথায় গেল ? যে রাত্রিতে চপলা অন্তর্হিত হয়, সে রাত্রির সে 'মা গো' চীৎকার খাঁদা ভূতও শুনিয়াছিল।"

বিনয় বলিলেন,—"যথাকালে এ সমস্যারও বোধ হয় মীমাংসা হইবে। কিন্তু এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—এ সম্পত্তি সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় কি ?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"বিজয়বাবুকে কল্য আমি পত্র লিখিব। দাদামহাশয়ের বাক্সর ভিতর একখানা কাগজে তাঁহার ঠিকানা ছিল, তাহা আমি পাইয়াছি।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাঁহাকে তুমি কি লিখিবে ?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"তাঁহাকে লিখিব যে, এ বিষয় আমার নহে, এ বিষয় আপনার। আপনি আপনার সম্পত্তি বুঝিয়া লউন।"

বিনয় বলিলেন, "এত গোলমালে আবশ্যক কি ? বড়ালমহাশয় সত্য বলিয়াছেন যে, উইল সম্বন্ধে এ প্রতারণা কেহ জানিতে পারিবে না। তুমি কেন প্রকাশ করিবে ?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"আমি বুঝিয়াছি, কেন তুমি আমাকে এরূপ পরামর্শ দিতেছ। হায় রে টাকা! উন্নতচিত্ত লোকেরাও ইহার জন্য বিপথগামী হয়!"

একটু হাসিয়া বিনয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নগদ টাকা ও কোম্পানির কাগজ কি করিবে?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"কড়ায়-গণ্ডায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিব।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি পথের ভিখারিণী হইবে?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"হাঁ।"

বিনয় বলিলেন,—"দরিদ্রের কোন স্থানে সম্মান নাই। তোমাকে সকলে অশ্রদ্ধা করিবে।"

সুবালা বলিলেন,—"তাহা আমি জানি। ধনীর মাথায় ধর ছাতি, নির্ধনের মাথায় মারো লাথি, পৃথিবীর নিয়মই এই। তা বলিয়া পরের দ্রব্য আমি অপহরণ করিতে পারি না। কেহ আমাকে কিছু প্রদান করুক,—এরূপ কামনাও কখন আমি করি না। নীচপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট লোকেরাই ইচ্ছা করে যে, অমুক আমাকে কিছু প্রদান করুক। আমার পিতা গরিব ছিলেন। কিন্তু তিনি অসত্যবাদী, প্রতারক, ভিক্ষুক অথবা চোর ছিলেন না। নিতান্ত আত্মীয় লোকও তাঁহাকে কিছু দিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। মা বলিতেন যে, 'যাহারা অন্য লোকের নিকট হইতে কিছু পাইব,—এরূপ প্রত্যাশা করে, ভগবান্ চিরকাল তাহাদিগকে পরপ্রত্যাশী করিয়া রাখেন।' আমি তাঁহাদের কন্যা।"

পুনরায় ঈষৎ হাসিয়া বিনয় বলিলেন—"আজকাল টাকা খরচ না করিলে কন্যার বিবাহ হয় না। তোমাকে যদি কেহ বিবাহ না করে?"

সুবালার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। মস্তক অবনত করিয়া একটি কাঠি লইয়া তিনি গাছের গোড়া ঘন ঘন খুঁড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন,—"আমি বিবাহ করিতে চাই না।"

বাল্যকালে বিনয়ের সহিত সুবালার কয়েকবার ঝগড়া হইয়াছিল। বড় হইয়া দুইজনে আজ এই প্রথম ঝগড়া হইল।

বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার ভরণ-পোষণ কিরূপে হইবে?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"পিসীমাকে আমার কাকামহাশয় চিরকাল প্রতিপালন করিয়াছেন। একমুষ্টি ভাত আমাকেও তিনি দিবেন। তাঁহার বাড়িতে না হয় আমি দাসী হইয়া থাকিব।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বিনয় বলিলেন,—"রাগিলে মানুষকে যে এত সুন্দর দেখায়, তাহা আমি জানিতাম না। রক্তবর্ণ কাগজ-নির্মিত চীনদেশীয় লণ্ঠনের ভিতর হইতে যেরূপ আলোক নির্গত হয়, তোমার কোপাবিষ্ট মুখমণ্ডল হইতে সৌন্দর্যের জ্যোতি সেইরূপ বাহির হইতেছিল। সত্যপথ হইতে বিচলিত করিবার বাসনায় তোমাকে আমি এত কথা বলি নাই। চপলার সমস্যা ব্যতীত এই সমুদয় অদ্ভুত ঘটনার ভিতর আরও একটি-রহস্য আছে। তাহাও একদিন প্রকাশিত হইবে। যখন তাহা প্রকাশিত হইবে, তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তোমার এই সামান্য সম্পত্তি একদিন আমি লাভ করিব, সে লোভ আমি কখন করি নাই। আমার মাতা-পিতার কোন অভাব নাই। তাঁহাদের আমি একমাত্র পুত্র। তোমার সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা তাঁহারা করেন না। তোমার তুলনায় পৃথিবীর যাবতীয় ধনরত্নকে আমি কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের ন্যায় জ্ঞান করি। তোমার নিকট, সুবালা, আমার এই মিনতি যে, তুমি আমাকে নরাধম জ্ঞান করিও না।"

পূর্বাপেক্ষা একটু ধীরে ধীরে সুবালা এখন মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। বাষ্পজলে তাঁহার চক্ষু দুইটি পরিপূরিত হইল। কতক মুছিয়া ফেলিলেন, কতক গোপন করিলেন, কতক নিবারণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সজল নয়নে প্রফুল্লবদনে বিনয়ের দিকে একবার চাহিয়া পুনরায় তিনি মস্তক অবনত করিলেন।

সুবালা বলিলেন,—"টাকা থাকিলে অনেকের উপকার করিতে পারা যায়, সেজন্য টাকাকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি না। কিন্তু টাকায় সুখ হয় না। দাদামহাশয় ও দিদিমণির অর্থ ছিল। কিন্তু অর্থবলে তাঁহারা শরীরের স্বচ্ছন্দতা অথবা মনের শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। নিদারুণ শোকে তাঁহারা সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। প্রিয়জনের প্রাণবিয়োগ-জনিত শোক হইতে মানুষ নিষ্কৃতি পায়,—তাহার কি কোন উপায় নাই?"

বিনয় উত্তর করিলেন,—"আজ তুমি খাঁদা ভূতকে বলিয়াছিলে যে, 'সকল দুঃখের মূল পাপ। পূর্বকৃত পাপের ফলে মানুষ শোক-তাপে সন্তাপিত হয়। পূর্বসঞ্চিত পাপ যদি অতি গুরুতর হয়, তাহা হইলে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা বড়ই কঠিন কথা।" কিন্তু ঔষধের সহায়তায় মানুষ যেরূপ অনেক সময়ে বিষপান করিয়া পরিত্রাণ পায়, সেইরূপ সৎকর্মের অনুষ্ঠানে মানুষ অনেক সময়ে পূর্বসঞ্চিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে, অকালমৃত্যুজনিত শোক হইতে তাহারা নিষ্কৃতি পায়।"

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপ সৎকর্ম ?"

বিনয় উত্তর করিলেন,—"আমি বীর, এই কথা বলিয়া খাঁদা ভূত আজ গর্ব করিতেছিল। কিন্তু আমিও বীর দেখিয়াছি। তাঁহাদের সহিত ও খাঁদা ভূতের সহিত আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সেই বীরদিগের মধ্যে এক মহাত্মা কৃপা করিয়া আমাকে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। পূর্বসঞ্চিত পাপ যদি নিতান্ত গুরুতর হয়, তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে,—'স্বধর্মরত প্রকৃত বীরগণ কখন শোক পান না, তাঁহাদের কখন অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট হয় না।' এ কথার কথা নহে। আমার মনে বিশ্বাস যাহাতে দৃঢ়ীভূত হয়, সেজন্য ভূয়োভূয়ঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা তিনি আমাকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।"

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই বীরধর্ম কি আমাদের স্বধর্ম ?"

বিনয় উত্তর করিলেন,—'চরাচর জগতের গুরু শ্রীশ্রীমহাদেব কর্তৃক ইহা প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার অপর নাম কুলাচার। এই ধর্মে দীক্ষিত লোকদিগকে কুলাচারী, কৌলিক, কৌল বা বীর বলে। ইহার ধর্মশাস্ত্র-সমূহকে আগম বা তন্ত্র বলে। ভগবতী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাদেব যে সমুদয় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাকেই আগম বা তন্ত্রশাস্ত্র বলে। ইহা দুই প্রকার। মহাভারতের সময় অসংখ্য দানব মনুষ্য আকারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের বংশ এখনও পৃথিবীতে বর্তমান আছে। মনুষ্যশরীরধারী দানবদিগকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত, মহাদেব পূর্বকালে অনেকগুলি তন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। শেষে দেবপ্রকৃতিবিশিষ্ট মানবদিগের হিতার্থে সকল শাস্ত্রের সার

সংগ্রহ করিয়া তিনি নূতন একটি তন্ত্র প্রচার করেন। আমি তোমাকে এই শেষোক্ত তন্ত্রের কথাই বলিতেছি। ইহার উপদেশ অনুসারে যাঁহারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত বীর। তাঁহারাই দারিদ্র্যদুঃখ ও অকালমৃত্যুজনিত শোক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইহার মতে যাহারা কার্য না করে, মহাদেব তাহাদিগকে পশু নামে অভিহিত করিয়াছেন। শেষোক্ত এই তন্ত্রই এখন একমাত্র আগমশাস্ত্র। ইহার দ্বারা পূর্ব কথিত সমুদয় ধর্মশাস্ত্র নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়াছে। ইহা বিনা মানুষের আর অন্য উপায় নাই। শ্রীশ্রীসদাশিব নিজে বলিয়াছেন—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে॥

হে প্রিয়ে! আমি সত্য সত্য পুনঃ সত্য বলিতেছি যে, কলিকালে আগমোক্ত পথ ব্যতিরেকে গতি নাই।

শিবের বাক্য শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়!

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ ধর্মের বিশেষ উপদেশ কি?"

বিনয় উত্তর করিলেন,—"পরব্রহ্মে ভক্তি ও পরোপকার তো বটেই, কিন্তু তাহা ব্যতীত ইহার ভিত্তি সত্যের উপর সংস্থাপিত। সত্য হইতে কেহ যেন কখন বিচলিত না হয়, সে সম্বন্ধে মহাদেব বার বার সকলকে সাবধান করিয়াছেন। একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—

প্রকটেঽত্র কলৌ দেবী সর্বে ধর্মাশ্চ দুর্বলাঃ।
স্থাস্যত্যেকং সত্যমাত্রং তস্মাৎ সত্যময়ো ভবেৎ॥
সত্যধর্মং সমাশ্রিত্য যৎ কর্ম কুরুতে নরঃ।
তদেব সফলং কর্ম সত্যং জানীহি সুব্রতে॥
ন হি সত্যাৎ পরো ধর্ম ন পাপমনৃতাৎ পরম্।
তস্মাৎ সর্বাত্মনা মর্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥
সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপো ব্যর্থমূষরে বপনং যথা॥

সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ সত্যাৎ পরতরং ন হি ॥

হে দেবী! কলি প্রবল হইলে সকল ধর্মই দুর্বল হইবে। কেবল একমাত্র সত্যই থাকিবে; অতএব সত্যময় হওয়া সকলেরই কর্তব্য। সত্যধর্ম আশ্রয় করিয়া মানুষ যে কাজ করিবে, হে সুব্রতে! নিশ্চয় জানিও, সে কাজ সফল হইবে। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই, মিথ্যা অপেক্ষা জঘন্য পাপ নাই। সেজন্য সকল অবস্থাতেই একমাত্র সত্যকে অবলম্বন করা মানুষের কর্তব্য। সত্যহীন পূজা বৃথা, সত্যহীন জপ বৃথা। যেরূপ উষর ভূমিতে বীজ বপন করিলে বৃথা হয়, সেরূপই সত্যহীন তপস্যাও বৃথা হয়। সত্যরূপই পরম ব্রহ্ম, সত্যই পরম তপস্যা। সকল ক্রিয়ার মূল সত্য; সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই।

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জাপানীরা নানা দেশে গিয়া বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জন করিয়া স্বজাতির উন্নতিসাধন করিয়াছে। বীরধর্মে সে সম্বন্ধে কোনরূপ উপদেশ আছে?"

বিনয় উত্তর করিলেন,—"সদাশিব আদেশ করিয়াছেন—

'বিদ্যার্থী মানবো দেশানখিলান্ গন্তুমর্হতি।
নিষিদ্ধকৌলিকাচারং দেশং শাস্ত্রমপি ত্যজেৎ ॥
গচ্ছংস্তু স্বেচ্ছয়া দেশে নিষিদ্ধকুলবর্ত্মনি।
কুলধর্মাৎ পতেদ্ভূয়ঃ শুধ্যেৎ পূর্ণাভিষেকতঃ ॥

'বিদ্যার্থী মানবগণ সকল দেশেই গমন করিতে পারিবে। কিন্তু যে দেশে বা শাস্ত্রে বীরধর্ম নিষিদ্ধ, সেই দেশ ও সেই শাস্ত্র পরিত্যাগ করিবে। যে দেশে বীরমার্গ নিষিদ্ধ, সে দেশে কেহ স্বেচ্ছাক্রমে গমন করিলে বীরধর্ম হইতে পতিত হইবে, কিন্তু পুনরায় পূর্ণাভিষেক দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারিবে।"

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে শিবের আজ্ঞা কিরূপ?"

বিনয় উত্তর করিলেন,—"তাঁহার আজ্ঞা এই যে, মাতা-পিতা পুত্রের ন্যায় তাহাকেও শিক্ষা প্রদান করিবেন। যতদিন না পতিমর্যাদা ও ধর্মশাসনে তাহার জ্ঞান জন্মে, ততদিন তাহার বিবাহ দিবেন না।"

সুবালা বলিলেন,—"পুস্তকে ও সংবাদপত্রে আমি পাঠ করিয়াছি যে, জাপানীরা পিতৃগণকে পূজা করে। তাহাদের প্রাচীন শিন্টো ধর্মে ইহার ব্যবস্থা আছে। সামুদ্রিক যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া রণার্ণবপোতপতি টগো বলিয়াছিলেন যে,—'যুদ্ধের সময় পিতৃগণকে আমি সাগরমধ্যে যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছিলাম। তাঁহাদের সহায়তাতেই আমি রণে বিজয়ী হইয়াছি।' শিবপ্রোক্ত বীরধর্মে পিতৃগণ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা আছে?"

বিনয় উত্তর করিলেন,—"পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থে আমরাও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিয়া থাকি। পিতৃলোক হইতে পিতৃগণের রশ্মি সর্বদাই আমাদের উপর পতিত হইতেছে। তাঁহাদের বংশধরগণ সৎকর্ম করিলে তাঁহারা পরম পরিতোষ লাভ করেন। তাঁহাদের বংশসম্ভূত কেহ যদি বীরধর্ম অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণের সহিত আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন এবং তাঁহারা পুলকিত হৃদয়ে এই গাথা গান করেন,—

'অস্মৎকুলে কুলশ্রেষ্ঠো জাতো ব্রহ্মোপদেশিকঃ।
কিমস্মাকং গয়াপিণ্ডৈঃ কিং তীর্থশ্রাদ্ধতর্পণৈঃ।
কিং দানৈঃ কিং জপের্হোমৈঃ কিমন্যৈর্বহুসাধনৈঃ।
বয়মক্ষয়তৃপ্তাঃ স্মঃ সৎপুত্রস্যাস্য সাধনাৎ॥'

আমাদের কুলে ব্রহ্ম-উপাসক উৎপন্ন হইয়া আমাদের কুলকে পবিত্র করিয়াছে। আমাদের নিমিত্ত গয়াতে পিণ্ডদান, তীর্থে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ, দান, জপ, হোম অথবা অন্য সাধনে আবশ্যক কি? আমাদের সৎপুত্রের সাধনে আমরা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করিলাম।

জাপানীরা যেরূপ পিতৃগণের নিকট আপনাদের মঙ্গল প্রার্থনা

করে, শিবোক্ত এই বীরধর্মেও তাহার বিধি আছে। শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট এইরূপে আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে হয়—

'আশিসো মে প্রদীয়ন্তাং পিতরঃ করুণাময়াঃ।
বেদাঃ সন্ততয়ো নিত্যং বর্ধন্তাং বান্ধবা মম॥
দাতারো মে বিবর্ধন্তাং বহুন্যন্নানি সন্তু মে।
যাচিতারঃ সদা সন্তু মা চ যাচামি কঞ্চন॥'

হে করুণাময় পিতৃগণ! আমাকে আপনারা আশীর্বাদ প্রদান করুন। আমার বিদ্যা, সন্তান ও বান্ধবগণ নিত্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। আমার অনেক অন্ন হউক। আমার নিকট সর্বদা লোক যাচ্ঞা করুক, কিন্তু আমাকে যেন কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিতে না হয়।"

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহা যদি বীরের ধর্ম, তবে ইহাতে সংসাহস অবশ্য প্রশংসিত হইয়াছে?"

বিনয় উত্তর করিলেন,—"মহাদেব বলিয়াছেন—

'ন বিভেতি রণাদ্ যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥'

যে রণে ভীত হয় না ও রণ হইতে পরাঙ্মুখ হয় না এবং যে ব্যক্তি ধর্মযুদ্ধে মৃত হওয়াও শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তি কর্তৃক ত্রিভুবন জিত হইয়া থাকে।

ফলকথা, এই বীরধর্ম অবলম্বনে লোক মহাবলপরাক্রমশালী হয়,— 'যেন লোকা ভবিষ্যন্তি মহাবলপরাক্রমাঃ।' তাহার পর পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইহার প্রভাবে লোক শোকতাপ হইতে নিস্তার পায়, অন্নবস্ত্রের কষ্ট পায় না, অবশেষে পরলোকে "ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করে!"

বিনয় পুনরায় বলিলেন,—"সংক্ষেপে তোমাকে এই বীরধর্মের কথা বলিলাম। এ ধর্ম অবলম্বন করিলে প্রথমেই সত্যের আশ্রয় লইতে হয়। কথায়-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে সকল বিষয়ে সত্য। সত্য, সত্য, সত্য ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। যতদিন না বাঙ্গালী সত্যের আশ্রয় লয়, ততদিন দেশের উন্নতি হইবে না। মহাদেব বলিয়াছেন যে,—'আমার প্রবর্তিত এই ধর্মের নিয়মাদি সুখে-স্বচ্ছন্দে ও বিনা

আয়াসে লোক প্রতিপালন করিতে পারিবে। ভবিষ্যতে মানুষের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা বুঝিয়া তাহাদের উন্নতি ও পরিত্রাণের নিমিত্ত আমি এই সমুদয় উপদেশ প্রদান করিলাম।' অন্যান্য ধর্মের নিয়ম অতি কঠোর। একগালে চড় মারিলে কয়জন লোক অন্য গাল বাড়াইয়া দিতে পারে? যে স্থলে জীবহিংসা দূরে থাকুক, 'কাটা' শব্দ উচ্চারণ করিলেও দোষ হয়, সে স্থলে গাভীবৎসকে বঞ্চনা করিয়া দুগ্ধ কিরূপে পান করিতে পারা যায়? চাউল ভক্ষণ করিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিতে পারা যায়? কারণ, ধান্যের গাছ তাহার শিশু-সন্তানদিগের জন্য যে আহার সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাকেই চাউল বলে, তাহাই অপহরণ করিয়া আমরা ভক্ষণ করি। ধর্মের কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে না পারিয়া মানুষ কপটাচারী হইয়া, পরে সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়। সুবালা! সত্যকে পরিত্যাগ করিলেই বিপদ। সেজন্য কৃপা করিয়া মহাদেব মানুষকে এই বীরধর্ম প্রদান করিয়াছেন।"

সুবালা বলিলেন,—"মৃত্যুকালে মা আমাকে গুটিকয়েক উপদেশ দিয়াছিলেন। তখন তাহা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই। কথাগুলি কিন্তু আমি মনে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। মা বলিয়াছিলেন,—'সুবালা! কখন অসত্য কথা বলিও না, অসত্য আচরণ করিও না, নিষ্ঠুরতা ও নীচতা সর্বদা পরিত্যাগ করিবে।' অসত্য কথা কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি। পরদ্রব্য অপহরণ, প্রতারণা প্রভৃতি অপরাধকে বোধ হয় অসত্য আচরণ বলে। জীবকে কষ্ট দেওয়াকে নিষ্ঠুরতা বলে। আমি তোমাকে সেই চড়ুই পক্ষীর গল্প বলিয়াছি। পাখিটিকে ধরিয়া তাহার পায়ে সূতা বাঁধিয়া আমি খেলা করিতেছিলাম। মা বলিলেন,—'এরূপ কাজকে নিষ্ঠুরতা বলে', তৎক্ষণাৎ আমি সে চড়ুই পক্ষী ছাড়িয়া দিলাম। সেই অবধি কোন পক্ষী আমি পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখি নাই। কিন্তু তবু দেখ, কত পক্ষী আমার মাথায়, আমার স্কন্ধে বসিয়া আমাকে আদর করে। আহা! আমার শালিক পাখিটিকে এখনও ভুলিতে পারি নাই। নিষ্ঠুরতা কাহাকে বলে, তাহা একপ্রকার বুঝিয়াছি। নীচলোকের ন্যায় কুভাষা ব্যবহার করা, উপায়

সত্ত্বেও তাহাদের ন্যায় ময়লা অবস্থায় দিন যাপন করা,—ইহাকেই বোধ হয় নীচতা বলে। কিন্তু মায়ের উপদেশ এখনও যে আমি ভালরূপে বুঝিয়াছি, তাহা বোধ হয় না।"

দশম অধ্যায়

পুণ্ডরীক-সংবাদ

বিনয় বলিলেন,—"কলিকাতায় আমাদের পাড়ায় পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যার্ণব নামে একটি লোক আছেন। সকলে তাঁহাকে পুণ্ডরীক ভট্টাচার্য অথবা ভট্টাচার্য মহাশয় বলিয়া ডাকে। নানা জাতির পুরোহিতগিরি করিয়া তিনি অর্থোপার্জন করিয়াছেন। তাঁহার একখানি সোনা-রূপার দোকানও আছে। তাহা হইতেও তিনি যথেষ্ট অর্থলাভ করেন। জাতি সম্বন্ধে গোল বাধাইয়াও লোকের নিকট হইতে তিনি টাকা লইতেন। এখন তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছেন। কিন্তু এক সময়ে আমাদের পাড়ায় তাঁহার বিলক্ষণ আধিপত্য ছিল। সমাজপতি বলিয়া সকলেই তাঁহাকে মান্য ও ভয় করিত। কথায় কথায় তিনি লোককে জাতিচ্যুত করিতেন। অন্যান্য লোক মেষপালের ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিত। তাহার কারণ এই যে, তিনি নিতান্ত শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। সকলে বলিত যে, এরূপ সাত্ত্বিক পুরুষ পৃথিবীতে অতি বিরল। বাজারের মিষ্টান্ন কখন তিনি ঘরে আনিতে দিতেন না। কলের জল কখন তিনি ব্যবহার করিতেন না। গঙ্গাজলে তাঁহার রন্ধন হইত, গঙ্গাজল তিনি পান করিতেন। এখনও তিনি সেইরূপ শুদ্ধাচারী আছেন বটে ; কিন্তু তাঁহার মানসম্ভ্রম অনেক কমিয়া গিয়াছে। পুণ্ডরীকের গুটিকত গল্প আমি করিব। সেই গল্প শুনিলেই মিথ্যাচরণ, নীচতা ও নিষ্ঠুরতা কাহাকে বলে তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে।

কলিকাতার নিকটে একখানি গ্রামে পুণ্ডরীকের বাস। সেই গ্রামে এক দুঃখিনী অনাথিনী বিধবা ব্রাহ্মণী এক কন্যা লইয়া বাস করিতেন। অর্থাভাবে ব্রাহ্মণী তাহার বিবাহ দিতে পারিতেছিলেন না। গ্রামের

লোক চাঁদা করিল। পুণ্ডরীককে সকলে বিলক্ষণ জানিত। তাই কেবলমাত্র একটি টাকা সকলে তাঁহার নামে ফেলিয়াছিল। এক টাকার অধিক কেহই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে নাই। পুণ্ডরীকের তাহাতে রাগ হইল। তিনি বলিলেন,—'কি! আমার নামে এক টাকা! সামান্য গৃহস্থ লোকেরা যখন কেহ দশ টাকা, কেহ পাঁচ টাকা দিতেছে, তখন আমার নামে কেবল এক টাকা! কন্যাটিকে আমি দুইগাছি সোনার বালা দিব। বরযাত্রীদিগের ভোজনের নিমিত্ত আমি একমণ সন্দেশ দিব।' ব্রাহ্মণীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। গ্রামের লোক বলিল,—'ভট্টাচার্য মহাশয়কে আমরা চিনিতে পারি নাই। বাহিরে উনি কিছু কৃপণ বটেন; কিন্তু ভিতরে উঁহার দয়া আছে।' ফলকথা, সকলেই পুণ্ডরীককে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। গ্রামের ময়রাকে ব্রাহ্মণী একমণ সন্দেশের আজ্ঞা করিলেন। যথাসময়ে পুণ্ডরীক তাঁহাকে দুইগাছি সোনার বালা আনিয়া দিলেন। বিবাহের রাত্রিতে তিনি নিজে দাঁড়াইয়া কর্তৃত্ব করিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনায়, তাঁহার সুমিষ্ট কথায় সকলে পরম পরিতোষ লাভ করিল। বরকর্তা বারোয়ারি প্রভৃতির টাকা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরদিন পুণ্ডরীক কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। পুণ্ডরীক এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। বারোয়ারি প্রভৃতির টাকা আজ পর্যন্ত গ্রামের লোক তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিতে পারে নাই। কিছুদিন পরে প্রকাশ হইল যে, কন্যাকে তিনি যে সোনার বালা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত সোনা নহে, গিল্টির বালা। যাহা হউক বরকর্তা ভদ্রলোক। দুঃখিনী বিধবা ব্রাহ্মণীকে আর পীড়ন করিলেন না। সন্দেশের মূল্য পুণ্ডরীক ময়রাকে দিলেন না। তিনি নিজে ময়রাকে আজ্ঞা করেন নাই, তাঁহার কথামত ব্রাহ্মণী আজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেজন্য ব্রাহ্মণী সেই টাকা অতিকষ্টে ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিলেন। পুণ্ডরীকের এইরূপ অনেক কীর্তি আছে। সেসব কথা বর্ণনা করিতে গেলে একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে।

তাঁহার তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্রকে ঘরে পড়াইবার নিমিত্ত

একজন শিক্ষক ছিলেন। এক বৎসর পুত্র পরীক্ষায় ভালরূপ উত্তীর্ণ হইয়াছিল। শিক্ষক কোনরূপ পুরস্কার প্রার্থনা করেন নাই, প্রত্যাশাও করেন নাই; কিন্তু মনের আনন্দে পুণ্ডরীক পুরস্কারস্বরূপ একটি আংটি দিলেন; বলিলেন যে,—'ইহা আসল হীরার আংটি, ইহার মূল্য একশত টাকা।' কিছুদিন পরে শিক্ষকের টাকার প্রয়োজন হইল। পুণ্ডরীকের কথার উপর নির্ভর করিয়া সেই অঙ্গুরী তিনি কোন লোককে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রয় করিলেন। কিছুদিন পরে ক্রেতার মনে সন্দেহ হইল। আংটি যাচাই করিবার নিমিত্ত তিনি বাজারে গমন করিলেন। যে দোকান হইতে পুণ্ডরীক অঙ্গুরী ক্রয় করিয়াছিলেন, দৈবক্রমে তিনি সেই দোকানে গমন করিলেন। দোকানদার বলিল যে,—'এ অঙ্গুরীয় আমি এক ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করিয়াছিলাম। ইহা প্রকৃত হীরক নহে, ইহা কাচ। আড়াই টাকা মূল্যে আমি ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করিয়াছিলাম। শিক্ষকের নিকট ক্রেতা টাকা ফিরিয়া চাহিলেন। শিক্ষক টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন, ফিরিয়া দিতে পারিলেন না। জুয়াচুরির অভিযোগ উপস্থিত করিয়া ক্রেতা শিক্ষকের নামে আদালতে নালিশ করিলেন। কয়দিন হাজতে বাস করিয়া, অনেক টাকা খরচ করিয়া, বহু কষ্টে শিক্ষক সে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন; কিন্তু মোকদ্দমার খরচের নিমিত্ত পিতা-পিতামহের যাহা কিছু ভূমি-সম্পত্তি ছিল, সে সমুদয় তিনি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। গরিব শিক্ষক সর্বস্বান্ত হইলেন।"

সুবালা বলিলেন,—"ছি ছি! পৃথিবীতে এমন লোকও থাকে!"

বিনয় বলিলেন—"এরূপ কাজকে চুরি-ডাকাতি বলিতে পারা যায় না। প্রবঞ্চনা বটে; কিন্তু সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবেও নহে। প্রবঞ্চনা করিয়া অন্যের নিকট হইতে লোক কিছু গ্রহণ করে; কিন্তু পুণ্ডরীকের প্রবঞ্চনা দানে, গ্রহণে নহে। বড়মানুষি দেখাইবার নিমিত্ত, দুইদিনের জন্য সুখ্যাতি লাভ করিবার নিমিত্ত তিনি এইরূপ মিথ্যা দান করিয়াছিলেন। ইহাকে মিথ্যাচরণ বলে।

নিজের কন্যার বিবাহেও পুণ্ডরীক এইরূপ কীর্তি করিয়াছিলেন। এত রৌপ্যনির্মিত দানসামগ্রী তিনি দিয়াছিলেন যে, কি বরযাত্র, কি

কন্যাযাত্র, সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল। সকলেই বলিল যে, রাজারাজড়াও এরূপ দানসামগ্রী দিতে পারে না। পুণ্ডরীকের মানসম্ভ্রম যার-পর-নাই বৃদ্ধি হইল। কিন্তু সে দুইদিনের জন্য। তাঁহার জামাতার পিতা দুই-একটি বাসন হাতে করিয়াই জানিতে পারিলেন যে, সে রূপার বাসন নহে। তাহার পর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, দানসামগ্রী বার আনা কলাই-করা তাম্রনির্মিত বাসন। তিনি ভদ্রলোক, এ কথা লইয়া আর গোলমাল করিলেন না। নূতন বৈবাহিকের গুণ তিনি ঢাকিয়া লইলেন। লোকের নিকট তিনি বলিলেন যে,—'ভট্টাচার্য মহাশয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত লোক, বাসন-বিক্রেতা তাঁহাকে ঠকাইয়া রূপার বাসনের পরিবর্তে কলাই-করা তামার বাসন দিয়াছে।' কিন্তু বন্ধুদিগের নিকট তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট আমি এত রূপার বাসন প্রার্থনা করি নাই। তবে মিছামিছি কেন তিনি এরূপ প্রবঞ্চনা করিয়াছেন? পরিবর্তে যদি তিনি পিতল-কাঁসার বাসন দিতেন, তাহা হইলে আমার কাজে লাগিত। কলাই-করা তামার বাসন লইয়া আমি কি করিব?"

একটু চুপ করিয়া বিনয় পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"স্পষ্টভাবে তিনি কখনও কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমি জানি না। তবে একজন গোয়ালাকে তিনি একবার অতি সামান্য বিষয়ে ফাঁকি দিয়াছিলেন। গোয়ালা ঘোল বেচিতে আসিয়াছিল। তাহার নিকট হইতে পুণ্ডরীক পূর্ণ একঘটি ঘোল লইলেন। ঘটিটি বাড়ির ভিতর লইয়া গেলেন। অন্যপাত্রে ঘোলটি ঢালিয়া ঘটিটি তিনি জলে পূর্ণ করিলেন। তাহার পর সেই একঘটি জল আনিয়া গোয়ালার হাঁড়িতে ঢালিয়া দিলেন। আশ্চর্যান্বিত হইয়া গোয়ালা জিজ্ঞাসা করিল,—'ও কি করিলেন মহাশয়?' পুণ্ডরীক উত্তর করিলেন,—'যা বেটা, এখন চলিয়া যা।' গোয়ালা জিজ্ঞাসা করিল,—'আমার পয়সা?' পুণ্ডরীক উত্তর করিলেন,—'পয়সা! পয়সা আবার কি? তোর তো যেমন ছিল, তেমনি হইল। তোর তো ঢক্‌কে ঢক্ বজায় হইল।

পয়সা আবার কিসের ?' এই বলিয়া তিনি তাহাকে বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিলেন।"

সুবালা হাসি সংবরণ করিতে পারিলেন না। হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন,—"কি আশ্চর্য! পৃথিবীতে এমন লোকও থাকে!"

বিনয় বলিলেন,—"আরও দুই-একটি পুণ্ডরীক-কাহিনী তোমাকে বলিতেছি। পুণ্ডরীকের জামাতা একবার শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ শ্যালক অর্থাৎ পুণ্ডরীকের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত তিনি পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। দৈবক্রমে পুণ্ডরীকের পুত্র গভীর জলে গিয়া পড়িল। সে সাঁতার জানিত না, সেই জন্য হাবুডুবু খাইতে লাগিল। জামাতা তাহার প্রাণরক্ষা করিতে গেলেন। ভগিনীপতিকে সে জড়াইয়া ধরিল। উভয়ে জলমগ্ন হইলেন। শত্রুঘ্ন বাগ্দী নামে একজন লোক নিকটে ছিল। পুণ্ডরীকের জামাতা ও পুত্রের প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত সে জলে গিয়া পড়িল। এই কার্যে কিছুক্ষণের নিমিত্ত তাহার নিজেরও প্রাণসংশয় হইল। যাহা হউক, অতি কষ্টে সে দুইজনের জীবনরক্ষা করিল। শত্রুঘ্ন বাগ্দীর একপাল ছেলেপুলে। ঘোরতর পরিশ্রম করিয়াও সে তাহাদিগকে উদর পূর্ণ করিয়া অন্ন দিতে পারিত না। সে ভাবিল,—"নিজের প্রাণ সংশয় করিয়া আমি এই দুইজনের জীবনরক্ষা করিলাম, নিশ্চয় ভালরূপ পুরস্কার পাইব।" তাহার আশা নিতান্ত ভিত্তিশূন্য ছিল না। কারণ, জামাতা তাঁহার পিতাকে লিখিয়া দশটি টাকা আনাইলেন। শ্বশুরমহাশয়কে তিনি বলিলেন,—"শত্রুঘ্ন বাগ্দী আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, তাহাকে পুরস্কার করিবার নিমিত্ত আমার পিতা দশ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।" পুণ্ডরীক উত্তর করিলেন,—'আমার পুত্রেরও সে প্রাণরক্ষা করিয়াছে। আমিও তাহাকে ভালরূপে পুরস্কার করিব। ও দশ টাকা আমাকে এখন দাও, তোমার ও আমার টাকা একসঙ্গে তাহাকে দিব।' জামাতা শ্বশুরের হাতে দশ টাকা অর্পণ করিলেন; কিন্তু সেই অবধি শত্রুঘ্ন বাগ্দী একটি পয়সাও পাইল না।

সুবালা বলিলেন,—"ছি ছি! কি জঘন্য লোক! কি নীচতা!"

বিনয় উত্তর করিলেন,—"হ্যাঁ, ইহাকে নীচতা বলে। সামান্য প্রবঞ্চনা ইহা নহে।"

বিনয় পুনরায় বলিলেন,—"একবার পুণ্ডরীক আপনার গ্রামে গিয়াছিলেন। গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র—সাত বৎসরের বালক—বন হইতে একটি খরগোশের ছানা ধরিয়াছিল। শশক-শাবকটিকে সে বড় ভালবাসিত, সর্বদা তাহাকে বুকে করিয়া রাখিত। নবীন শ্যামল দূর্বাদল ও কোমল নবপল্লব সংগ্রহ করিয়া অতি যত্নে তাহাকে প্রতিপালন করিত। শশক-শাবকটি দেখিয়া পুণ্ডরীকের লোভ হইল। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র তখন বালক ছিল। নিজের পুত্রের নিমিত্ত তিনি খরগোশ-ছানাটি লইতে ইচ্ছা করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট তিনি তাহা চাহিলেন। বালক বলিল,—'না জ্যেঠামহাশয়! খরগোশ-ছানাটি আমি আপনাকে দিতে পারি না। অতি কষ্টে আমি ইহাকে ধরিয়াছি। ইহাকে ধরিতে আমার পায়ে কত কাঁটা ফুটিয়াছিল, কাঁটা লাগিয়া ফালা-ফালা হইয়া আমার কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছিল।' তাহার কথায় পুণ্ডরীক সাতিশয় রাগান্বিত হইলেন। 'যেমন করিয়া পারি, খরগোশ-ছানাটি আমি লইব'—মনে মনে তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। বালক তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া খরগোশ-ছানাটি লুকাইয়া রাখিল। পরদিন প্রাতঃকালে পুণ্ডরীক চাদর লইয়া চলিয়া গেলেন। বালক মনে করিল যে, তিনি কলিকাতায় প্রতিগমন করিলেন। তখন সে লুক্কায়িত স্থান হইতে খরগোশ-ছানাটি বাহির করিয়া কচি কচি পাতা তাহাকে খাইতে দিল। তাহার পর বুকে লইয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিল। এমন সময় সহসা পুণ্ডরীক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালকের নিকট হইতে বলপূর্বক তিনি খরগোশ-ছানাটি কাড়িয়া লইলেন। বালক তাঁহার পায়ে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল,—'ও জ্যেঠামহাশয়! আমার খরগোশটি লইবেন না। ও জ্যেঠামহাশয়! বড় কষ্টে আমি ইহাকে ধরিয়াছি। এই দেখুন, আমার পায়ে কত কাঁটা ফুটিয়া গিয়াছে। এই দেখুন, কাঁটা লাগিয়া আমার হাত কত ছড়িয়া গিয়াছে। এই দেখুন, আমার হাতে এখনও ঘা রহিয়াছে।

ছানাটি ধরিতে আমার কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, বাবা তাহার জন্য আমাকে কত মারিয়াছিলেন।" আপনার পায়ে পড়ি, জ্যেঠামহাশয়! আমার খরগোশ-ছানাটি আপনি লইয়া যাইবেন না। এইরূপ খেদ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বালক পুণ্ডরীকের পায়ে আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতে লাগিল। তাঁহার পা দুইটি দুই হাতে ধরিয়া চক্ষুর জলে ভাসাইয়া দিল। কিন্তু পুণ্ডরীকের কিছুমাত্র দয়া হইল না। বালকের পিতা নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। শিশুপুত্রের মর্মভেদী কাতরোক্তি শুনিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু জ্যেষ্ঠ ধনবান, তিনি গরিব। ভয়ে তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না। বালকের মাতা ঘোমটা দিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাটিতে পড়িয়া ধূলায় ধূসরিত হইয়া শিশুপুত্র গড়াগড়ি দিতেছিল। তাড়াতাড়ি পুত্রকে তিনি কোলে লইলেন। মাতার বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া বালক নীরবে কাঁদিতে লাগিল। মাতার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। দুইজনের চক্ষু-জলে মাতার কাপড় ভিজিয়া গেল। পুণ্ডরীকের কিছুমাত্র দয়া হইল না। নিজের পুত্রের নিমিত্ত শশক-শাবকটি লইয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।"

সুবালা চক্ষুর জল সংবরণ করিতে পারিলেন না। বালক যেরূপ কাঁদিতেছিল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তিনিও সেইরূপ কাঁদিতে লাগিলেন, আর আঁচল দিয়া ক্রমাগত চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

তাঁহার কান্না দেখিয়া বিনয়ও চক্ষুর জল নিবারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার নেত্রদ্বয় ছলছল করিতে লাগিল। দুই-একটি অশ্রুবিন্দু তাঁহার চক্ষু হইতে ভূতলে পতিত হইল।

বিনয় বলিলেন,—"সুবালা, কাঁদিও না। যে স্থানে এই নৃশংস ব্যাপার সংঘটিত হয়, আমি তখন সেই স্থানে উপস্থিত ছিলাম। আমিও তখন বালক ছিলাম, সেই বালকের সহিত অনেক কাঁদিয়াছিলাম। সে নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিয়া পাড়ার লোক সকলেই কাঁদিয়াছিল। যাহা হউক, সে বালকের দুঃখ নিবারণ করিতে আমি সমর্থ হইয়াছিলাম। কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া পিতাকে আমি সকল কথা বলিলাম।

আমার বাবা সেই বালককে চমৎকার একজোড়া বিলাতি সাদা খরগোশ কিনিয়া দিলেন, তাহা পাইয়া বালকের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এত কাণ্ড করিয়া শশক-শাবক আনিয়া পুণ্ডরীক নিজের পুত্রকে দিলেন বটে, কিন্তু তাহা ভোগ হইল না। তিনদিন পরে ছানাটি মরিয়া গেল।”

একাদশ অধ্যায়
বৃদ্ধ বৈবাহিক

সুবালা বলিলেন,—“পাপকর্ম করিলে এইরূপ ফলই হয়।”

বিনয় বলিলেন,—“আর অধিক বলিব না। পুণ্ডরীক সম্বন্ধে কেবল আর-একটি গল্প বলিব। হাটখোলায় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। দোকানে সামান্য মুহুরিগিরি করিয়া তিনি দিনপাত করিতেন। একটি শিশুকন্যা রাখিয়া তাঁহার পত্নীর পরলোক হইয়াছিল। অতি যত্নে বৃদ্ধ সেই কন্যাটিকে প্রতিপালন করিতেছিলেন। প্রাণ অপেক্ষা কন্যাটিকে তিনি ভালবাসিতেন। তাহার বিবাহকাল উপস্থিত হইল। পুণ্ডরীকের কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত ঘটকে সম্বন্ধ করিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অল্প শুচিবাই ছিল। তিনি ভাবিলেন যে,—‘বরের পিতা ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ, পৌরোহিত্য ব্যবসা! তাঁহার ঘরে অখাদ্য-কুখাদ্য যায় না। এরূপ ঘরে পড়িলে কন্যা আমার শুদ্ধাচারে থাকিবে। ভট্টাচার্য মহাশয় ধনবান্ লোক। কন্যা সুখেও থাকিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি একটু তদন্ত করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে পূর্বে দুই বৈবাহিকের সহিত তিনি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিতেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হাবা-গোবা লোক ছিলেন। ঘটকেরা যাহা বলিল, তাহাই তিনি বিশ্বাস করিলেন। কন্যা সুখে থাকিবে,—এই প্রত্যাশায় পুণ্ডরীক যাহা বলিলেন, বৃদ্ধ তাহাই দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু সমুদয় গহনা, দান-সামগ্রী প্রভৃতি আহরণ করিতে ব্রাহ্মণ সর্বস্বান্ত হইলেন। এমন কি, তাঁহার

ঘটি-বাটি পর্যন্ত বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। পুরাতন একজোড়া শাল ছিল, তাহা পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল।

যাহা হউক, বিবাহ হইয়া গেল। প্রাতঃকালে বর-কন্যা লইয়া বরযাত্রগণ চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ মনে করিলেন যে,—'কন্যাদায় হইতে আমি উদ্ধার পাইলাম, এখন হইতে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু একঘণ্টা পরে একজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া বলিল যে,—'পুণ্ডরীক ভট্টাচার্য মহাশয় নব-পুত্রবধূকে ঘরে তুলিতেছেন না, কি গোল হইয়াছে। শীঘ্র আপনি চলুন।' দ্রুতগামী গাড়ি করিয়া ব্রাহ্মণ নূতন বৈবাহিকের গৃহে গমন করিলেন, তিনি দেখিলেন যে, দ্বারে গাড়ির ভিতর তাঁহার কন্যা বসিয়া আছে; প্রতিবেশীর যে চাকরাণী তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে তাহার নিকটে আছে। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, পুণ্ডরীক কোলের নিকট বাক্স রাখিয়া বসিয়া আছেন। কন্যাকে বৃদ্ধ যে গহনাগুলি দিয়াছিলেন, পুণ্ডরীক নিক্তিতে সেগুলি বারবার ওজন করিয়া দেখিতেছেন ও কষ্টিপাথরে ঘসিয়া তাহার সোনা পরীক্ষা করিতেছেন।

বৈবাহিককে দেখিয়া তিনি বলিলেন যে,—"ওজনে ঠিক আছে, কিন্তু সোনা ঠিক নহে। এ গিনি সোনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট সোনা। আপনি আমাকে গিনি সোনার অলঙ্কার দিতে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন।'

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—'সে কথা সত্য। পরে তাহার মীমাংসা হইবে; কিন্তু আপাততঃ আপনার পুত্রবধূ দ্বারে গাড়িতে বসিয়া আছে। তাহাকে বাটীর ভিতর আনয়ন করুন। যথারীতি বরণাদি করিতে স্ত্রীলোকদিগকে আজ্ঞা করুন।'

পুণ্ডরীক উত্তর করিলেন,—'এ কথার মীমাংসা না হইলে আপনার কন্যা আমি ঘরে লইব না। ইচ্ছা হয় আপনার কন্যাকে আপনি লইয়া যাউন। পুত্রের আমি পুনর্বার বিবাহ দিব। এরূপ শঠ জুয়াচোরের কন্যাকে আমার প্রয়োজন নাই।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—'আমি শঠ জুয়াচোর নই। গিনি সোনা দিয়া গহনা গড়িতে স্বর্ণকারকে আমি আজ্ঞা করিয়াছিলাম।

গিনি সোনার মূল্যও আমি তাহাকে দিয়াছি। স্বর্ণকার যদি কোনরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে দোষ আমার নহে।'

পুণ্ডরীক উত্তর করিলেন,—'দোষ কাহার, তাহা আমি জানি না, জানিতে ইচ্ছাও করি না। আমি এইমাত্র জানি যে, যদি স্বর্ণ-রৌপ্যের ব্যবসা না করিতাম, যদি স্বর্ণ-রৌপ্য পরীক্ষা করিতে না জানিতাম, তাহা হইলে আজ আপনি আমাকে বিলক্ষণ ঠকাইতেন। আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারি না। আপনার কন্যা আপনি ঘরে ফিরিয়া লইয়া যাউন।'

ব্রাহ্মণ আর তর্ক করিলেন না। পুণ্ডরীকের পা দুইটি ধরিয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুণ্ডরীকের পাষাণসদৃশ কঠিন হৃদয় ব্রাহ্মণের দুঃখে অণুমাত্র ব্যথিত হইল না। পাড়ার দুই-চারিজন ভদ্রলোক, পুণ্ডরীকের দুই-তিনজন কুটুম্ব সেই স্থানে বসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের দুঃখ দেখিয়া তাঁহারা দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা পুণ্ডরীককে বলিলেন,—'পুত্রবধূ ঘরে লইবেন না, সে কেমন কথা! পিতৃবংশের সহিত কন্যার এখন আর কোন সম্বন্ধ নাই। সে এখন আপনার বংশভুক্ত হইয়াছে। আপনার গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনার অশৌচ এখন তাহার অশৌচ। তাহার কোনরূপ অখ্যাতি হইলে আপনার অখ্যাতি। তাহা হইলে কি করিয়া আপনি পাঁচজনকে মুখ দেখাইবেন?"

এই সমুদয় কথা শুনিয়া পুণ্ডরীক কিয়ৎ-পরিমাণে ভীত হইলেন। বৈবাহিকের নিকট হইতে একশত টাকার খত লইয়া পুত্রবধূকে তিনি ঘরে তুলিলেন। 'তোমার কন্যাকে আর আমি তোমার নিকট পাঠাইব না। তুমি শঠ জুয়াচোর। কন্যাকে তুমি কুশিক্ষা প্রদান করিবে।'— এইরূপ কতকগুলি মধুর বাক্যদ্বারা নব বৈবাহিককে পরিতোষ করিয়া তিনি তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

পুণ্ডরীক ও তাঁহার স্ত্রী ভাবিতেন যে, পুত্রের বিবাহ দিয়া বৈবাহিকের উপর সর্বদাই চক্ষু রাঙ্গা করিয়া থাকিতে হয়, সর্বদাই তাহাকে দুই পা দিয়া থেঁৎলাইতে হয়। কয়েক মাস পরে সেই একশত টাকার জন্য তাগাদা আরম্ভ হইল। 'আমি সর্বস্বান্ত হইয়াছি, আমার আর কিছু

নাই, একবারে একশত টাকা প্রদান করি, সে ক্ষমতা আমার নাই; ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিব।'—এইরূপ মিনতি করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সময় প্রার্থনা করিলেন। পুণ্ডরীক সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ব্রাহ্মণের নামে তিনি নালিশ করিলেন, ডিক্রি করিলেন, ডিক্রি জারি করিলেন। কিন্তু বেচিয়া কিনিয়া লইবেন, ব্রাহ্মণের এরূপ কোন সম্পত্তি ছিল না। ডিক্রির টাকা আদায় হইল না। ব্রাহ্মণকে পুণ্ডরীক কারাবাসে পাঠাইলেন।

দুই মাস তিনি কারাগারে আবদ্ধ রহিলেন। অবশেষে একজন জ্ঞাতি পুণ্ডরীকের ঋণ পরিশোধ করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে খালাস করিয়া আনিলেন; নিজের বাটীতে তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। লজ্জায়, ঘৃণায়, মনোদুঃখে ব্রাহ্মণের শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল। অল্পদিন পরেই তিনি নিদারুণ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলেন।

তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত হইল। কন্যা ললিতাকে তিনি একবার দেখিতে চাহিলেন। পুণ্ডরীক পাঠাইলেন না। তিনি বলিলেন যে,—'ও পাপিষ্ঠ প্রতারকের নিকট আমি আমার পুত্রবধূকে পাঠাইব না। মৃত্যুকালে কন্যাকে সে কুশিক্ষা দিয়া যাইবে।'

বৈবাহিকের নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়াও কন্যাকে একবার দেখিবার বাসনা বৃদ্ধ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। জ্ঞাতি এবং অন্যান্য লোকদিগকে কাকুতি-মিনতি করিয়া ক্রমাগত তিনি বলিতে লাগিলেন,—'ওগো! তোমরা একবার আমার ললিতাকে আনিয়া দাও! একবার তাহার মুখখানি আমি দেখি। একবার তাহার দুই-একটি কথা শ্রবণ করি। যখন সে নিতান্ত শিশু ছিল, তখন আমার পত্নীর পরলোক হইয়াছিল। মাতার ন্যায় আমি কন্যাটিকে অতিযত্নে প্রতিপালন করিয়াছিলাম। আমি তাহাকে কখন কুশিক্ষা প্রদান করি নাই। পিতা হইয়া কন্যাকে কেহ কখন কি কুশিক্ষা প্রদান করে? জানিয়া শুনিয়া আমি বৈবাহিককে প্রতারণা করি নাই। আমি গিনি সোনার মূল্য দিয়াছিলাম। স্বর্ণকার যদি কোনরূপ বঞ্চনা করিয়া থাকে,

তাহা হইলে আমি কি করিব? আমি বৃদ্ধ, আমি পীড়িত। ও গো! একবার তোমরা আমার ললিতাকে আনিয়া দাও।'

মৃত্যুশয্যায় শায়িত দীন ক্ষীণ ব্রাহ্মণের কাতরোক্তি শুনিয়া সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। পুণ্ডরীকের নিকট বার বার তাঁহারা লোক পাঠাইলেন। অবশেষে সেই সমৃদ্ধিশালী জ্ঞাতি নিজে পর্যন্ত গমন করিলেন।. পুণ্ডরীক কিছুতেই বৃদ্ধের কন্যাকে পাঠাইলেন না।

শেষ অবস্থায় বৃদ্ধ জ্ঞানশূন্য হইলেন। বিকারের প্রলাপে ললিতার জন্য তিনি অবিরত বিলাপ করিতে লাগিলেন।—

'ললিতা আসিয়াছ! এস মা! এস। এত দিন তুমি আস নাই কেন মা? তুমি তো জান মা! যে, তোমাকে একদণ্ড না দেখিয়া আমি থাকিতে পারি না। তুমি তো জান মা! যে সন্ধ্যাবেলা দোকান হইতে আসিয়া আগে তোমাকে কোলে করিতাম। পায়ের নিকট বসিলে কেন মা? আমার এই হাতের নিকট ঠিক সম্মুখে এস। চক্ষুতে আর আমি ভাল দেখিতে পাই না। সব যেন অন্ধকার দেখিতেছি। সেইজন্য কাছে আসিতে বলিতেছি। তোমার মুখ আজ এত মলিন কেন মা? তোমার কাপড়খানি এত ময়লা কেন? তুমি বড় রোগা হইয়া গিয়াছ!'

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ একবার চমকিয়া উঠিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—'না, কই ললিতা তো আসে নাই! তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী তাহাকে তো পাঠান নাই। হায়, হায়! পৃথিবীতে এমন নিষ্ঠুর লোকও থাকে। মা ললিতা! শেষকালে তোমাকে একবার দেখিতে পাইলাম না!'—।"

বিনয় বলিলেন,—"এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে বৃদ্ধের প্রাণত্যাগ হইল। সেই জ্ঞাতির নিকট আমি এই সকল কথা শুনিয়াছিলাম। এখন দেখ, সুবালা! চড়ুই পাখির পায়ে সুতা বাঁধিয়া খেলা করা একরূপ নিষ্ঠুরতা, আর এ একরূপ নিষ্ঠুরতা। বালকের শশক-শাবক বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কারাবাসে প্রেরণ করা, শেষকালে

তাহার কন্যাকে একবার দেখিতে না দেওয়া,—এরূপ বিবরণ শ্রবণ করিলে সর্বশরীর শিহরিয়া উঠে। তুমি বোধ হয় জান, সুবালা যে, দানা দৈত্য ভূত প্রেত পিশাচগণ কখন কখন মানুষের দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে! তাহারাই এরূপ কার্য করিতে পারে। যাহারা প্রকৃত মানুষ, তাহারা এরূপ কার্য করিতে পারে না।

চুপ কর সুবালা! আর কাঁদিও না। একদিকে যেরূপ পুণ্ডরীকের ন্যায় পাপিষ্ঠদিগের নিষ্ঠুরতায় ধরণী তাপিতা হইয়া পড়েন, সেইরূপ অপর দিকে পরদুঃখ-শ্রবণজনিত তোমার মত লোকের চক্ষুজলস্বরূপ পুণ্যসলিলে সিক্ত ও সুশীতল হইয়া তিনি শান্তিলাভ করেন।

আমার বয়স অধিক হয় নাই সত্য; কিন্তু পিতা আমাকে উপদেশ দিয়াছেন। একবার পুণ্ডরীক সম্বন্ধে কি কথা হইতেছিল। পুণ্ডরীককে লক্ষ্য করিয়া পিতা আমাকে বলিলেন,—'দেখ বিনয়! পুণ্ডরীকের মত লোক কখনও সুখী হয় না। তাহার মন যদি উদ্‌ঘাটিত করিয়া নিরীক্ষণ কর, তাহা হইলে বুঝিবে যে, তাহার অন্তঃকরণ অশান্তিতে জর্জরীভূত হইয়া আছে। যতই ধন হউক না কেন, ধনের লালসা কখনই পরিতৃপ্ত হয় না। পুণ্ডরীক ধনবান হইয়াছে সত্য, কিন্তু ধনলালসা তাহার মন হইতে এখনও দূর হয় নাই। ধন দিয়া পুণ্ডরীক অনেক বস্তু ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু পুত্র-কন্যা প্রভৃতি প্রিয়জনের পরমায়ুকে ক্রয় করিতে পারে না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, যেদিন তাহার পাপবৃক্ষ পরিবর্ধিত হইয়া ফল উৎপাদন করিবে, যেদিন সেই ফল পরিপুষ্ট হইবে, সেইদিন পুণ্ডরীককে যমযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে হইবে।'

"বাস্তবিক তাহাই হইয়াছে। পুণ্ডরীকের সে তিন পুত্র ও তিন পুত্রবধূ এখন কোথায়?

যেমন পুণ্ডরীক, তেমনি তাঁহার পত্নী। তিনিও অতি শুদ্ধাচারিণী। তিনিও সর্বদা জপ করেন। যখন পুত্রবধূ ঘরে ছিল, তখন তিনি জপ করিতেন ও ভাবিতেন,—'কিরূপে বৈবাহিকের নিকট হইতে কিছু আদায় করিব, কিরূপ গালি দিয়া পুত্রবধূকে তাড়না করিব।' তিনি বলিতেন,—'বেটার বিবাহ দিয়াছি; বৈবাহিককে যেন-তেন-প্রকারেণ

ছুঁইয়া লইব না?' আহা! সে বেটার গৌরব এখন তাঁহার কোথায়?

বড় বৈবাহিক যথেষ্ট টাকা ও জিনিসপত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই পুণ্ডরীক ও তাঁহার পত্নীকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। বড় পুত্রবধূকে রাত্রিদিন তাঁহারা যন্ত্রণা ও গঞ্জনা দিতেন। পুণ্ডরীকের মধ্যম পুত্র তাহার সহিত অযথা তামাসা করিত। পুত্রবধূ কাঁদিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর নিকট নালিশ করিলে তাঁহারা কিছু বলিতেন না, বরং এই কার্যে মধ্যম পুত্রকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা পুত্রবধূর নামে কলঙ্ক রটাইলেন। জ্বালা, যন্ত্রণা, গঞ্জনা, তাহার উপর নিন্দা অপবাদ! বড় পুত্রবধূ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে সে হতভাগিনী গলায় দড়ি দিয়া মরিল।

মধ্যম বৈবাহিকের সহিত প্রথম হইতেই পুণ্ডরীকের মুখ দেখাদেখি ছিল না। পাড়াপ্রতিবেশীদিগের নিকট হইতে বড় বড় থালা প্রভৃতি বাসন চাহিয়া লইয়া তিনি ফুলশয্যার জিনিস পাঠাইয়াছিলেন। পুণ্ডরীক সে বাসন ফেরত দিলেন না। সেই সম্বন্ধে দুইজনের মনান্তর হইল। পুণ্ডরীক মধ্যম পুত্রবধূকে ঘরে আনিলেন না। কিছুকাল পিত্রালয়ে বাস করিয়া সে এক্ষণে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইয়া ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছে।

কনিষ্ঠ পুত্রবধূ অর্থাৎ হাটখোলার সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কন্যা ললিতা রোগে মারা গিয়াছে। পুণ্ডরীকের কন্যাও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

পুণ্ডরীকের জ্যেষ্ঠপুত্র মারামারি করিয়া জেলখানায় গিয়াছিল, কারাগারে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মধ্যম পুত্র টাকা-কড়ি সম্বন্ধে পিতার সহিত বিবাদ করিয়া আফিম খাইয়া মরিয়াছে। কনিষ্ঠ পুত্র রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। মানুষের দেহ অতি ক্ষণভঙ্গুর। পুণ্ডরীক-পত্নীর ন্যায় বেটার অহঙ্কার করিতে নাই।

পুণ্ডরীক ও তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত তাঁহার সংসারে এখন আর কেহ নাই। পুণ্ডরীক নিজেও অন্ধ হইয়া আছেন। এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও টাকার

মায়া তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। যতই বৃদ্ধ হইতেছেন, ততই যেন ধনলালসা তাঁহার বৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহার টাকা কে ভোগ করিবে, তাহার ঠিক নাই; কিন্তু তিনি এখন ভয়ানক কৃপণ হইয়াছেন। পয়সা খরচ করিতে তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যায়। তাঁহার গৃহিণী ভাল মাছ, ভাল তরকারি, ভাল জলখাবার গোপনে আনাইয়া ভোজন করেন; কিন্তু পুণ্ডরীক তাহা জানিতে পারিলে অনর্থ করেন। সেজন্য ঘরে থাকিলেও তাঁহার স্ত্রী কোন ভাল দ্রব্য তাঁহাকে দিতে সাহস করেন না। একদিন তাঁহার স্ত্রী গলদা চিংড়ি মাছের ঝোল করিয়া আহার করিতেছিলেন। ঝোল মাখিয়া ভাত খাইবার সময় সামান্য একটু সপ সপ শব্দ হইতেছিল। কোথায় কি হয়, কে কি খায়, সেজন্য অন্ধ সর্বদাই কান পাতিয়া থাকেন। অন্ধের কানে সেই সপ সপ শব্দ প্রবেশ করিল। হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অন্ধ বলিলেন,—'আমার সর্বনাশ হইল। আমি পথের ভিখারী হইলাম! তুমি দেখিতেছি, আজ ডাল রাঁধিয়াছ, তুমি আমার সর্বনাশ করিলে। ডাল রান্না! এত খরচ করিলে কুবেরের ধনাগারও শূন্য হইয়া যায়।' শঙ্কিত হইয়া স্ত্রী বলিলেন,— 'না গো, না! আমি ডাল রন্ধন করি নাই। ভাত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। একটু ফেন মাখিয়া খাইতেছি। সেইজন্য সপ সপ শব্দ হইতেছে।' সন্তুষ্ট হইয়া অন্ধ বলিলেন,—'বেশ! বেশ!' তবেই দেখ সুবালা! ঘরে ভাল দ্রব্য রন্ধন হইলেও স্ত্রী তাঁহাকে দিতে সাহস করেন না। একটু আলু ভাতে, কি একটু কাঁচকলা ভাতে দিয়া প্রতিদিন তাঁহাকে ভাত দিতে হয়। প্রচুর পরিমাণে ডাল থাকিলেও ভাত মাখিবার নিমিত্ত তাঁহাকে একটু ফেন দিতে হয়।'

সুবালা বলিলেন,—"কি অধর্মের ভোগ!"

বিনয় উত্তর করিলেন,—"হাঁ সুবালা! পৃথিবীর রহস্য কিছু বুঝিতে পারা যায় না। তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, কর্মের ফল নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হয়। আর একটি আশ্চর্য বিষয় এই যে পুণ্ডরীক ও তাঁহার পত্নীর মত লোকেরা নিজের দোষ দেখিতে পায় না। তাহারা মনে করে যে, আমরা যাহা করিতেছি, ইহা ধর্মসঙ্গত ভাল কাজ।

পুণ্ডরীক-পত্নী মনে করিতেছেন যে,—'আমি বেটার মা, পুত্রবধূগণ আমার বাঁদী। দিবারাত্রি তাহাদিগকে তাড়না করিব না কেন? আমি বেটার মা, বেহাইকে দুহিয়া লইব না কেন? বেহাই দিবে না কেন? যত দোষ বেহাই বেটাদের। অন্যায় কাজ তাহারা করিতেছে; আমি কোন অন্যায় কাজ করি নাই।' কিন্তু সুবালা! তোমার মন স্বভাবতঃ অতি পবিত্র। তোমাকে উপদেশ প্রদান করি, সে ক্ষমতা আমার নাই। তবে মিথ্যা আচরণ, নীচতা ও নিষ্ঠুরতা কাহাকে বলে, তাহার গুটিকতক দৃষ্টান্ত আমি প্রদান করিলাম।"

সুবালা বলিলেন,—"মৃত্যুকালে আমার মাতা যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এখন আমি অনেকটা বুঝিতে পারিলাম।"

দ্বাদশ অধ্যায়

শাঁকচুন্নির হাড়

বিনয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে বিজয়বাবুকে নিতান্তই তুমি পত্র লিখিবে?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"নিশ্চয় কল্য আমি তাঁহাকে পত্র লিখিব; কিন্তু একথা এক্ষণে তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। কাকামহাশয়, পিসীমা অথবা বড়ালমহাশয় একথা শুনিলে আমাকে পাগল মনে করিবেন, আর বড়ই গোলযোগ করিবেন। সেজন্য কাকামহাশয় এ স্থানে না আসিতে আসিতে বিজয়বাবুকে আমি পত্র লিখিব।"

বিনয় সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন; সুবালাও নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সুবালা বিজয়বাবুকে পত্র লিখিলেন,—"আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কিরূপ উইল করিয়াছিলেন, তাহা আপনি অবগত

আছেন। তাহার পর কি হইয়াছে, তাহাও আপনি জানেন। কিন্তু এখন আমি বুঝিয়াছি যে, এই সম্পত্তি আপনার, আমার নহে। অতএব আপনি আসিয়া আপনার সম্পত্তির ভার গ্রহণ করুন। আমি আমার কাকামহাশয়ের বাড়িতে চলিয়া যাই। আপনি এ স্থানে আগমন করিলে সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলিব। আমি সামান্য বালিকা, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র আসিবেন।"

কিছুক্ষণ পরে বিনয়কে সঙ্গে লইয়া বড়ালমহাশয় সুবালার নিকট আগমন করিলেন। তিনি বলিলেন,—"গতকল্য খাঁদা ভূত আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—একদিন রাত্রিতে বাগানে বসিয়া তুমি কি করিতেছিলে? তখন আমি কোন উত্তর প্রদান করি নাই। এস, আজ আমি তাহার উত্তর দিব। দুইটা শাঁকচুন্নি ও চপলার সমস্যা বোধ হয় তাহাতে মীমাংসা হইবে।"

বিনয় ও সুবালাকে সঙ্গে লইয়া বড়ালমহাশয় প্রথম নিম্নতলার পূর্বদিকে যে ঘরে ঘুঁটে ও কাষ্ঠ থাকে ও যে ঘরের জানালার গরাদ খুলিয়া খাঁদা ভূত বাটীর ভিতর আসিত, সেই ঘরে গমন করিলেন। বড়ালমহাশয় জানালার দুইটি কাষ্ঠনির্মিত গরাদ ধরিয়া টানিলেন। গরাদ দুইটি অনায়াসে তিনি খুলিতে পারিলেন। সেই পথে বাহির হইয়া তিনজনে বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বড়ালমহাশয় পুনর্বার গরাদ দুইটি জানালাতে দিয়া দিলেন।

জানালা হইতে প্রায় দশহাত দূরে দুইজন মালী ও একজন গ্রামবাসী দাঁড়াইয়াছিল। স্থান নির্দেশ করিয়া বড়ালমহাশয় তাহাদিগকে খনন করিতে বলিলেন। প্রথম সে স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহারা সরাইয়া ফেলিল। সুবালা ও বিনয় বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, মৃত্তিকার নিম্নে অনেকগুলি ইট পাশাপাশি সজ্জিত রহিয়াছে। দুইজন মালী ইটগুলি সরাইয়া ফেলিল। একখানি চতুষ্কোণ তক্তার পাট বাহির হইয়া পড়িল। বড়ালমহাশয় মালীদিগকে আদেশ করিলেন,—"পার্শ্বে বসিয়া সাবধানে তক্তাখানি তুলিয়া ফেল।"

তাহারা তাহাই করিল। একটি কূপ বাহির হইয়া পড়িল। আশ্চর্যান্বিতা হইয়া বিনয় ও সুবালা উঁকি মারিয়া দেখিলেন যে, কূপ শুষ্ক নহে, তাহার ভিতর জল আছে।

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"তোমাদিগকে এক্ষণে কিছু পূর্ব-বৃত্তান্ত বলিব, তবে তোমরা বুঝিতে পারিবে, এই বাটী ও এই সম্পত্তি রাজাবাবুর পিতৃ-পিতামহের নহে। ইহা আর-একজনের ছিল—তাঁহার বংশ এক্ষণে লোপ হইয়াছে। রাজাবাবুর পিতা পূর্বদেশের লোক। তিনি এই সম্পত্তি ক্রয় করেন। সম্পত্তি ক্রয় করিয়া এই গ্রামে আসিয়া তিনি বাস করিলেন। সেজন্য এ স্থানে রাজাবাবুর জ্ঞাতি-গোত্র, আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই। পূর্বদেশে থাকিলেও থাকিতে পারে। তাহা আমি জানি না। রাজাবাবুও বোধ হয় জানিতেন না।

যাঁহারা এই বাটী নির্মাণ করাইয়াছিলেন ও এই বৃহৎ বাগানের পত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এই কূপ খনন করাইয়াছিলেন। গ্রীষ্মকালে নদী শুষ্ক হইলে পুষ্করিণীর জল শুষিয়া লয়। বাগানের গাছ যখন ছোট ছিল, তখন তাহাতে জলসেচনের নিমিত্ত বোধ হয় ভূস্বামী এই কূপ খনন করাইয়াছিলেন। রাজাবাবুর সময়ে বৃক্ষসকল বড় হইয়াছিল, জলসেচনের আবশ্যকতা ছিল না। মানুষ কি গরু-বাছুর পাছে পড়িয়া যায়, সেজন্য কূপের চারিধার আমরা কাঠ দিয়া ঘিরিয়া রাখিতাম। রাজাবাবু একবার আমাকে বলিলেন,—'ও কূপটা আর কেন? কূপটা মাটি ফেলিয়া বুঝাইয়া দাও।'

আমি ভাবিলাম, কূপটা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিব না। সেজন্য রাজাবাবুর অনুমতি লইয়া চতুষ্কোণ তক্তার পাট প্রস্তুত করিলাম ও তাহা দিয়া কূপের মুখ চাপা দিলাম। তক্তা শীঘ্র পচিয়া যাইবে না, এই উদ্দেশ্যে তাহার উপর ইট বিছাইয়া দিলাম, তাহার উপর মাটি দিয়া বাগানের ভূমির সহিত সমান করিয়া দিলাম।

চারিদিকে খনন করিয়া ও গাছ কাটিয়া যখন আমি সোনার ইটের অন্বেষণ করিতেছিলাম, তখন একদিন কূপের কথা আমার স্মরণ হইল। আমি ভাবিলাম যে, কূপের মুখ গোপনে খুলিয়া রাজাবাবু হয়তো

তাহার ভিতর সোনার ইট লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। কূপের ভিতর সোনার ইট রাখিতে হইলে বাক্সর ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। কূপের ভিতর ঘটি পড়িয়া গেলে বঁড়শির ন্যায় বড় বড় লৌহ-কণ্টকের সহায়তায় লোক উপর হইতে উত্তোলন করে। দীর্ঘরজ্জুসংযুক্ত একগুচ্ছ সেইরূপ লৌহ-কণ্টক আমি সংগ্রহ করিলাম। একদিন রাত্রি দশটার সময় চুপি চুপি আসিয়া আমি কূপের মুখ হইতে মৃত্তিকা, ইট ও তক্তা সরাইয়া ফেলিলাম। তাহার পর রজ্জুর একদিক ধরিয়া বঁড়শিগুলি জলে নামাইয়া দিলাম। কাঁটাগুলি কূপের নিম্নে যখন মাটি স্পর্শ করিল, তখন তাহাদিগকে চারিদিকে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলাম যে, কূপের ভিতর বাক্স অথবা অন্য কোন দ্রব্য পড়িয়া আছে কি না। রজ্জু ধরিয়া নাড়িতে-চাড়িতেছি, এমন সময় আমার দক্ষিণ দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম। সর্বনাশ! দেখিলাম অতি অল্পদূরে খাঁদা ভূত দাঁড়াইয়া আছে। বলা বাহুল্য যে, আমি ঘোরতর ভীত হইলাম। দড়িটি আমার হাত হইতে স্খলিত হইয়া কূপের ভিতর পতিত হইল। কূপের মুখ সেইরূপ খোলা অবস্থায় রাখিয়া আমি রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলাম। তাহার পর অতি প্রত্যূষে আসিয়া কূপের মুখ যেমন বন্ধ ছিল, সেইরূপ বন্ধ করিয়া ফেলিলাম। পাছে কেহ জানিতে পারে যে, এ স্থানের মৃত্তিকা কে খনন করিয়াছিল, সেজন্য তাহার উপর শুষ্ক পত্রাদি ছড়াইয়া দিলাম।

দিনের বেলায় পাগলী আসিয়া বাগানে দাঁড়াইত এবং চপলা দোতলার জানালার ধারে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখা দিত,—একথা আমি জানিতাম। কিন্তু গতকল্য খাঁদা ভূত যখন জানালার গরাদের কথা বলিল, তখন আমার মনে সন্দেহ হইল।"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"হাঁ, আমারও মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছিল!"

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"তাহার পর ঘরে গিয়া বড়ালনী যখন শাঁকচুন্নির কথা উত্থাপন করিলেন, তখন আমার আরও সন্দেহ হইল। আমি ভাবিলাম যে, ত্রিলোচন ও শঙ্করা যে একজোড়া শাঁকচুন্নি

দেখিয়াছিল ও কল্পনাবলে তাহাদের অদ্ভুত আকৃতির পরিচয় দিয়াছিল এবং যাহাদের ভয়ে গ্রামবাসিগণ কিছুদিন সাতিশয় ভীত হইয়াছিল, সে জোড়া শাঁকচুন্নি পাগলী ও চপলা ব্যতীত আর কেহ নহে।"

সুবালা বলিলেন,—"আমার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, খাঁদা ভূতের সম্মুখ দিকে যে 'মা গো' শব্দ হইয়াছিল, সে শব্দ পাগলী করিয়াছিল। কারণ, তাহার অল্পক্ষণ পরেই পাগলী ভয় পাইয়া বাড়ি গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পাগলী একটা, অন্য শাঁকচুন্নিটা কে ?"

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—"অন্য শাঁকচুন্নি আমার বোধ হয় চপলা।"

সুবালা বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"চপলা! কি আশ্চর্য!"

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—"নিশ্চয় বলিতে পারি না, কিন্তু আমার বোধ হয় যে, সে চপলা। আমার অনুমান ঠিক কি না, এখনই জানিতে পারা যাইবে। তাহার মা বলিয়াছিল যে,—'পাগলী কেবল দিনের বেলায় বাগানে আসিয়া দাঁড়াইত। দূর হইতে ভগিনীকে দেখিয়া সে চলিয়া যাইত।' কিন্তু আমার বোধ হয়, সে রাত্রিকালেও চপলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। তখন চপলা গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। দুই ভগিনীতে কিছুক্ষণ কথোপকথন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিত। ঐ ঘরের জানালার গরাদ যে সহজে খুলিতে পারা যায়, চপলা কোনরূপে সে সন্ধান পাইয়াছিল। পাগলী বাগানে আসিয়া দাঁড়াইলে চপলা দোতলা হইতে তাহাকে দেখিতে পাইত। তাহার পর নীচে নামিয়া কাঠ ও ঘুঁটের ঘরের জানালার গরাদ খুলিয়া বাটী হইতে সে বাহির হইত। ঘর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় গরাদ দুইটি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিত। দুই ভগিনী কিছুক্ষণ বাগানে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিত; লোকে মনে করিত যে, তাহারা শাঁকচুন্নি। ভয়ে কেহ তাহাদিগের নিকটে যাইত না। সেজন্য কেহ তাহাদিগকে চিনিতে পারে নাই।"

বিনয় বলিলেন,—"আপনার অনুমান সত্য বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।"

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—"কূপের মুখ খুলিয়া তাহার ভিতর কাঁটা ফেলিয়া আমি অনুসন্ধান করিতেছিলাম। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবার মানসে খাঁদা ভূত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দেখিল, একটা মানুষ বসিয়া কিম্ভূতকদাকারভাবে হাত-পা নাড়িতেছে! এটা মানুষ কি ভূত, এইরূপ সন্দেহ করিয়া খাঁদা ভূত সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। আমার দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। কূপের মুখ খোলা রাখিয়া ভয়ে আমি পলায়ন করিলাম। খাঁদা ভূত আর অগ্রসর হইল না। আমাকে দেখিয়া তাহারও ভয় হইল। সে রাত্রি সে আর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল না। বাগানের পূর্বদিকে সে ফিরিয়া গেল। ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সেই সময় পাগলী আসিয়াছিল। উপর হইতে চপলা তাহার সাদা কাপড় দেখিতে পাইয়াছিল। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে চপলা দোতলা হইতে একতলায় নামিল, ঘুঁটের ঘরে প্রবেশ করিল, জানালার গরাদ দুইটি খুলিল, গরাদ দুইটি পুনরায় যথাস্থানে পরাইয়া দিল, অবশেষে ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে দৌড়িল। এদিকে পাগলী খাঁদা ভূতকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া, 'মা গো' বলিয়া পলায়ন করিল! ওদিকে চপলাও খোলা কূপের ভিতর পতিত হইল ও সেও সেই সময় 'মা গো' বলিয়া চীৎকার করিল। অতি প্রত্যূষে আসিয়া চুপি চুপি আমি কূপের মুখ বন্ধ করিয়া দিলাম। তাহার ভিতরে পড়িয়া জলে ডুবিয়া, চপলা যে মরিয়া গিয়াছে, সেকথা আমি কিরূপে জানিব? জানালার গরাদ যে খোলা যায়, তাহা দিয়া লোক যে যাতায়াত করিতে পারে, চপলা যে সে পথ দিয়া বাহির হয়, এ সমুদয় কথার বিন্দুবিসর্গ তখন আমি জানিতাম না! পাগলী যদি সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয় কতকটা সন্দেহ হইত। যাহা হউক, এক্ষণে আমার অনুমান ঠিক কি না, তাহা দেখিতে হইবে।"

দুইজন মালী ব্যতীত যে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিল বড়ালমহাশয়

তাহাকে কূপের ভিতর নামিতে বলিলেন। কিন্তু বিনয় তাহাকে নামিতে দিলেন না। বিনয় বলিলেন যে,—"এই পুরাতন কূপের বায়ু প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ইহার ভিতর দূষিত বায়ু থাকিলে, যে নামিবে সে মরিয়া যাইবে।" কূপের ভিতর বিনয় একটি জ্বলন্ত বাতি নামাইয়া দিলেন। বাতি নিবিয়া গেল না, জ্বলিতে লাগিল। তখন বিনয় সে লোকটিকে কূপের ভিতর নামিতে দিলেন। সে লোক উত্তমরূপ জলে ডুব দিতে পারিত, সেজন্য বড়ালমহাশয় তাহাকে আনিয়া ছিলেন। কূপে সে অবতরণ করিল। জলে ডুব দিয়া পুনরায় জলের উপর মাথা তুলিয়া সে বলিল,—"কূপের ভিতর কি আছে। একটা লম্বা দড়ি নামাইয়া দাও, তাহার অপর দিক তোমরা ধরিয়া থাক।"

মালী উপর হইতে একগাছি দড়ি নীচে নামাইয়া দিল, অপর দিক সে ধরিয়া রহিল। দড়ি ধরিয়া সে লোক পুনরায় ডুব দিল। কূপের ভিতর যাহা তাহার হাতে ঠেকিয়াছিল, তাহাতে সে দড়ি বাঁধিয়া দিল। পুনরায় জল হইতে মাথা তুলিয়া উপরের লোককে সেই দড়ি টানিতে বলিল। নয় দশ বৎসরের বালিকার কঙ্কাল সমস্ত না হউক, অনেকটা উপরে আসিয়া উঠিল। হাতের অস্থিতে এখনও গাছ কয়েক কাচের চুড়ি ছিল। চপলার হাতে সেই চুড়ি ছিল। সুবালা তাহা চিনিতে পারিলেন। সে সমুদয় যে চপলার অস্থি, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। কঙ্কাল হইতে যে হাড়গুলি বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, ক্রমে সেগুলি উপরে উঠিল। যে লৌহ-কণ্টকের গুচ্ছ বড়ালমহাশয়ের হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাও উপরে উঠিল। কূপের ভিতর আর কিছু ছিল না। সমুদয় অনুসন্ধান করিয়া কূপের ভিতর যে নামিয়াছিল, সে উপরে আসিয়া উঠিল।

গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিবার নিমিত্ত গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। চপলার মাতা দৌড়িয়া আসিল। ছাদের উপর পাগলী পায়রাদিগকে খাবার দিতেছিল। মায়ের ক্রন্দন শুনিয়া সেও দৌড়িয়া আসিল। হাতের অস্থিতে কাচের চুড়ি যে চপলার, গোয়ালিনীও তাহা চিনিতে পারিল। বলা বাহুল্য যে, চপলার

মাতা কূপের ধারে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল বড়ালমহাশয়ের আজ্ঞায় কূপটি এবার মাটি ফেলিয়া ভরাট করা হইল।

চপলা যে দৈবের ঘটনায় কূপে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে, একথা বিশ্বাস করিতে গ্রামের লোকের প্রবৃত্তি হইল না। খাঁদা ভূত যে তাহাকে খাইয়াছে, এ বিশ্বাস তাহাদের মন হইতে দূর হইল না। গ্রামের একজন প্রধান বিজ্ঞলোক গম্ভীর স্বরে বলিল,—"ভূত হাওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। মৃত্তিকা, ইট, তক্তা প্রভৃতি ভেদ করিয়া অনায়াসে তাহারা কূপের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। উপরে বন্ধ থাকিলে কি হয়, চপলাকে ধরিয়া খাঁদা ভূত অনায়াসে কূপের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। সেই স্থানে বসিয়া সে চপলার শরীরের সমস্ত মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল। কেবল মোটা মোটা হাড় ক'খানা চিবাইতে পারে নাই বলিয়া কূপের ভিতর ফেলিয়া গিয়াছিল। কাঁটা বাছিয়া তোমরা কইমাছ কি কখন খাও নাই ? হাড় বাছিয়া খাঁদা ভূত সেইরূপে চপলাকে খাইয়াছিল। তোমরা যখন কড়াইভাজা খাও, ছোট ছোট হাড়গুলি সেইরূপ সে কুড়্ কুড়্ করিয়া খাইয়াছিল।"

এ সঙ্গত কথা বটে। বড়ালমহাশয়ের অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত। সেজন্য খাঁদা ভূত যে চপলাকে খাইয়াছে—সকলের মনে সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল রহিল। জীয়ন্ত মানুষ খাঁদা ভূত বাড়ির ভিতর চোর-কুঠ্রীতে যে বসিয়া আছে, গ্রামের লোক তাহার কিছুই জানে না।

সুবালা বড়ালমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খাঁদা ভূত ও শাঁকচুন্নির সমস্যা মীমাংসা হইল। কিন্তু শুনিয়াছি যে, দিদিমণির পীড়ার সময় দিনকত গ্রামে ঘোরতর তুকৃতাকের উৎপাত হইয়াছিল। তুকের ভয়ে গ্রামের লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলাইবার উপক্রম করিয়াছিল। সে কে করিয়াছিল ? সকলে বলে যে, আপনার আজ্ঞায় সেসব কাজ হইয়াছিল।"

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—"তুকৃতাক গুণগান আমরা জানি না। গ্রামের লোককে ভয় দেখাইবার জন্য ধনুকধারী তামাসা করিয়া নেকড়ার পুঁটুলি প্রভৃতি পথে ফেলিত। তাহা আগে আমি জানিতাম

না। পরে জানিতে পারিয়া ধনুকধারীকে অনেক ভৎর্সনা করিয়াছিলাম। গৌরবিণী তিওরিণীর যখন উপার্জন কমিয়া আসিল, তখন সেও অন্য গ্রামে এই কাজ করিয়া আসিত।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিজয়বাবু

অপরাহ্নে সুবালাকে বিনয় বলিলেন,—"বাড়ি হইতে আমি মাতুলালয়ে আসিয়াছিলাম। সে স্থানে তোমার পত্র পাইলাম। আমার মাতাপিতা জানেন না যে, আমি এখানে আসিয়াছি। তাঁহাদের দুর্ভাবনা হইতে পারে। সেজন্য বাড়ি যাইব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এরূপ গোলযোগের ভিতর তোমাকে রাখিয়া কি করিয়া আমি যাই?"

সুবালা বলিলেন,—"যে পর্যন্ত বিজয়বাবু আসিয়া আপনার সম্পত্তি বুঝিয়া না লন, সে পর্যন্ত যদি থাকিতে পার, তাহা হইলে ভাল হয়। তুমি এখন যে জামা পরিয়া আছ, ইহার কাপড় অতি চমৎকার। ইহার কি মূল্য অধিক?"

বিনয় উত্তর করিলেন,—"ইহার মূল্য কি, তাহা আমি জানি না। কোনরূপ ভাল কাপড় দেখিলেই বাবা আমার জন্য ক্রয় করেন। সর্বদা আমি ভাল কাপড়-চোপড় পরিয়া থাকিলে আমার মাতাপিতার আহ্লাদ হয়। সেজন্য বাড়িতেও আমি মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকি। বিজয়বাবু আসিলে খাঁদা ভূত সম্বন্ধে তুমি কি করিবে?"

সুবালা বলিলেন,—"সে সোনার ইট এক্ষণে বিজয়বাবুর। খাঁদা ভূতের সহিত বড়ালমহাশয় যেরূপ নিয়ম করিয়াছেন, তাহা আমি তাঁহাকে বলিব। তিনি কি সে নিয়ম প্রতিপালন করিবেন না?"

বিনয় উত্তর করিলেন,—"নিশ্চয় করিবেন। বিজয়বাবু আসিলে আমি লুক্কায়িত থাকিব। তাঁহার সম্মুখে আমি বাহির হইব না।

তোমাদের সম্পত্তি সম্বন্ধে কথাবার্তা হইবে। আমি কে যে সে স্থানে উপস্থিত থাকিব। কোথায় তুমি তাঁহাকে স্থান দিবে? ভিতর বাড়িতে, না বাহির-বাড়িতে?”

সুবালা উত্তর করিলেন,—“এ বাড়ি তাঁহার। যেস্থানে ইচ্ছা, সেই স্থানে তিনি থাকিতে পারেন। তিনি আমার দাদামহাশয়ের ভ্রাতা। ভিতর বাড়িতে দাদামহাশয়ের ঘর তাঁহার জন্য আমি সজ্জিত করিতেছি।”

বিনয় বলিলেন,—“বেশ কথা! আমি বাহির-বাড়িতে লুক্কায়িত থাকিব। সেস্থানে দুটি দুটি ভাত আমার জন্য পাঠাইয়া দিবে, তাহার পর তোমাদের একটা ঠিক হইয়া গেলে আমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব।”

কুপের ধারে ভগিনীর হাড় দেখিয়া পাগলীর পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছিল। মাঝে মাঝে সে মূর্ছিত হইতেছিল। দুইদিন সে পশু-পক্ষীদিগকে আহার দিতে আসে নাই। বাগানে আতা পাকিয়াছিল। তৃতীয় দিনে তাহাকে গুটিকত আতা দিবার নিমিত্ত সুবালা প্রাতঃকালে গ্রামের ভিতর গমন করিয়াছিলেন।

আতা দিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় একবার পশ্চাৎ দিকে তিনি চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, একজন বিদেশী ভদ্রলোক কিছু দূরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। পাল্‌কি হইতে নামিয়া তিনি পদব্রজে আসিতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে আরও কতকটা দূরে বেহারাগণ ধীরে ধীরে খালি পাল্‌কি আনিতেছিল।

“ইনি কি বিজয়বাবু?”—এই চিন্তা সুবালার মনে একবার উদয় হইল।

আর একবার সুবালা ফিরিয়া দেখিলেন। না, ইনি বিজয়বাবু নহেন। বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, ভগদত্তের হাতী প্রভৃতি লক্ষণ বিন্দুমাত্র তাঁহাতে ছিল না। দিদিমণি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেবরের অতি ভয়ানক আকৃতি। ইঁহার আকৃতি সেরূপ নহে। ক্ষণমাত্র দেখিয়া সুবালা স্থির করিলেন যে, ইনি বিজয়বাবু নহেন।

পথের পার্শ্বে একটি টগরফুলের গাছ ছিল। শুভ্রবর্ণের ফুলে তাহার

শাখা-প্রশাখা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বিদেশী লোক আগে চলিয়া যাউক, —এইরূপ ভাবিয়া সুবালা সেই গাছের নিকট গিয়া মনোনিবেশ করিয়া ফুলগুলি দেখিতে লাগিলেন।

বিদেশী লোক নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ গো মা-লক্ষ্মী! রায়মহাশয়ের বাড়ি কি এই দিক্ দিয়া যাইতে হয়? অনেক দিন পূর্বে একবার আমি এই গ্রামে আসিয়াছিলাম। পথ ভুলিয়া গিয়াছি।"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"হাঁ। একটু আগে গেলেই তাঁহার বাড়ি দেখিতে পাইবেন।"

তিনি বলিলেন,—"তুমিও না এই দিকে যাইতেছিলে?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"হাঁ। আমিও রায়মহাশয়ের বাড়িতে যাইতেছিলাম।"

বিদেশী বলিলেন,—"তবে চল, আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইলে কেন?"

সুবালা বলিলেন,—"আপনি চলুন্। আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমি যাইতেছি।"

আগে বিদেশী, পশ্চাতে সুবালা, রায়মহাশয়ের বাটী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সুবালা ভাবিলেন যে,—"বিজয়বাবু নিজে না আসিয়া, বিষয় বুঝিয়া লইবার নিমিত্ত হয়তো এই লোকটিকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

দুই চারি পা গিয়া বিদেশী একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তবে তুমিই সেই পাগলী?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"না, আমি পাগলী নই। পাগলীর অসুখ হইয়াছে। তিনদিন সে আমাদের বাটীতে আসে নাই। তাহার মায়ের কাছে সে আছে, তাহাকেই আতা দিতে আমি গিয়াছিলাম।"

বিদেশী হাসিয়া বলিলেন,—"আর কে পাগলী আছে, তাহা আমি জানি না। যে পাগলী আমাকে চিঠি লিখিয়াছিল, তাহার কথা আমি বলিতেছি।"

এই কথা বলিবার নিমিত্ত সুবালার দিকে তিনি ফিরিয়াছিলেন।

ঘোরতর বিস্মিতা হইয়া সুবালা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। "তবে ইনিই বিজয়বাবু! কি আশ্চর্য! দিদিমণি ইহার আকৃতি-প্রকৃতির যেরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সহিত কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। কিম্ভূতকদাকার দূরে থাকুক, ইনি সুপুরুষ! বয়ঃক্রম চল্লিশ অথবা কিছু অধিক হইবে। কথাগুলি অতি সুমিষ্ট, আর হাসিটি কি মধুর! ইহার কথা উত্থাপনে পাপ আছে,—এমন কথা দিদিমণি কি করিয়া বলিয়াছিলেন! নিশ্চয় ইনি দেবতার তুল্য লোক। কেমন স্নেহের সহিত ইনি আমাকে পাগলী বলিলেন!"

মনে মনে সুবালা এইরূপ চিন্তা করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন,—"হাঁ, আমিই সুবালা, আমি আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম।"

বিজয়বাবু বলিলেন,—"কি করিয়া তুমি আমাকে লিখিলে যে, বিষয় আমার নহে, আপনার?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"এখন বাড়ি চলুন। সে সকল কথা পরে বলিব।"

অন্যান্য কথাবার্তায় দুইজনে বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলেন। "রায়মহাশয়ের ভাই আসিয়াছেন! রায়মহাশয়ের ভাই আসিয়াছেন!" বলিয়া একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বড়ালমহাশয় তখন বাড়ি ছিলেন না। অন্যান্য লোকে তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিল। সুবালা তাঁহাকে উত্তরদিকে সেই রায়মহাশয়ের ঘরে লইয়া গেলেন। কুটুম্বকে ভালরূপে ভোজন করাইবার নিমিত্ত পিসীমা নিজে রন্ধন করিতে বসিলেন। বিজয়বাবু কেন আসিয়াছেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না।

আহারাদির পর সুবালা বলিলেন,—"আপনি এখন তবে একটু বিশ্রাম করুন। বড়ালমহাশয় আমাদের কর্মচারী—"

বিজয়বাবু বলিলেন,—"বড়ালমহাশয়কে আমি জানি। বহুকাল পূর্বে একবার তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন তিনি এই বাড়ির মেজে খুঁড়িতেছিলেন।"

সুবালা হাসিয়া বলিলেন,—"হাঁ, সে সম্বন্ধে একটা কথা আছে, তাহাও আপনাকে পরে বলিব। আপাততঃ বড়ালমহাশয়কে কাগজপত্র প্রস্তুত করিতে বলি। বৈকালবেলা আমার কাকামহাশয়ের বাড়িতে আমি গমন করিব।"

বিজয়বাবু বলিলেন,—"দিনেরবেলা আমি শয়ন করি না। ব্যাপার কি বল দেখি ?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"বৃত্তান্ত কি, তাহা বলিবার পূর্বে আপনার নিকট আমার একটি নিবেদন আছে। আমার দুইটি অভিভাবক,—বাল্যকাল হইতে পিতৃমাতৃহীন এই বালিকাকে যাঁহারা প্রতিপালন করিয়াছেন,—আমার স্নেহে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া, আমার মঙ্গল কামনায় তাঁহারা একটি কাজ করিয়াছেন। কাজ যে নিতান্ত অন্যায়, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। যাঁহারা এ কাজে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে হইবে। আপনার পায়ে ধরিয়া আমি এই ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।"

এই বলিয়া সুবালা মাটিতে বসিয়া বিজয়বাবুর দুইটি পা ধরিলেন। অতি স্নেহের সহিত বিজয়বাবু তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিলেন। তিনি বলিলেন,—'না, মা! তুমি আমার পায়ে পড়িও না। দাদার সম্পর্কে তোমাকে আমার দিদি বলা উচিত। কিন্তু কি জানি কেন, প্রথম হইতেই তোমাকে আমার মা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। যেই তোমাকে প্রথম দেখিলাম, আর সেই শব্দ আমার মুখ দিয়া আপনা-আপনি বাহির হইয়া পড়িল! এত সম্পত্তির মোহ যে পরিত্যাগ করিতে পারে, সে দেবতা। তুমি মা লক্ষ্মীস্বরূপা! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যাহা তোমাকে আমি দিতে না পারি ? তোমার যাঁহারা মঙ্গল কামনা করিয়াছেন, তুমি না বলিলেও তাঁহাদিগকে আমি ক্ষমা করিতাম। এক্ষণে সত্য সত্য সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আমি তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলাম। কেমন ? এখন সন্তুষ্ট হইলে তো ?"

সুবালা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তবে যাই বড়ালমহাশয়কে ডাকিয়া আনি। এ সম্পত্তির আমি কিছুই জানি না। তিনি জানেন,

আর কাকামহাশয় জানেন। বড়ালমহাশয় সমস্ত বিষয় আপনাকে বুঝাইয়া দিবেন। যাই, তাঁহাকে ডাকিয়া আনি।"

বিজয়বাবু বলিলেন,—"এত ব্যস্ত হইও না। এই খাটের উপর আমার পার্শ্বে উপবেশন কর। এস দুইজনে গল্প করি। আমার জ্যেষ্ঠ তোমার দাদামহাশয়ের শেষকালে কি বড় কষ্ট হইয়াছিল ?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"তিনি পক্ষাঘাত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। উঠিতে বসিতে পারিতেন না। সেজন্য অতিশয় ক্লেশ হইয়াছিল।"

বিজয়বাবু বলিলেন,—"তুমি বোধ হয় জান যে, বড় ভাইয়ের ও তাঁহার পত্নীর সহিত আমার সদ্ভাব ছিল না। কেন, তাহা তোমার আবশ্যক নাই। কিন্তু আমার মনে কোন বিদ্বেষ ভাব ছিল না। যদি বল যে, তবে তুমি এখানে আসিতে না কেন ? পীড়িত হইলে তাঁহাদিগকে একবার দেখ নাই কেন ? তাহার উত্তর এই যে, আমি তাঁহাদের কোন উপকার করিতে পারিতাম না। তাহার উপর আমাকে তাঁহারা বিষ-নয়নে দেখিতেন। আমি আসিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতেন না, বরং অসন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের সংবাদ লইতাম। সেই সূত্রে তোমার কথাও আমি কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম। বড়-বৌ তোমার দিদিমণি বৃদ্ধা হইয়াছিলেন ?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"তাঁহার চুল পাকিয়াছিল। তবে খুব যে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার একখানি ছবি আছে,—দেখিবেন ?"

বিজয়বাবু বলিলেন,—"কোথায় আছে ? চল যাই, দেখি।"

পূর্বদিকের ঘরে যে স্থানে ছবি আছে, সেই দিকে দুইজনে বারান্দা দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। বিজয়বাবুর আগমনসংবাদ বিনয় পাইয়াছিলেন। সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি কি করেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত বিনয় অতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন,—"পূর্বদিকের সিঁড়ি দিয়া গোপনে উপরে বসিয়া থাকি। কোন লোকের দ্বারা সুবালার নিকট সংবাদ পাঠাইব। সুবালা আসিলে তাঁহার মুখ হইতে

সকল কথা অবগত হইব। খাঁদা ভূত এখন কি করিতেছে, তাহাও গিয়া দেখিব।" এইরূপ স্থির করিয়া বড়ালমহাশয়ের নিকট হইতে অন্ধকার ঘরের চাবি লইয়া তিনি চুপি চুপি পূর্বদিকের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলেন ও যে গৃহে রায়-গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল, সেইঘরের খাটে গিয়া বসিলেন। সেদিকে চাকর-চাকরানী কেহ আসিলে, তাহা দ্বারা সুবালাকে সংবাদ দিবেন, সেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বিজয়বাবু ও সুবালার কণ্ঠস্বর তিনি শুনিতে পাইলেন। বারান্দা দিয়া তাঁহারা সেই ঘরের দিকে আসিতেছিলেন। মাঝের দ্বারের তালা খুলিয়া তাড়াতাড়ি বিনয় অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলেন। মাত্রের উপর খাঁদা ভূত শুইয়াছিল। বিনয় বলিলেন,—"সুবালা ও আর একজন ভদ্রলোক পাশের ঘরে আসিতেছিলেন। নিঃশব্দে বসিয়া থাক, কথা কহিও না।" বিনয় ও খাঁদা ভূত চুপ করিয়া সেই ঘরে বসিয়া রহিলেন।

বিজয়বাবু ও সুবালা পার্শ্বের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার দক্ষিণ গায়ে চোরকুঠরী বা অন্ধকার ঘর,—যে স্থানে খাঁদা ভূতের সহিত বিনয় বসিয়া আছেন। ইহার উত্তর গায়ে আর একটি শয়নাগার,—যে স্থানে পূর্বে রাজাবাবু শয়ন করিতেন ও যে স্থানে পরে সুবালার মাতা বাস করিতেন।

বিজয়বাবুকে সুবালা দিদিমণির ছবি দেখাইলেন। ছবি দেখিয়া বিজয়বাবু বলিলেন,—"আমি যখন দেখিয়াছিলাম, তখন তাঁহার শরীর ইহা অপেক্ষা স্থূল ছিল।"

সুবালা বলিলেন,—"দিদিমণি ক্ষয়কাশ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সেজন্য কৃশ হইয়া গিয়াছিলেন।"

দুইজনে সেই ঘরে খাটের উপর উপবেশন করিলেন। রায়মহাশয় ও রায়-গৃহিণীর সম্বন্ধে নানা কথা হইতে লাগিল।

বিজয়বাবু বলিলেন,—"আমি শুনিলাম যে তোমার এখনও বিবাহ হয় নাই। সুবালা! সেই অবধি আমার মনে বড় আক্ষেপ হইতেছে। আমার এক পুত্র আছে,—একমাত্র পুত্র। অনেক দিন হইতে আমার গৃহিণী তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। আমি কথা

দিয়াছি। সে কথার কিছুতেই আর অন্যথা হইতে পারে না। আহা সুবালা! দুই বৎসর আগে যদি তোমায় দেখিতাম। কন্যা বলিয়া তোমাকে কোলে লইতে আমার বড়ই সাধ হইতেছে। প্রাণ ভরিয়া তোমাকে মা-জননী বলিয়া ডাকিয়া ঘরে লইতে বড়ই আমার বাসনা হইতেছে; কিন্তু মা কি করিব? কোন উপায় নাই!"

সুবালা মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। কোন উত্তর করিলেন না। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন,—"বড়ালমহাশয়কে বলিয়া আসি না কেন? কাগজপত্র প্রস্তুত করিতে বিলম্ব হইবে।"

বিজয়বাবু বলিলেন,—"পাগলি! আমি এ বিষয় লইব না। এ বিষয় তোমারই থাকিবে।"

সুবালা বলিলেন,—"উইল প্রকৃত নহে।"

বিজয়বাবু উত্তর করিলেন,—"উইল প্রকৃত কি কৃত্রিম, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না; তাহা আমি জানিতেও ইচ্ছা করি না। আমি এই জানি যে, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং আমার ভ্রাতৃজায়া তোমাকে এই সম্পত্তি দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

সুবালা বলিলেন,—"আইন অনুসারে সম্পত্তি যদি আমার না হয়, তাহা হইলে পরের সম্পত্তি আমি লইব কেন?" এমন সময়—

"হায়! হায়!! হায়! হায়!!"

বিজয়বাবু ও সুবালার কর্ণকুহরে সহসা এই কয়টি কথা প্রবেশ করিল।

—পুনরায়—"হা আমি হতভাগিনী! হায়! হায়! হায়! হায়!"

বামা-কণ্ঠস্বর। বারান্দা হইতে আসিতেছিল। নিদারুণ খেদোক্তি। হৃৎপিণ্ড ভেদ করিলে যেরূপ প্রবলবেগে রক্তধারা নির্গত হয়, সেইরূপ বক্তার ব্যথিত বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া যেন এই বিলাপবাক্যগুলি বাহির হইতেছিল।

বিজয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও কে?"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"জানি না। অপরিচিত লোক। চলুন, গিয়া দেখি।"

ঘর হইতে বাহির হইবার সময় সুবালা দেখিলেন যে, অন্ধকার ঘরের দ্বার খোলা রহিয়াছে। দ্বারে তিনি শিকল দিয়া দিলেন। সুতরাং বিনয় সে ঘর হইতে আর বাহির হইতে পারিলেন না।

ভাগ

প্রথম অধ্যায়

সোনা-বৌ

সুবালা ও বিজয়বাবু বাহির হইয়া দেখিলেন যে, অপর ঘরের নিকট বারান্দায় একজন অতি দীনহীনা মলিনবসনা ভদ্রমহিলা দাঁড়াইয়া ঐরূপ প্রলাপ বকিতেছেন। তাঁহার মুখ মলিন, তাঁহার সর্বশরীর মলিন—ধূলায় ধূসরিত হইয়া আছে। তাঁহার বয়স হইয়াছে, তাঁহার চুল পাকিয়া গিয়াছে, তাঁহার চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, তাঁহার চর্ম কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাঁহার শ্বেত-লোহিত-মিশ্রিত গৌরবর্ণ, মুখশ্রী ও শরীরের গঠন দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, সময়ে তিনি একজন অসামান্যা রূপবতী রমণী ছিলেন। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তিনি সেই ঘরের দিকে চাহিয়া আছেন। ঘরের ভিতর কে যেন আছে, তাহার সহিতই যেন তিনি কথা কহিতেছেন। কিন্তু সে দৃষ্টি অন্তরাত্মনিঃসৃত-প্রভা-বিশিষ্ট ছিল না। রমণীকে দেখিয়াই সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি ক্ষিপ্তা।

বিজয়বাবু ও সুবালা তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের প্রতি একবার তিনি চাহিয়া দেখিলেন। অপর দিক হইতে বাড়ির চাকর-চাকরানী, পিসীমা, বড়ালমহাশয়, বড়াল-গৃহিণী প্রভৃতি অনেকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেদিকেও দুই একবার তিনি দৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন কোন মানুষকে, কোন দ্রব্যকে গ্রাহ্য করিল না। বিকৃত মস্তকের বৃথা-কল্পনাগঠিত যে মানুষকে তিনি ঘরের ভিতর দেখিতেছিলেন, তাহার সহিত তিনি কথোপকথন করিতেছেন।

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে গা?"

সুবালার দিকে তিনি চাহিয়াও দেখিলেন না, কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন,—"আমি কে? শুনিলে রাজাবাবু! আমাকে ইহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে—তুমি কে? আমি সব। আমি এ বাড়ির সর্বেসর্বা। এ বাড়ি আমার, এ চাকর-বাকর আমার। এ জিনিস-পত্র আমার! পাগল! তাই জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, তুমি কে? আমি আর কে, আমি সোনা-বৌ, আমি আদরের সোনা-বৌ, আমি এই বাড়ির অধীশ্বরী।"

সুবালা বিজয়বাবুকে চুপি চুপি বলিলেন,—"পূর্বে এই বাড়ির যিনি কর্তা ছিলেন—বেণীবাবু, যাঁহাকে লোকে রাজাবাবু বলিত,—ইনি তাঁহার গৃহিণী।"

বিজয়বাবু চুপি চুপি বলিলেন,—"আমি জানি। বেণীবাবুর মৃত্যুকালে আমি তাঁহার নিকট ছিলাম। পরে এই সোনা-বৌয়ের কথাও কিছু কিছু শুনিয়াছি। ইনি দেখিতেছি—উন্মাদ হইয়াছেন।"

বড়ালমহাশয়ের আজ্ঞায় চাকর-চাকরানীগণ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। সেস্থানে উপস্থিত রহিলেন কেবল বিজয়বাবু, সুবালা, পিসীমা, বড়ালমহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী।

সোনা-বৌ পুনরায় আপনা-আপনি প্রলাপ বকিতে লাগিলেন, "—হায়! আমি একদিন রাজরানী ছিলাম। কিন্তু আজ আমি কি! হায়, হায়! আজ আমি কি! রাজাবাবু! রাজাবাবু! ওরূপ রুক্ষভাবে আমার উপর কটাক্ষপাত করিও না।"

দর-দর ধারায় সোনা-বৌয়ের দুই চক্ষু দিয়া বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

চক্ষু মুছিয়া,—"কি বলিলে? রাজাবাবু! তুমি কি বলিলে? আমাকে তুমি ঘরের ভিতর ডাকিতেছ? আমি দাসী, আমাকে তুমি যা বলিবে, তাই করিব। আহা রাজাবাবু! যদি তোমার মুখ হইতে সেকালের মতো একটি কথাও শুনিতে পাই, তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক হয়। আমার বুকের ভিতর রাত্রিদিন যে দাবানল জ্বলিতেছে, সে জ্বালা অনেকটা শীতল হয়।"

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া,—"রাজাবাবু! এই ঘরে আমরা দুইজনে কত হাসি হাসিয়াছিলাম, কত আহ্লাদ-আমোদে কালাতিপাত করিয়াছিলাম। পা ঝুলাইয়া গায়ে গায়ে দুই জনে খাটের উপর বসিতাম। তুমি বলিতে যে,—'সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত লোকে গহনা ও বস্ত্রাদি পরিয়া বেশভূষা করে, কিন্তু তোমার গায়ের বর্ণের নিকট সুবর্ণও বিবর্ণ হইয়া যায়।' সেজন্য আদরের তুমি আমাকে সোনা-বৌ বলিয়া ডাকিতে। আমার চুলের কোশা হাতে করিয়া তুমি বলিতে যে,—'লোকে আসিয়া দেখুক, আমার সোনা-বৌয়ের কেশগুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত বহুমূল্য রেশম অপেক্ষা অনেকগুণে উজ্জ্বল ও কোমল কি না!' নিবিড় হরিৎবর্ণের বনমধ্য দিয়া প্রবাহিত সূক্ষ্ম রজতরেখা-সদৃশ বর্ষাকালের গিরিনির্ঝরের সহিত তুমি আমার সিঁথির তুলনা করিতে। তুমি বলিতে,—সূর্যালোকে আলোকিত চন্দ্রমণ্ডলে কৃষ্ণহীরক-নির্মিত দুইটি তারা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে কেবল তাহার সহিত তোমার নয়নযুগলের তুলনা হইতে পারে। ঈষৎ রক্তিম আভায় রঞ্জিত তোমার গণ্ডদেশ দুইটি যদি কবিগণ কখনও দেখিতেন, তাহা হইলে প্রস্ফুটিতপ্রায় কমলদলের তাঁহারা প্রশংসা করিতেন না। কবি বলিয়াছেন যে, তাঁহার সুন্দরীর বেণীর শোভা দর্শনে ভুজঙ্গী লজ্জিতা হইয়া বিবরে প্রবেশ করিয়াছিল। বিবরে অতি সামান্য কথা। আমার সোনা-বৌয়ের ওষ্ঠদ্বয় দেখিয়া রক্তপলা সাগরগর্ভে গিয়া লুক্কায়িত হইয়াছে। মুক্তার লজ্জা আবার তাহা অপেক্ষা অধিক। অতল জলধিতে গিয়াও তাহারা সুস্থির হয় নাই। তোমার দন্তপাঁতি দেখিয়া মনের ঘৃণায় তাহারা শুক্তিগর্ভে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।' মনে আছে কি, রাজাবাবু! এইরূপ কত প্রকার উপমা দিয়া তুমি আমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করিতে?"

কপালে করাঘাত করিয়া, সোনা-বৌ পুনরায় বলিলেন,—"হায় হায়! আমি কি অভাগিনী যে, সে ভালবাসা হইতে আমি বঞ্চিত হইলাম। তোমার ভালবাসার কথা শুনিব বলিয়া কোন কোন দিন আমি মান করিয়া বসিয়া থাকিতাম। কত সুমিষ্ট সম্ভাষণে তুমি আমার সেই মান

ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে ? সেসব কথা শুনিয়া মনে আমার আনন্দ হইত ; কিন্তু আরও আদর পাইব বলিয়া আমি মুখ গম্ভীর করিয়া থাকিতাম। যখন দেখিতাম যে, তোমার ঘোরতর ক্লেশ হইতেছে, তখন ভাবিতাম, আর একবার সাধ্যসাধনা করিলেই মান ঘুচাইয়া তোমার সহিত কথা কহিব। কিন্তু যখন পুনরায় সুমিষ্ট স্বরে তুমি আমাকে সাধিতে, তখন এই হতভাগিনী অভিমানিনী হইয়া ঘোমটা টানিয়া মুখ আবৃত করিয়া বসিয়া থাকিত। শেষে যখন আমি মান সংবরণ করিতাম, তখন রাজাবাবু! তুমি স্বর্গসুখ লাভ করিতে। প্রফুল্লবদনে প্রীতিপূর্ণ লোচনে তখন যেরূপ আমার প্রতি দৃষ্টি করিতে, আজ একবার—কেবল একবার, নিমেষ মাত্রের জন্য,—সেই মধুরভাবাপন্ন কটাক্ষপাত করিয়া এ দুঃখিনীর দুঃখ নিরীক্ষণ কর। যাহার একটু মাথা ধরিলে তুমি দিশাহারা হইতে, আজ তোমার সোহাগের সেই সোনা-বৌয়ের মস্তক-অভ্যন্তর শত সহস্র বৃশ্চিক দ্বারা অহরহঃ দংশিত হইতেছে। ভালবাসা দূরে থাকুক, পীড়িতা তাপিতা দীন-দুঃখিনীর প্রতি তুমি যে দয়া করিতে, তোমার আদরের সোনা-বৌ আজ সে দয়ারও পাত্রী নহে!"

সোনা-বৌ মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। দুই হাতে চক্ষু আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত সুবালা তাঁহার নিকট গমন করিলেন। সুবালার হাত তিনি ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। বলিলেন, —"তুই ছুঁড়ি কে লা ? গেল যা! যাঃ!'

বিজয়বাবু সুবালাকে চুপি চুপি বলিলেন,—"এখন তুমি উহার নিকট যাইও না। শুন, আরও কি বলেন। মনের দুঃখ ব্যক্ত করিলে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিবেন।"

সোনা-বৌ পুনরায় দাঁড়াইয়া ঘরের একদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"রাজাবাবু! একবার তুমি এ দুঃখিনীর প্রতি কৃপা-কটাক্ষ করিলে না ? আমি পাপীয়সী, কৃপার পাত্রী আমি নই। হায় মা! এ হতভাগিনীকে কেন তুমি স্তনদুগ্ধে প্রতিপালন করিয়াছিলে ? সূতিকাগারে মুখে লবণ দিয়া কেন তুমি তাহার প্রাণবধ কর নাই ? মা! আমাকে ডাকিয়া লও মা! আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না।

রাজাবাবু! মুখে হাত দিয়া এইমাত্র আমি কত কাঁদিলাম। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, স্নেহের সহিত তুমি আমার হাত টানিয়া লইবে! মধুর বাক্যে তুমি আমাকে সান্ত্বনা করিবে। হায় হায়! পুরাতন কথা যে ভুলিতে পারি না। আমি কি করিব। কোথায় যাই!"

"এই ঘরে আমরা পরম সুখে কালযাপন করিতেছিলাম। গ্রামের লোক আমার নিকট জোড়হাত করিয়া থাকিত। দাস-দাসীগণ আমার পরিচর্যা করিত। বহুমূল্য বসন-ভূষণে আমি ভূষিতা হইয়া থাকিতাম। আমার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। আমি রাজরানী ছিলাম। সকল সুখের উপরে আমি স্বামি-সোহাগে সোহাগিনী হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতেও আমি তৃপ্তিলাভ করিলাম না। আমি জপ-তপ আরম্ভ করিলাম। তুমি রাজাবাবু, আমাকে অনেক পুস্তক আনিয়া দিয়াছিলে। ধর্মপুস্তক, গল্পপুস্তক আমরা দুইজনে একসঙ্গে পাঠ করিতাম। তাহাতে লেখা আছে যে, স্বামীই স্ত্রীলোকের জপ, স্বামীই তপ, স্বামীই তীর্থ, স্বামীই ধর্ম। সে উপদেশ আমার হৃদয় স্পর্শ করিল না।"

"ধিক্! ধিক্ আমাকে! ধিক্ আমার জপে! ধিক্ আমার তপে! সেই সময় হইতে, রাজাবাবু, তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি আরম্ভ হইল। আহারাদি সম্বন্ধে তোমার আচার-ব্যবহার একরূপ ছিল, আমার অন্যরূপ ছিল। ফুল-বিল্বদল দিয়া আমি ঠাকুরের পূজা করিতাম; তুমি ভগবানের প্রিয় কার্য সাধন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে। দুইজনে সেরূপ আর মনের মিল রহিল না।"

"তাঁহার পর কালসর্পকে তুমি বাড়িতে আনিলে। সে যে কালসর্প, তখন আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। তপস্বী-জ্ঞানে তাহাকে আমি পূজা করিতে লাগিলাম। এ বস্তু খাইবে, সে বস্তু খাইবে না,—ইহাই ধর্ম। প্রথম প্রথম তিনি দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। আমিও তাঁহার পূজা করিতে লাগিলাম। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি আমাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তুমি, রাজাবাবু, নানা বস্তু আহার করিতে; তিনি দুগ্ধ খাইয়া থাকিতেন। তাহাতে আমি বুঝিলাম যে, তুমি ঘোর অধার্মিক,

তিনি দেবতা। তোমার প্রতি ঘৃণা ও তাঁহার প্রতি ভক্তি দিন দিন আমার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি আমার গুরুদেব হইলেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঘোর অনুতাপ

বিজয়বাবু চুপি চুপি বড়ালমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কালা-বাবা? খাঁদা ভূত? যাহার নাক আমার নিকট আছে?"

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—"হাঁ। আমরা ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। সে মরে নাই। এই বাড়িতে এখন সে লুক্কায়িত আছে। বিধাতার লীলা বুঝিতে পারা যায় না। এতকাল পরে পুনরায় দুইজনকে তিনি একত্র করিয়াছেন।"

বিজয়বাবু বলিলেন,—"এই বাড়িতে সে লুক্কায়িত আছে? আশ্চর্য্য! বিধাতা আমাকে ঠিক এই সময়ে এ স্থানে আনিয়াছেন।"

সোনা-বৌ পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"রাজাবাবু! গুরুদেবকে তুমি বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিলে। সে যে কালসর্প, তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। সেইজন্য গুরুদেব বলিতেছি। নদীকূলে শিব-মন্দিরে গিয়া তিনি বাস করিতে লাগিলেন। তখন হইতে, রাজাবাবু, তোমার প্রতি আমার ঘোরতর অভক্তি হইল। তোমার নিকট থাকিতে, তোমার নিকট বসিতে আমি একেবারেই ইচ্ছা করিতাম না। প্রথম তুমি আমাকে অনেক বুঝাইলে, অনেক উপদেশ দিলে। তোমার উপদেশ আমি গ্রহণ করিলাম না। তোমার কথা আমার কানে যেন বিষ ঢালিয়া দিল।"

"নীচের ঘরে যে জানালা আছে, তাহার দুইটি কাঠের গরাদ গুরুদেব শিথিল করিয়া দিলেন। সেই পথ দিয়া গভীর রাত্রিতে গোপনে তিনি এই বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেন। কখন বা আমিও তাঁহার নিকট গমন করিতাম। ক্রমে তিনি আমাকে শিক্ষা দিলেন যে,—'দেবীর পূজায়

সুরা আবশ্যক। ইহাকে কারণ বলে।' দেবী-পদে অর্পিত সুধা প্রসাদ-স্বরূপ আমিও পান করিতে শিক্ষা করিলাম। ক্রমে এতদূর অভ্যাস হইল যে, সুরাপান না করিয়া আমি থাকিতে পারিতাম না। সে সময় যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিত যে, তুমি সুরা চাও, কি প্রাণ চাও? অকাতরে আমি বলিতে পারিতাম যে, আমি সুরা চাই, প্রাণ চাই না।"

"রাজাবাবু! ধন্য সহ্য তোমার। তুমি সব জানিতে। আমি স্ত্রীলোক, সেজন্য তুমি আমার গায়ে হাত তুলিতে না। কিন্তু আমার প্রতি তোমার ঘোরতর ঘৃণা হইয়াছিল। আমাকে উপদেশ প্রদানে তুমি ক্ষান্ত হইলে। বৃক্ষাবলম্বিনী বিষময়ী লতাকে ছিঁড়িয়া বন্যহস্তী যেরূপ পদদলিত করে, তোমার হৃদয় হইতে আমাকে সেইরূপ ছিঁড়িয়া, মনে মনে তুমি পদদলিত করিতে লাগিলে। আমি তখন গর্ভবতী। সেইজন্য তুমি বোধ হয় আমাকে বাড়ি হইতে দূর করিলে না। পাছে তুমি সুরার গন্ধ পাও, সেই জন্য পূর্ব হইতেই আমি ঐ পার্শ্বের ঘরে শয়ন করিতেছিলাম। তুমি কিছুমাত্র আপত্তি করিলে না।"

"আমাদের খুকী হইল। ঐ পার্শ্বের ঘরে খুকীকে লইয়া আমি শয়ন করিতাম। খুকীর দাই—মন্দাকিনী, নিম্নে মেজেতে শয়ন করিত। খুকী শিশু। পাপ-পুণ্যের বিষয় সে কি জানে! রাজাবাবু, তুমি দয়াময়। সকল জীবের প্রতি তোমার দয়া ও ভালবাসা। নিরীহ খুকীর প্রতি তুমি মন ও প্রাণ সমর্পণ করিলে।"

"কিন্তু আমি? আমি পাপিষ্ঠা—খুকীকে গলগ্রহ বলিয়া বিবেচনা করিলাম। মাঝে মাঝে মন্দাকিনীকে আমি ছুটি দিতাম। সে আপনার ঘরে চলিয়া যাইত। খুকীকে একেলা ফেলিয়া গভীর রাত্রিতে আমি শিবমন্দিরে চলিয়া যাইতাম।"

"ও ঘরে যাইতে আজ্ঞা করিতেছ? যেস্থানে খুকী একেলা পড়িয়া থাকিত, সেই স্থান পুনরায় আমাকে দেখিতে বলিতেছ? আচ্ছা রাজাবাবু, চল তবে ও ঘরে যাই।"

দুই ঘরের মাঝে দ্বার ছিল। সে দ্বার দিয়া সোনা-বৌ অপর ঘরে

প্রবেশ করিলেন। যে ঘরে রায়-গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল, এ সেই ঘর। বিজয়বাবু, সুবালা, পিসীমা, বড়ালমহাশয় ও বড়াল-গৃহিণী, সকলেই অবাক হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই ঘরে গমন করিলেন।

সোনা-বৌ বলিলেন,—“এই খাটের উপর আমি শয়ন করিতাম। খুকী আমার কাছে থাকিত। নীচে ঐ স্থানে মন্দাকিনী শুইয়া থাকিত।

খুকী ছয় মাসের হইল। সে হাসিতে শিখিল। তাহার শিশুমুখের হাসি ও তোমার সহাস্যবদন একত্র হইয়া কেমন এক অপূর্ব শোভা উৎপাদন করিত। কিন্তু তখন আমি অন্ধ ছিলাম। সে শোভা তখন আমার নয়নগোচর হইত না। বরং রাজাবাবু, মনে মনে তোমাকে আমি তখন বিদ্রূপ করিতাম। আমি ভাবিতাম,—‘এত কেন? কন্যা কি কাহারও হয় না!’

খুকী ছয় মাসের হইল। দাঁত উঠিবার উপক্রম হইল। সেই সূত্রে তাহার জ্বর হইল। সমস্ত দিন তুমি তাহাকে বুকে করিয়া রহিলে। রাত্রিতে তাহাকে লইয়া আমি শয়ন করিলাম। খুকীর অসুখ; তথাপি মন্দাকিনীকে আমি ছুটি দিলাম। গ্রামের ভিতর আপনার বাড়ি সে চলিয়া গেল। দুই শয়নাগারের মধ্যস্থলের দ্বার তুমি খোলা রাখিয়াছিলে। আস্তে আস্তে আমি বন্ধ করিয়া দিলাম। খুকীর অসুখ। রাক্ষসী মা আমি তাহাকে ফেলিয়া আমি চলিয়া গেলাম!

শেষ রাত্রিতে বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। দেখিলাম যে, আমার শয়নঘরে আলো জ্বলিতেছে। তখন আমার শরীরের ও মনের স্থিরতা ছিল না। আমার মুখ দিয়া গন্ধ বাহির হইতেছিল। আলো দেখিয়া আমার বিকল শরীর অনেকটা স্থির হইল। সভয়ে আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম যে, হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্সটি নিকটে রাখিয়া খুকীর পার্শ্বে তুমি বসিয়া আছ। একহাত মুঠা করিয়া খুকী তোমার হাত ধরিয়া আছে। মুখ তুলিয়া একবারমাত্র তুমি আমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে। তাহার পর পুনরায় মস্তক অবনত করিয়া খুকীর মুখপানে চাহিয়া রহিলে। ভয়ে ভয়ে আমি খুকীর অপর পার্শ্বে

গিয়া বসিলাম। তাহার অন্য হাতটি আমি ধরিলাম। আমার হাত সে মুঠা করিয়া ধরিল না। রাক্ষসী মাতাকে স্পর্শ করিতে যেন তাহার ঘৃণা বোধ হইল।

.. তুমি কোন কথা বলিলে না। একটি কথাও তুমি আমার সহিত কহিলে না। তখনও না, পরেও না। খুকীর তড়কা হইল। অনেকক্ষণ পরে সেবারের তড়কা হইতে সে অব্যাহতি পাইল।"

"প্রাতঃকালে ডাক্তার অসিল। কোন ফল হইল না। আরও তিনবার তড়কা হইল। রাক্ষসী মাকে পরিত্যাগ করিয়া এ পাপ ইহধাম হইতে খুকী চলিয়া গেল! হায় রাজাবাবু, তোমার সহিত আমার যে সামান্য বন্ধন ছিল, জনমের মতো তাহাও ছিন্ন হইয়া গেল।"

খাটের উপর উপবেশন করিয়া, দুই হস্ত দ্বারা মুখ ঢাকিয়া সোনা-বৌ পুনরায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে চক্ষু মুছিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সেইদিন হইতে আমরা বুঝিলাম যে, আর আমাদের মঙ্গল নাই। আমরা আর কে?—গুরুদেব ও আমি। ধ্যানস্থ হইয়া গুরুদেব দেখিলেন যে, তুমি দেবীর ভক্ষ্য। তোমাকে বলি দিতে পারিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়। গুরুদের পুনরায় ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন যে, শূলিনী দেবীর ভক্ষ্য। তোমাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত শূলিনী দেবী মুখব্যাদান করিয়া আছেন।"

"এ নিষ্ঠুর প্রস্তাবে প্রথম আমি সম্মত হই নাই; কিন্তু গুরুদেব নানা প্রকার শাস্ত্রের বচন বলিয়া আমাকে প্রবোধ দিলেন। তিনি বলিলেন,—স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর প্রিয়বস্তু নাই। দাতাকর্ণ বা কি করিয়াছিলেন। তাহা অপেক্ষা স্বামী-বলি শতগুণ ফলপ্রদ। স্বয়ং ইন্দ্র স্বর্গ হইতে পুষ্পক রথ প্রেরণ করিবেন। তাহাতে আরোহণ করিয়া আমরা তিনজনে স্বর্গে গমন করিব।"

"গুরুদেব সকল বস্তুর আয়োজন করিলেন। যে ঔষধ আঘ্রাণ করিলে লোক অচেতন হয়, প্রথম তিনি সেই ঔষধ সংগ্রহ করিলেন। শূলিনী দেবীকে বলি প্রদত্ত হইবে, সেজন্য শূলপ্রয়োগে বধ করিতে

হইবে। কাঠের বাঁট-সম্বলিত তীক্ষ্ণাগ্র লৌহনির্ম্মিত ছোট একটি শূল তিনি গড়াইলেন। কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত অনেকগুলি নির্ধূম কয়লা সংগ্রহ করিয়া তিনি এই খাটের নীচে লুক্কায়িত রাখিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, গভীর রাত্রিতে, তুমি রাজাবাবু, যখন নিদ্রিত থাকিবে, তখন ঔষধ আঘ্রাণে তোমাকে অজ্ঞান করা হইবে; তাহার পর আমার এই ঘরে কয়লার আগুন করিয়া, সেই অগ্নির উত্তাপে লৌহনির্মিত শূলকে রক্তবর্ণ করিতে হইবে। তিনি মন্ত্রপাঠ করিতে থাকিবেন, আর আমি সেই উত্তপ্ত শূল তোমার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিব। উত্তপ্ত শূলপ্রয়োগে শরীরের ভিতর নাড়ীভুঁড়ি সমুদয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও দগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তোমার মৃত্যু হইবে। শরীরের বাহিরে কোনরূপ চিহ্ন থাকিবে না।"

সোনা-বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"ওঃ! কি নিষ্ঠুরতা! মনে করিতে গেলে আমার শরীর এখনও শিহরিয়া উঠে। রাজাবাবু! আমার ন্যায় পাপীয়সী রাক্ষসী পৃথিবীতে আর কে আছে? আমার মনে হয় যে, আমি মানবী নই, আমি পিশাচী। ক্ষমা?—এ পাপের ক্ষমা নাই। রাজাবাবু! তোমার নিকট ক্ষমা চাইতেও আমার লজ্জা বোধ হয়।

নির্দিষ্ট দিনে সমুদয় আয়োজন হইল। ঘোর রাত্রিতে বাড়ির লোক সকল যখন সুষুপ্ত হইল, তখন গুরুদেব জানালা-পথে নিঃশব্দে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলেন। তুমি রাজাবাবু, অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া ছিলে। একখানি রুমাল ঔষধে সিক্ত করিয়া, তাহা দ্বারা তোমার মুখ ও নাসিকা আমরা চাপা দিলাম। হাত দিয়া তুমি মুখ হইতে রুমাল দূর করিতে চেষ্টা করিলে। আমরা তোমার হাত ধরিয়া রহিলাম। তুমি পাশ ফিরিতে চেষ্টা করিলে। তাহাও আমরা বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলাম। অবিলম্বে তুমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলে। কয়লার আগুন করিয়া তাহার ভিতর লৌহশূল কিছুক্ষণের নিমিত্ত প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলাম। উত্তাপে লোহিতবর্ণ হইয়া শূল গনগন করিতে লাগিল। সে সময় তাহার আকার সাক্ষাৎ যমস্বরূপ অতি

ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। মন্ত্রপূত করিয়া গুরুদেব সেই শূল আমার হস্তে প্রদান করিলেন। মন্ত্রদ্বারা শূলিনী দেবীর তিনি আরাধনা করিতে লাগিলেন ও শূলপ্রয়োগ করিবার নিমিত্ত বার বার তিনি আমাকে আদেশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে নিষ্ঠুর কাজ করিতে আমি পারিলাম না। আমার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। হস্ত কম্পিত হইয়া রক্তবর্ণ শূল আমার পরিধেয় বস্ত্রে লাগিয়া গেল। কাপড় তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠিল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সেই জ্বলন্ত কাপড় ও উত্তপ্ত শূল ঘরের মাঝে ফেলিয়া আমি সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম।"

বড়ালমহাশয় বিজয়বাবুকে চুপি চুপি বলিলেন,—"সে শূল আমি দেখিয়াছি। রাজাবাবু যখন বিদেশে গমন করিলেন, তখন তাঁহার চাকর বীরু সেই শূল সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। তা না হইলে আপনাকে আমি দেখাইতে পারিতাম।"

সোনা-বৌ বলিতে লাগিলেন,—"আমার চীৎকার শুনিয়া বীরু দৌড়িয়া আসিল। বড়ালমহাশয় আসিলেন। গুরুদেবকে বীরু ধরিয়া ফেলিল। তোমাকে সচেতন করিল। তাহার পর যাহা হইল, তাহা আর আমি কি বলিব!

পলায়ন করিয়া আমি আমার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। অন্য-একখানি কাপড় পরিধান করিলাম। সম্মুখে টাকা-কড়ি, গহনা-পত্র যাহা কিছু পাইলাম, তাহা লইয়া বাটী হইতে বাহির হইলাম। শিবের মন্দিরে গিয়া মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে গুরুদেব গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম যে, তোমরা তাঁহার নাসিকা কর্তন করিয়াছ। তাঁহার বক্ষঃস্থল রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। একখানি কাপড় ছিঁড়িয়া জলে ভিজাইয়া আমি তাঁহার মুখে বাঁধিয়া দিলাম। তিনি নালিশ করিবার প্রস্তাব করিলেন। আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না।

প্রাণভয়ে গুরুদেব এ গ্রাম হইতে পলায়ন করিলেন। পিতৃকুলে, মাতুলকুলে, কোন কুলে আমার স্থান ছিল না। আমি তাঁহার সঙ্গে

গমন করিলাম। প্রথমে আমরা কাশী যাইলাম। ক্রমে হিমালয় পর্বতে গিয়া উঠিলাম। সে স্থানে বড় শীত। দূরে আবৃত শ্বেতবর্ণের পর্বতশ্রেণী দেখিতে পাইলাম। তাহার পর পাহাড় হইতে নামিয়া নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া বৃহৎ একটি নগরে গিয়া পৌঁছিলাম।

ক্রমে আমার চক্ষু উন্মীলিত হইল। আমি যে অতি মহাপাতকে পাতকিনী হইয়াছি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। ইহ-জীবনে এ পাপের ক্ষমা নাই, তাহা জানিয়া আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। 'এ জীবনে আমাকে কেহ আর আদর করিবে না। সকলেই আমাকে দূর দূর করিবে।'—এই সমুদয় ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঘোর অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইল। কালা-বাবাকে গুরু বলিতে আর আমার প্রবৃত্তি হইল না। সে যে আমার ঘোর শত্রু, সে যে আমার সর্বনাশ করিয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। রাত্রি দিন আমি তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম। আহা! রাজাবাবু, কেন তুমি সে কালসর্পকে ঘরে আনিয়াছিলে?"

"সেই পিশাচ, আমার গহনা ও টাকাকড়ি যাহা ছিল, তাহা লইয়া একদিন গোপনে প্রস্থান করিল। বিদেশে বিভূমিতে আমাকে একাকিনী ফেলিয়া নরাধম চলিয়া গেল। সে দেশের লোকের কথা আমি বুঝিতে পারি না, তাহারাও আমার কথা বুঝিতে পারে না। সহায়হীনা, অর্থহীনা, অনাথিনী হইয়া আমি পথে পথে ঘুরিতে লাগিলাম। ভাগ্যক্রমে সে দেশের এক ব্রাহ্মণী আমার প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহার ঘরে স্থান দিলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী গরিব। তাঁহারা যেরূপ শুষ্ক রুটি আহার করিতেন, আমাকেও তাহা খাইতে দিতেন। কয়েক মাস অতি কষ্টে তাঁহাদের ঘরে আমি দিনপাত করিলাম।"

তৃতীয় অধ্যায়

ঝম্‌ঝমির গাছ

সোনা-বৌ বলিতেছেন,—"রাত্রিকাল। এক দিন আমি নিদ্রা যাইতেছি। সহসা আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চক্ষু চাহিয়া আমি দেখিলাম যে, রাজাবাবু, তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছ। তাড়াতাড়ি আমি উঠিয়া বসিলাম। আনন্দের আর সীমা রহিল না। আমি ভাবিলাম যে, তুমি আমার প্রতি ভালবাসা এখনও ভুলিতে পার নাই। আমার ঘোর দুর্গতি দেখিয়া তোমার মনে দয়া হইয়াছে। আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করিয়াছ। অনাথিনী দাসীকে তুমি লইতে আসিয়াছ। পুনরায় আমি তোমার সোনা-বৌ হইব। পুনরায় তুমি আমাকে আদর করিবে। পুনরায় সেই সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে।"

"তোমার পা দুইটি ধরিবার নিমিত্ত দুই হাত বাড়াইয়া, বসিয়া বসিয়াই আমি তোমার দিকে অগ্রসর হইলাম। হায়! ঘোর ঘৃণার চক্ষে আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তুমি সরিয়া দাঁড়াইলে। গলিত পচিত দুর্গন্ধযুক্ত অপবিত্র বস্তুর স্পর্শভয়ে লোকে যেরূপ সত্বর দূরে গমন করে, সেইরূপ তুমি আমার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইলে। হায়, হায়! আমি কি ছিলাম আর কি হইলাম!"

"তুমি বলিলে,—'সোনা-বৌ! বলি দিবার নিমিত্ত তোমরা আমাকে উৎসর্গ করিয়াছিলে। দেবী আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। আমার মৃত্যু হইয়াছে। এখন বাড়ি যাও। তোমাদের সুখের পথ হইতে কণ্টক দূর হইয়াছে। কোথায় আমি সব সোনার ইট লুক্কায়িত রাখিয়াছি, তাহা তুমি অবগত আছ। যাও, সেই ধন গিয়া বাহির কর। কালা-বাবাকেও আমি সেই স্থানে যাইতে অনুরোধ করিয়াছি, সেও সেই বাড়িতে যাইতেছে। তুমিও যাও। সোনার ইট বাহির করিয়া দুইজনে পরম সুখে কালযাপন কর।'

"আমি বলিতে যাইতেছিলাম যে,—রাজাবাবু! আমি আর দেশে যাইব না, আমি আর সে বাড়িতে যাইব না। আমি আর কালা-মুখ

সন্ন্যাসীর মুখ দেখিব না। তোমার সোনার ইটে আমার প্রয়োজন নাই। পৃথিবীর ঐশ্বর্যে আর আমার আবশ্যক নাই। আমি কেবল এই চাই যে, তোমার ঐ পা দু'খানি একবার আমার মাথার উপর রাখিয়া দাও।

কিন্তু মুখ তুলিয়া যেই চাহিলাম, আর দেখিলাম যে, তুমি সে স্থানে নাই। কি জানি কেন, কিন্তু সেই দিন হইতে সকলে বলিতে লাগিল যে, ঐ কাঙ্গালিনী ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। তুমি তাহার পর আমার নিকট সর্বদা আসিতে এবং এই বাড়িতে আসিবার নিমিত্ত সর্বদা আমাকে উত্তেজিত করিতে। আমি তোমাকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু অন্য কেহ তোমাকে দেখিতে পাইত না ;—সেই জন্য কি লোকে আমাকে পাগলিনী বলিত ? আমি তোমার সহিত কথা কহিতাম, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সর্বদা আমি রোদন করিতাম' নিজের দুঃখের কাহিনী স্মরণ করিয়া অস্ফুটস্বরে বিলাপ করিতাম ;—সেই জন্য কি লোকে বলিত যে, ঐ দেখ, পাগলী প্রলাপ বকিতেছে। রুক্ষ্ম কেশ, মলিন বেশ, কাদা ধূলা মাখিয়া থাকিতাম। ব্রাহ্মণী দয়া করিয়া আহার দিলে, সে আহার পড়িয়া থাকিত, সেদিকে ফিরিয়াও চাহিতাম না। রাত্রিতে নিদ্রা যাইতাম না, বসিয়া বসিয়া কেবল কাঁদিতাম,—সেই জন্য কি লোকে বলিত যে, ঐ স্ত্রীলোকটা ক্ষিপ্ত হইয়াছে ?

কোন মুখে এ বাড়িতে আমি আসিব ? যে স্থানে আমি রাজরানী ছিলাম, এ পোড়ামুখ সে স্থানে আমি কি করিয়া দেখাইব ? বাড়ি আসিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু তুমি আমাকে টানিয়া আনিলে। দিন নাই, রাত্তি নাই, সর্বদা তুমি আমার নিকট আসিয়া বলিতে,—'চল, চল, বাড়ি চল। বাড়ি গিয়া সোনার ইট লও।'

ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে এইদিকে আসিতে হইল। কলিকাতা কোন্ দিক্ দিয়া যাইতে হয়,—এই কথা লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া ধীরে ধীরে আমি বঙ্গদেশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কোনদিন আধক্রোশ, কোনদিন একক্রোশ পথ চলিতাম। কখন বা পথ চলিতাম, কখন বা পথ চলিতাম না। পথে ঘাটে গাছতলায় পড়িয়া

থাকিতাম। কুকুরকে যেরূপ লোকে আহারীয় সামগ্রী ফেলিয়া দেয়, সেইভাবেই যদি কেহ আমাকে কিছু খাইতে দিত, তবেই আমি খাইতাম, নতুবা অনাহারে আমি পড়িয়া থাকিতাম। দুর্বলতায় তখন আর পথ চলিতে পারিতাম না। মৃত্যুকামনা করিয়া পথের পার্শ্বে অথবা গাছতলায় পড়িয়া থাকিতাম। মুমূর্ষু অবস্থায় পথে পতিত দেখিয়া কতবার লোকে আমাকে হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিল। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক,—তোমার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে। যে স্থানে পরম সুখ উপভোগ করিয়াছিলাম, যে স্থানে পরে এই মুখ পুড়িয়াছিল, বহুকাল পরে পুনরায় সেইস্থানে আসিয়াছি।"

"এখন রাজাবাবু আমাকে ক্ষমা কর। তুমি দয়াময়। ক্ষমার পাত্রি আমি না হইলেও নিজ গুণে তুমি আমাকে ক্ষমা কর। হায়, রাজাবাবু! তোমার কি মনে পড়ে—একবার আমার জ্বর হইয়াছিল। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দুই হাতে আমার একটি হাত ধরিয়া, আমার মুখের দিকে চাহিয়া দিবারাত্র তুমি আমার পার্শ্বে বসিয়াছিলে? হায়! সে একদিন গিয়াছে, আর আজ একদিন। এ সামান্য জ্বর নয়। ভীষণ দাবানলে আমি দগ্ধ হইতেছি, তথাপি তোমার স্নেহ নাই, তোমার মমতা নাই, তোমার দয়া নাই। কিন্তু তোমার দোষ নাই, রাজাবাবু! কাল-ভুজঙ্গীকে কে দয়া করে? কাল-ভুজঙ্গী অপেক্ষাও আমি অধম। আমি পিশাচী। আর আমার সহ্য হয় না। শরীর দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু একেবারে ভস্মীভূত হয় না কেন? তোমার জন্য যে শূল আমরা প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সেই শূলের সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দিবারাত্রি আমার মনের ভিতর জাগিতেছে। সেইরূপ শত শত উত্তপ্ত রক্তবর্ণের শূল দিয়া কে যেন মুহুর্মুহুঃ আমার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করিতেছে ও হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করিতেছে। নিদ্রা? —কতকাল যে নিদ্রা যাই নাই, তাহা বলিতে পারি না। নিদ্রা কাহাকে বলে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। আর কেন, রাজাবাবু! যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে। এই আমি খাটের উপর শয়ন করিলাম। একবার তোমার পা আমার মাথার উপরে দাও। পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। এখন তোমার পায়ের একটু ধূলা আমার মাথায় পড়িলেই

আমি শান্তিলাভ করি। দাও, একবার তোমার পা অনাথিনী দুঃখিনীর মাথায় তুলিয়া দাও। এই আমি চক্ষু বুজিলাম। একটু পদধূলি দাও, যেন নিদ্রার আবেশে ক্ষণকালের নিমিত্তও এ নিদারুণ যন্ত্রণা বিস্মৃত হই।"

সোনা-বৌ অল্পকালের নিমিত্ত খাটের উপর শয়ন করিয়া চক্ষু বুজিয়া রহিলেন। ব্যস্ত হইয়া পুনরায় উঠিয়া তিনি বলিলেন,—"ভগবান্ আমার পাপ ক্ষমা করিবেন? সোনার ইট বাহির করিয়া দিলে তুমি আমার অপরাধ মার্জনা করিবে? তখন আমি শান্তিলাভ করিব? বেশ, রাজাবাবু! তুমি যাহা আজ্ঞা করিবে আমি তাহাই করিব। তবে ঐ অন্ধকারে গিয়া সোনার ইট বাহির করি!"

মাঝের দ্বারের শৃঙ্খল খুলিয়া সোনা-বৌ চোরাকুঠুরির ভিতর প্রবেশ করিলেন। এই ঘরের বারান্দার দিকের দ্বার তালাবদ্ধ ছিল। মাঝের দ্বারে সুবালা শৃঙ্খল দিয়াছিলেন। বিনয় সেজন্য এঘর হইতে পলায়ন করিতে পারেন নাই। বিনয় ঘরের এক কোণে গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। সেই কোণে তাঁহার সম্মুখে খাঁদা ভূত দাঁড়াইয়া রহিল।

সোনা-বৌ অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে বড়াল-মহাশয়ও সেই ঘরের ভিতর গমন করিলেন। বিজয়বাবু, পিসীমা, সুবালা, বড়াল-গৃহিণী দ্বারের নিকট মাঝের ঘরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই অবসরে বড়ালমহাশয়ের হাত টিপিয়া বিনয় বলিলেন,—"আমি বিনয়। খাঁদা ভূত ও আমি যে এ ঘরে লুক্কায়িত আছি, বিজয়বাবু এখন যেন জানিতে না পারেন। তিনি যদি এ ঘরে এখন আসেন, তাহা হইলে আপনি আড়াল করিয়া দাঁড়াইবেন।"

সোনা-বৌ কিছুক্ষণ ঘরের ছাদের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—"বড় অন্ধকার! ঐ কড়িকাঠের ভিতর সোনার ইট আছে। সেই জন্য দুটি মোটা মোটা কড়ি অকারণ একস্থানে রহিয়াছে। আমি স্ত্রীলোক। উচ্চ কড়িকাঠের নিকট কি করিয়া আমি উঠিব? অন্ধকারে কি করিয়া আমি দেখিব?

বড়ালমহাশয় তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া বারান্দা হইতে একজন

চাকরকে একটা আলো ও একটা বাঁশের ছোট মই বা সিঁড়ি আনিতে বলিলেন।

বিজয়বাবু ভাবিতে লাগিলেন,—"কড়িকাঠ! বেণীবাবু মৃত্যুকালে ঝম্‌ঝমি গাছের কথা বলিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার ঠিক জ্ঞান ছিল না। দ্রব্যের নাম তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এক দ্রব্যের নাম করিতে অন্য দ্রব্যের নাম করিয়াছিলেন। কড়ি নাড়িলে ঝম্‌ঝম করিয়া শব্দ হয়। 'কড়িকাঠ' নাম তিনি মনে করিতে পারেন নাই। সেজন্য বোধ হয় ঝম্‌ঝমির গাছ তিনি বলিয়াছিলেন। তার পর বালিকাদের সম্বন্ধে উপকথা। এক বাঘের একটি কড়িগাছ ছিল, ফলস্বরূপ কড়ি ফলিয়া গাছটি অবনত হইয়াছিল। কয়েকটি বালিকা সেই কড়ি পাড়িতে গিয়াছিল। একটি বালিকা গাছের উপর উঠিয়াছিল। অপর কয়জন তলায় কড়ি কুড়াইতেছিল। এমন সময় বাঘ আলুম্ শব্দে আপনার গাছতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তলায় যে বালিকা-কয়জন ছিল, তাহারা দৌড়িয়া পলায়ন করিল, গাছের উপর যে ছিল, সে পালাইতে পারিল না। গাছে বসিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। একফোঁটা চক্ষুর জল বাঘের গায়ে পড়িল। বাঘ চাটিয়া দেখিল যে, লবণের আস্বাদ!—ইত্যাদি!' ঝম্‌ঝমির গাছ কি, তাহা আমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত, বেণীবাবু এ গল্পের উল্লেখ করিয়াছিলেন। দেখা যাউক, কি হয়!"

চাকর আলো ও ছোট একটি বাঁশের মই দিয়া গেল। বিজয়বাবু আলো লইয়া ও বড়ালমহাশয় মই লইয়া অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

অন্ধকার ঘর অধিক উচ্চ ছিল না। বাঁশের মইও বৃহৎ ছিল না। বড়াল মহাশয়ের হাত হইতে মই লইয়া সোনা-বৌ আপনি কড়িকাঠের গায়ে সন্নিবেশিত করিলেন। খাঁদা ভূত ও বিনয়কে আড়াল করিয়া নিয়ে দাঁড়াইয়া বড়ালমহাশয় মই ধরিয়া রহিলেন। আলো লইয়া বিজয়বাবু তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মই দিয়া সোনা-বৌ কড়িকাঠের নিকট গিয়া উঠিলেন। দুইটি

কড়িকাঠ নিকট-নিকট ছিল। তাহাদের মধ্যে হাত দিয়া সোনা-বৌ একটি কড়িকাঠ হইতে একখণ্ড ক্ষুদ্র তক্তা সরাইয়া ফেলিলেন। কড়িকাঠের গায়ে সামান্য একটি ছিদ্র বাহির হইয়া পড়িল। ছিদ্রের ভিতর হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া সোনা-বৌ কড়িকাঠের ভিতর হইতে সোনার ইট বাহির করিতে লাগিলেন। ঠিক ইট নহে, চতুষ্কোণ দীর্ঘ কাঠের ন্যায়। ইংরাজীতে ইহাকে 'বার্' বলে।

বিজয়বাবু চুপি চুপি বড়ালমহাশয়কে বলিলেন,—"ইহাকেই চক্‌চকে কাপড় কাঁচা সাবান বলে বটে; মনে আছে—বেণীবাবু মৃত্যুকালে আমাকে কি বলিয়াছিলেন?"

বড়ালমহাশয় ঘাড় নাড়িয়া প্রকাশ করিলেন,—"হাঁ, আমার মনে আছে।"

অনেকগুলি সেইরূপ সোনার ইট সোনা-বৌ নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন, তাহার পর কয়েকটা হীরের অঙ্গুরীয় ও খানকয়েক বহুমূল্য প্রস্তরজড়িত অলঙ্কার কাঠের ভিতর হইতে বাহির করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। আর কিছু আছে কি না, তাহা দেখিবার নিমিত্ত এদিক্ ওদিকে হাত দিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই অবসরে বিজয়বাবু পুনরায় বড়ালমহাশয়কে বলিলেন,—"মৃত্যুকালে বেণীবাবু ইহার ছবি আমাকে দিয়াছিলেন। সে ছবি এখনও আমার কাছে আছে। এক্ষণে ইঁহার বয়স হইয়াছে, চুল অনেক পাকিয়া গিয়াছে, বর্ণ মলিন হইয়াছে, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, চর্ম কুঞ্চিত হইয়াছে। আলোতে এই সমুদয় ব্যতিক্রম স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছিল। কিন্তু এখন সামান্য আলোকে ছবির সহিত ইহার মুখের সাদৃশ্য বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে।"

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সেই সঙ্গে খাঁদা ভূতের নাক আপনাকে তিনি দিয়াছিলেন?"

বিজয়বাবু উত্তর করিলেন,—"হাঁ।"

কাঠের ভিতর আর সোনার ইট অথবা অপর কোন দ্রব্য না পাইয়া সোনা-বৌ সেই সিঁড়ির উপর নিস্তব্ধ দাঁড়াইলেন। একটু চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,—"রাজাবাবু! তোমার আজ্ঞা আমি প্রতিপালন

করিলাম। এক্ষণে আমায় শাস্তি প্রদান কর। সে পাপিষ্ঠ নরাধম কালা-বাবা দেখা দিলে, তবে তুমি আমাকে শাস্তি প্রদান করিবে? সে পাপিষ্ঠ কোথায়?”

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—“আপনি এখন মই হইতে নামিয়া আসুন। যাহার নাম করিলেন, সে কোথায়, আমি আপনাকে বলিব।”

সোনা-বৌ কোন উত্তর করিলেন না। উচ্চে কড়িকাঠের নিকট মইয়ের উপর দাঁড়াইয়া তিনি কি ভাবিতে লাগিলেন।

বড়ালমহাশয় বিজয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সে নাক এখন কোথায়?”

বিজয়বাবু উত্তর করিলেন,—“বেণীবাবু মৃত্যুকালে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এই নাক সর্বদা তুমি গলায় পরিয়া থাকিবে। তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। এই দেখুন, সোনার চেনসম্বলিত নাক আমি গলায় পরিয়া আছি।”

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কোন ব্যক্তিকে দিতে না তিনি আদেশ করিয়াছিলেন?”

বিজয়বাবু উত্তর করিলেন,—“হাঁ, যাঁহার ছবি, তাঁহাকে এই নাক দিতে তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন। এখন বুঝিলাম যে, তাঁহার পত্নী এই সোনা-বৌকে তিনি নাক দিতে বলিয়া গিয়াছিলেন।”

উচ্চ মইয়ের উপর দাঁড়াইয়া সোনা-বৌ চিন্তা করিতেছিলেন, এই কথাগুলি বোধ হয় তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিল। সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন,—“তবে কই দাও!”

বিজয়বাবু বলিলেন,—“আপনি নামিয়া আসুন, নামিয়া আসিলে আপনাকে দিব।”

সোনা-বৌ কোন উত্তর করিলেন না। মই হইতে তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন না। সেস্থানে দাঁড়াইয়া নিম্নদিকে হাত বাড়াইয়া তিনি আর একবার বলিলেন,—“দাও।”

বিজয়বাবু আপনার গলদেশ হইতে নাক-সম্বলিত হার খুলিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। সেই মুহূর্তে ভূতের ন্যায় একজন লোক

ঘরের কোণ হইতে হু হু হু হু শব্দ করিতে করিতে বাহির হইল। "আমার নাঁক" এই বলিয়া সে লম্ফ প্রদান করিল ও সোনা-বৌয়ের হাত হইতে চেন-সম্বলিত নাক কাড়িয়া লইল। বাঁশের মই তৎক্ষণাৎ কড়িকাঠের গা হইতে স্খলিত হইয়া নিম্নে পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে সোনা-বৌ ভূতলে পতিত হইলেন।

নাক লইয়া খাঁদা ভূত মাঝের দ্বার দিয়া অপর ঘরে প্রবেশ করিল। দ্বারের নিকট পিসীমা, বড়ালনী ও তাঁহাদের পশ্চাতে সুবালা দাঁড়াইয়া ছিলেন। খাঁদা ভূত তাঁহাদিগকে ঠেলিয়া ফেলিল। তাহার পর সে বারান্দায় বাহির হইল। সে স্থান হইতে তড়্ তড়্ শব্দে পূর্ব দিকের সিঁড়ি দিয়া নীচের তলায় নামিল। যে ঘরে কাঠ থাকে, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, জানালার গরাদ খুলিয়া বাগানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর হু হু শব্দ করিতে করিতে বাগানের ভিতর অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

চতুর্থ অধ্যায়

শিব-মন্দির

বাঁশের মই সহিত সোনা-বৌ মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তিনি উঠিয়া বসিলেন না। তাড়াতাড়ি বড়ালমহাশয় তাঁহাকে তুলিতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন যে, সোনা-বৌ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। বিজয়বাবুও আলো লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন, মাটিতে আলো রাখিয়া তিনি বলিলেন,—"চলুন, ঐ ঘরে লইয়া যাই।"

বিজয়বাবু মাথার দিক ও বড়ালমহাশয় পায়ের দিক ধরিলেন। স্থান সঙ্কীর্ণ। দুই জনের সে মৃতপ্রায় দেহকে বাহিরে লইয়া যাইতে কষ্ট হইতে লাগিল। সেই সময় ঘরের কোণ হইতে আর-একজন লোক বাহির হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করিলেন। তাঁহার মুখের

দিকে দৃষ্টি করিয়া বিজয়বাবু বিস্মিত হইলেন। কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

ধরাধরি করিয়া তাঁহারা সোনা-বৌকে অপর ঘরে লইয়া খাটের উপর শয়ন করাইলেন। তাঁহার দাঁতে দাঁতে লাগিয়াছিল। অনেক কষ্টে তাঁহার দাঁত-কপাটি ভাঙ্গিলেন। তাহার পর তাঁহাকে সচেতন করিবার নিমিত্ত বিধিমতে সকলে চেষ্টা করিলেন। সোনা-বৌয়ের জ্ঞান হইল না। অচেতন হইয়া চক্ষু বুজিয়া তিনি বিছানায় পড়িয়া রহিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ঘড়ঘড় শব্দে নাক দিয়া নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল। সকলে বুঝিলেন, এ পৃথিবীতে এইবার তাঁহার দুঃখের অবসান হইল।

বিজয়বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া বড়ালমহাশয় ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন। দুই ক্রোশ দূরে অন্য গ্রামে ডাক্তার বাস করেন। তাঁহাকে আনিতে বিলম্ব হইবে। সেবা-শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত সুবালা রোগিণীর নিকট গমন করিতেছিলেন। বিজয়বাবু তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"তুমি নয়। তোমার পিসীমা ও বড়ালমহাশয়ের স্ত্রী উহার নিকট বসিয়া থাকুন।"

অন্ধকার ঘর হইতে সোনা-বৌকে বাহির করিবার সময় যিনি সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনি নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বিজয়বাবু তাঁহার প্রতি বার বার দৃষ্টি করিতেছিলেন। কিন্তু এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই। সোনা-বৌয়ের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা সম্বন্ধে যখন সকল বিষয় ঠিক হইল, তখন বিজয়বাবু সহসা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এখানে?"

মস্তক অবনত করিয়া বিনয় চুপ করিয়া রহিলেন। কোন উত্তর করিলেন না।

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি ইহাকে জানেন?"

মস্তক অবনত করিয়াই বিনয় ঈষৎ হাসিলেন। বিজয়বাবু কোন উত্তর করিলেন না। বিনয়ের দিকে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

বড়া লমহাশয় বলিলেন,—"বিনয়বাবুর সহিত সুবালা-দিদির সম্বন্ধ হইয়াছে।"

বিজয়বাবু যার-পর-নাই আশ্চর্যান্বিত হইলেন, আর কোন কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কেবল তিনি বলিলেন,—"কি!"

বড়ালমহাশয় পুনরায় বলিলেন,—"আপনার ভ্রাতৃজায়া ঠাকুরানী এ সম্বন্ধ স্থির করিয়া গিয়াছেন। অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হইবে।"

লজ্জায় কোঁচার কাপড় মুখে দিয়া বিনয় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

সুবালা ঘর হইতে পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, বিজয়বাবু তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। অতি স্নেহের সহিত একহাতে তাঁহার ও অপর হাতে বিনয়ের গলা তিনি জড়াইয়া ধরিলেন। বক্ষঃস্থলের দুইপার্শ্বে দুই জনের মস্তক রাখিয়া ধীরে ধীরে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"এতক্ষণ ধরিয়া কেবল দুঃখের কাহিনী শুনিতেছিলাম। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। ভগবান এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। আমার ব্যথিত হৃদয়ে তিনি অসীম আনন্দ ঢালিয়া দিলেন। মনে আমার বড় সাধ হইয়াছিল যে, তোমাকে মা, আমি পুত্রবধূ করি। পরমেশ্বর আমার সে সাধ পূর্ণ করিলেন। কন্যা বলিয়া, সুবালা, তোমাকে ঘরে লইব, আমার নিজের মা বলিয়া তোমাকে ডাকিব, ইহা অপেক্ষা ভাগ্যের কথা কি আছে! তোমাকে প্রথম দেখিয়াই মা-লক্ষ্মী বলিয়া আমি ডাকিয়াছিলাম। সত্য সত্য তুমি আমার ঘরের মা-লক্ষ্মী হইবে, তাহা ভাবিয়া আমার আনন্দ রাখিতে আর স্থান হয় না। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করি। তিনি আমাকে কৃতার্থ করিলেন।"

আনন্দে বিজয়বাবুর চক্ষুতে জল আসিয়া গেল, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, মুখ হইতে আর বাক্য সরিল না। তিনি চুপ করিলেন।

পিসীমা, বড়ালমহাশয়, বড়াল-গৃহিণী, সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। বিনয়, বিজয়বাবুর পুত্র! —রায়-গৃহিণীর দেবর পুত্র! অভাবনীয় কথা।

একটু স্থির হইয়া বিজয়বাবু পুনরায় বলিলেন,—"তবে তুমিই

যোগেশের কন্যা ? তোমার পিতাকে আমি জানিতাম। কিন্তু তোমার পিতার সহিত আমাদের বড়-বৌয়ের কি সম্পর্ক ?"

সুবালা আস্তে আস্তে উত্তর করিলেন,—"আমার মায়ের মাসী !"

বিজয়বাবু বলিলেন,—"বিধাতার কি ভবিতব্য। আমার গৃহিণী পিত্রালয়ে গিয়া তোমাকে অনেকবার দেখিয়াছিলেন। তিনি তোমাকে মনোনীত করিলেন। তোমার কাকা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্বন্ধ স্থির করিলেন। দুই বৎসর অপেক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার নিকট তিনি প্রার্থনা করিলেন। বিনয় বালক। আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কথাবার্তার সময় তোমার পিতার নাম হইয়াছিল। তোমার পিতাকে আমি জানিতাম। অধিক পরিচয় বা তদন্তের আবশ্যক হইল না। কথাবার্তার সময়, তোমার মায়ের মেসোমহাশয়ের নাম কেহ করে নাই। ইতিপূর্বে তোমার নাম কখন আমি শুনি নাই। তবে কি করিয়া আমি জানিব যে, যোগেশের কন্যাও যে, আর আমার ভ্রাতৃজায়ার প্রতিপালিতা সুবালাও সে !"

একমাত্র বিনয় সে কথা জানিতেন। যে বৎসর তিনি ছবি আঁকিতে আসিয়াছিলেন, সেই বৎসর অবগত হইয়াছিলেন যে, রায়-গৃহিণী তাঁহার জ্যেঠাইমাতা। তাঁহার পিতার প্রতি রায়-গৃহিণীর ঘোরতর বিদ্বেষ দেখিয়া তাঁহার ভয় হইয়াছিল—পাছে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। সেই ভয়ে এ কথা তিনি প্রকাশ করেন নাই। সুবালাকে পর্যন্ত তিনি বলেন নাই।

বিজয়বাবুর কথাবার্তায় পিসীমা ও বড়ালমহাশয় প্রভৃতি সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে, বিজয়বাবু কিরূপ লোক, রায়মহাশয় ও রায়-গৃহিণী তাহা বুঝিতে পারেন নাই। রায়মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত সুবালার বিবাহ হইবে, সেজন্য সকলেই আহ্লাদিত হইলেন।

সোনার ইট ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কুড়াইয়া ফর্দ করিবার নিমিত্ত বড়ালমহাশয় অন্ধকার ঘরে গমন করিলেন। বিজয়বাবু কে,—সকলকে সে পরিচয় দিবার নিমিত্ত পিসীমা তাড়াতাড়ি নীচে যাইলেন। সুবালা

পশ্চিম দিকে আপনার ঘরে পলায়ন করিলেন। বড়াল-গৃহিণী সোনা-বৌয়ের নিকট বসিয়া তাঁহার মাথায় জল দিতে লাগিলেন। বিজয়বাবু বলিলেন,—"বিনয়! তোমার মামার বাড়ি হইতে তুমি যে এখানে আসিয়াছ, তাহা আমি জানিতাম না। চল, বাগানের দিকে যাই। তোমার সহিত আমার কথা আছে।" বাগানের পূর্বপ্রান্তে গিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে পিতাপুত্রে কথাবার্তা হইতে লাগিল।

সোনা-বৌ পুনরায় আসিয়াছেন শুনিয়া গ্রামের দুই চারিজন বয়স্থা স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। বিজয়বাবুর পরিচয় পিসীমা তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। সম্পর্ক অনুসারে তাহারা সুবালার সহিত রহস্য করিতে লাগিল। চাকরানীগণ গা-টেপাটেপি করিতে লাগিল। সুবালার হবু-শাশুড়ীর দাঁত কত বড়, সে সম্বন্ধে পিসীমাও দুই-একটা হাসি তামাসা করিলেন।

সুবালার লজ্জা হইল। হাসি-তামাসা এখন তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি ভাবিলেন যে,—"পৃথিবীতে অনেক লোক বাস করে। তাহাদের জীবনে এরূপ অদ্ভুত ঘটনা ঘটে না। যাহা দেখিলাম ও যাহা শুনিলাম, তাহা যেন ঠিক উপন্যাসের কথা। আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। সন্ধ্যা হইতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে। কোন নিভৃত স্থানে গিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকি।"

একখানি পুস্তক হাতে লইয়া সুবালা বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। বিজয়বাবু ও বিনয় বাগানের পূর্বপ্রান্তে গিয়াছিলেন। সুবালা বাগানের পশ্চিম দিক্ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। বাগানের বাহিরে কতকটা নিম্নভূমি ছিল। বানের সময় ইহা জলমগ্ন হয়। এখন নদীতে অধিক বান ছিল না। নিম্নভূমিতে এখন জল ছিল না। ইহার পর কাঁদাড়। নদীর ভাঙ্গনে খালের ন্যায় যে নালা উৎপন্ন হয়, এ স্থানে তাহাকে কাঁদাড় বলে। নদী শিবমন্দিরের উত্তর দিকে। মন্দিরের পশ্চিমে নদী হইতে এই কাঁদাড় বাহির হইয়া, ইহার দক্ষিণ-পূর্ব দিক্ বেষ্টন করিয়া, পুনরায় নদীতে গিয়া মিলিত হইয়াছে। উত্তরে নদী এবং পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে কাঁদাড়; সুতরাং দেবালয় একটি দ্বীপের

ন্যায় হইয়াছে। পূর্ণ বানের সময় কাঁদাড়ে পাঁচ-ছয় হাত জল হয়, কিন্তু এখন তাহাতে এক হাঁটুর অধিক জল ছিল না। বাগান ও তাহার পর নিম্নভূমি পার হইয়া সুবালা কাঁদাড়ের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাঘা তাঁহার সহিত আসিতেছিল। কাঁদাড়ে জল দেখিয়া বাঘাকে তিনি বাড়ি ফিরাইয়া দিলেন। জল পার হইয়া সুবালা মন্দিরের ভূমিতে গিয়া উঠিলেন। মন্দিরের চারিদিকে একটু বাগানের মত ছিল। তাহাতে আম, বেল অশ্বত্থ, অর্জুন প্রভৃতি গুটিকতক গাছ ছিল। সে সমুদয় পার হইয়া সুবালা মন্দিরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

অনেক কালের প্রাচীন মন্দির। তাহার সম্মুখে একটু রক ছিল। রকের অনেক স্থান ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। সুবালা রকের উপর উঠিলেন। রকের যে অংশ ভগ্ন হয় নাই, সেইরূপ একটি স্থান মনোনীত করিয়া মন্দিরের প্রাচীর ঠেশ দিয়া সুবালা বসিলেন। ভাদ্র মাস; বর্ষার জলে পৃথিবী ধৌত হইয়া গিয়াছিল। গাছ-পালা উজ্জ্বল শ্যামল পত্রে সুশোভিত হইয়াছিল। অপরাহ্নের সূর্যকিরণ দ্রবীভূত স্বর্ণের ন্যায় হইয়া বৃক্ষ-সকলের অগ্রভাগকে সুবর্ণের বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিল। অল্প অল্প বায়ুহিল্লোলে তাহাদের শাখা-প্রশাখা মাঝে মাঝে আলোড়িত হইতেছিল। নিম্নে নবীন দূর্বাদলে ভূমি ঘনভাবে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। নিকটে নদীর জল সন্‌সন্‌ শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল, উপরে নির্মল নীলাকাশে তুলায় ন্যায় দুই-এক খণ্ড শ্বেতবর্ণের মেঘ বায়ুভরে তাড়িত হইয়া নানা আকার ধারণ করিতেছিল। অস্তপ্রায় সূর্যকিরণ তাহার উপর পতিত হইয়া রজতনির্মিত অথবা তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। দূরে গরুর পালের মধ্যে দুই একটি গাভী নবপ্রসূত চঞ্চল বৎসকে নিকটে না দেখিয়া হাম্বারবে তাহাকে আহ্বান করিতেছিল। গাছের উপর নিবিড় পত্রমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া ঘুঘুপক্ষী ঘু ঘু ঘু রবে সঙ্গিনীকে ডাকিতেছিল। সুবালা ভাবলেন,—"হায় রে এরূপ শান্তিময়ী পৃথিবীকে মানুষ কেন অশান্তির আলয় করে!"

মন্দিরের প্রাচীর ঠেশ দিয়া সুবালা উইলের বিষয়, খাঁদা ভূতের

বিষয়, সোনা-বৌয়ের বিষয়,—নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার চক্ষু দুইটি বুজিয়া আসিল। নিদ্রার আবেশ দূর করিতে প্রথম তিনি চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল। মন্দিরের প্রাচীর ঠেশ দিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় গভীর নিদ্রায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

উপর-পাহাড়ে অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকিবে। সহসা নদীতে বান আসিয়া পড়িল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে নদীর গর্ভ জলে পূর্ণ হইল। প্রবল বেগে নদীর জল প্রবাহিত হইতে লাগিল। যে স্থানে এতক্ষণ ঈষৎ কুলকুল শব্দ হইতেছিল, এখন সেই স্থান ঘূর্ণিত জলকল্লোলে পূর্ণ হইল। সুবালা নিদ্রিতা, সুবালা তাহার কিছুই জানেন না।

নদীর এ কুল হইতে অপর কুল পর্যন্ত জলে পূর্ণ হইল। কাঁদাড়ে গভীর জল হইল। মন্দিরের পশ্চিমে কাঁদাড়ের উৎপত্তি। প্রবল স্রোত এই স্থানে আরম্ভ হইয়া, মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া, পূর্বদিকে পুনরায় গিয়া নদীতে মিলিত হইল। কাঁদাড় হইতে রায়মহাশয়ের বাগান পর্যন্ত যে নিম্নভূমি আছে, তাহাও এখন জলে পূর্ণ হইল। সুবালা নিদ্রিতা, সুবালা তাহার কিছুই জানেন না।

উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ আপন আপন মস্তক হইতে সুবর্ণ-বর্ণ ঝাড়িয়া ফেলিল। পশ্চিমে রক্তবর্ণের মেঘরাশি এখন সিন্দূরবর্ণ ধারণ করিল। তাহার ভিতর লুক্কায়িত থাকিয়া সূর্যদেব আকাশের নিম্নদেশে গমন করিলেন। তথাপি সুবালার নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

সন্ধ্যা হইল। দলে দলে কাক, বক প্রভৃতি পক্ষিগণ কেহ বা নিঃশব্দে, কেহ বা শব্দসহকারে আপন আপন বাসস্থানে গমন করিতে লাগিল। তথাপি সুবালার নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

অল্প অল্প অন্ধকার হইল। আকাশে দুই একটি নক্ষত্র দেখা দিল। তাহাদের প্রতিবিম্ব বায়ুভরে আলোড়িত নদীজলের ভিতর চিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। গাছের শাখা-প্রশাখার অভ্যন্তর নিবিড় হইতে নিবিড়তর দেখাইতে লাগিল। তথাপি সুবালার নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

যে স্থানে সুবালা নিদ্রা যাইতেছিলেন, এই সময় সে স্থানে কে একজন আসিয়া রকের নিম্নে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিতে লাগিল। তাহার দুই হাতে দুইটি বোতল ছিল। সুবালাকে মন্দিরে একাকিনী দেখিয়া সে বিস্ময়াপন্ন হইল। সেই নির্জন স্থানে সুবালাকে নিদ্রিতা দেখিয়া সে আরও বিস্মিত হইল। বোতল হাতে করিয়া রকের উপর মাথা বাড়াইয়া বারবার সে উঁকি মারিতে লাগিল। তাহার পর সেস্থান হইতে সে প্রস্থান করিল। অল্পক্ষণ পরে খালি হাতে সে প্রত্যাগমন করিল। মন্দিরের সম্মুখে একটি আম গাছ ছিল। তাহার উপর উঠিয়া শাখাপল্লবের ভিতর লুক্কায়িত থাকিয়া একদৃষ্টিতে সে সুবালাকে দেখিতে লাগিল। তখনও সুবালার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। যে উঁকি মারিল, সে লোকটি কে?

পঞ্চম অধ্যায়

গুরুঠাকুরের বীরত্ব

এখানে রায়মহাশয়ের বাটীতে সোনা-বৌ মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছেন। পিসিমা ও বড়াল-গৃহিণী তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন। তাঁহার নাসিকাপথে ঘড়ঘড় শব্দে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। মাঝে মাঝে তাঁহার সর্বশরীর কম্পিত হইতেছে। মাঝে মাঝে তাঁহার দাঁতকপাটি লাগিতেছে। বিজয়বাবু, বড়ালমহাশয় ও অন্যান্য লোক তাঁহাকে সচেতন করিবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। কিছুতেই তাঁহার জ্ঞান হইতেছে না। চক্ষু বুজিয়া তিনি পড়িয়া আছেন।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার আসিলেন। রোগিণীকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন যে, তাঁহার জীবনের কিছুমাত্র আশা নাই। শীঘ্রই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। তথাপি তিনি ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন। তিনি যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন, সকলে সেইরূপ কাজ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাত্রি হইল। রোগিণীর জ্ঞান হইল না, একবারও তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন না। মাঝে মাঝে কেবল দুই-একটি কথা বিড়বিড় করিয়া তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল। সেকথা কি, ভালরূপ কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। কেবল "রাজাবাবু" এই কথাটি সকলে বুঝিতে পারিল।

রাত্রি প্রায় দুই ঘণ্টা হইল। সোনা-বৌয়ের আর একবার দাঁতকপাটি লাগিল। সে দাঁতকপাটি আর কেহ ভাঙ্গিতে পারিল না। ঘন ঘন শরীর কম্পিত হইতেছিল। সে কম্পন ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার শরীর স্থির হইল। ঘড়ঘড় শব্দে সবলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতেছিল। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ক্রমে কমিয়া আসিল, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমে উপরে উঠিতে লাগিল। নাভি, বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠ সঞ্চালিত হইতেছিল। ক্রমে সব নীরব ও স্থির হইল। সোনা-বৌয়ের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

আজ সোনা-বৌ শান্তি পাইলেন। তাঁহার তাপিত হৃদয় আজ শীতল হইল। যাঁহার সুখ ঐশ্বর্য দেখিয়া লোকে হিংসা করিত, যিনি এই গ্রামের রাজরাজেশ্বরী ছিলেন, হায়! আজ অনাথিনী পাগলিনী হইয়া তিনি এই বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মর্মভেদিনী খেদোক্তি শুনিয়া আজ সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। পাপের পরিণাম এইরূপ হয়। মনে যাহা চিন্তা করি, মুখে যাহা প্রকাশ করি, হাতে যে কাজ করি—'মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্‌ভ্যামুদরেণ'—সে সমুদয় ব্যোমে অঙ্কিত হইয়া থাকে। কিছুই বৃথা হয় না। যথাকালে সেই সমুদয় কর্ম, সুখ ও দুঃখ উৎপাদন করে। যেমন এক-একটি মানুষের, সেইরূপ এক-একটি সম্প্রদায়ের, এক-একটি জাতির উন্নতি ও অবনতির কারণ তাহারা হয়। হে বাঙ্গালী! একবার তোমার দুর্দশার কারণ ভাবিয়া দেখ। তোমার দুর্গতির জন্য অন্যের প্রতি দোষারোপ করিও না। একবার নিজের প্রতি চাহিয়া দেখ। মনে করিও না যে, আধুনিক কর্মদোষে তোমাদের এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। শত শত বৎসরের সঞ্চিত পাপে আর্যসমাজ গলিত পচিত হইয়াছিল; তবে তো জনকয়েক

বিদেশী আসিয়া তোমাদের দেবমন্দির সকল চূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তোমাদের শিলাময়ী দেবপ্রতিমাসকলকে ভাঙ্গিয়া আরোহণের সোপানে পরিণত করিয়াছিল। আজ নূতন নহে, নয় শত বৎসর পূর্বে ভারতের গৌরব-রবি অস্তাচলের তিমিরে ডুবিয়া গিয়াছে। হায় হায়! সেই অন্ধকারে এখনও ডুবিয়া আছে, আর উদয় হয় নাই। তাই হে বাঙ্গালী! তোমাকে মিনতি করিয়া বলি,—কখনও সত্যপথ হইতে বিচলিত হইও না। কর্তব্যসাধনে কখনও অবহেলা করিও না। বালক-বালিকাগণ! তোমরা যখন বড় হইবে, তখন জগতে যেন এই যশ ঘোষিত হয় যে—বাঙ্গালী মিথ্যা কথা বলিতে জানে না।

সোনা-বৌকে লইয়া সকলে এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন। অন্যদিকে এতক্ষণ কাহারও মন ছিল না। সোনা-বৌ যখন ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে যখন সকল গোল মিটিয়া গেল, তখন পিসীমা এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘ সুবালাকে অনেকক্ষণ দেখি নাই। সুবালা কোথায়?”

সকলে তখন বলিল,—“তাই তো! সুবালা দিদিকে আমরা অনেকক্ষণ দেখি নাই!”

বারান্দায় দাঁড়াইয়া পিসীমা দেখিলেন যে, সুবালার ঘরে আলো নাই। সেই স্থানে গিয়া দেখিলেন যে, সুবালা সেই স্থানে নাই। দোতালার যতগুলি ঘর ছিল, তাহার কোন স্থানে সুবালা নাই। ছাদে নাই, নীচের কোন ঘরে নাই, সদর-বাটীতে নাই। তন্নতন্ন করিয়া সমস্ত বাটীতে সকলে অন্বেষণ করিল। বাটীতে সুবালা নাই।

পিসীমা কাঁদিতে বসিলেন। বড়ালনী কাঁদিতে লাগিলেন। দাসীগণ কাঁদিতে লাগিল।

আলো জ্বালিয়া সমস্ত বাগান সকলে অন্বেষণ করিল। তাহার পর সমস্ত গ্রামের বাড়ি বাড়ি লোকে খুঁজিয়া দেখিল। সুবালার কোন সন্ধান হইল না। একজন স্ত্রীলোক বলিল যে, সন্ধ্যার পূর্বে সুবালাকে সে শিবমন্দিরের দিকে যাইতে দেখিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ কয়েকজন লোক নৌকা ও ডোঙ্গা করিয়া সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। শিবমন্দির

ও চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি তাহারা তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল। সুবালার চিহ্নমাত্র তাহারা সে স্থানে দেখিতে পাইল না।

গ্রামে হাহাকার পড়িয়া গেল। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলে সুবালার অন্বেষণে বাহির হইল। সন্ধ্যার পূর্বে নদীতে সহসা প্রবল বান আসিয়াছিল। গ্রামের ভিতর সমুদয় নিম্নভূমি জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অনেক লোকের বাড়ি যেন এক-একটি দ্বীপের ন্যায় হইয়াছিল। গ্রামের চতুর্দিকের মাঠ বন্যার জলে প্লাবিত হইয়াছিল। কোন স্থানে গভীর জল হইয়াছিল, কোন কোন স্থান দিয়া প্রবলবেগে স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল।

যখন সমস্ত বাটী, বাগান ও সমস্ত গ্রাম অনুসন্ধান করিয়া সুবালার কোন সন্ধান হইল না, তখন বিজয়বাবু, বড়াল মহাশয় ও বিনয়ের ঘোরতর দুর্ভাবনা হইল। তাঁহারা ভাবিলেন যে, চপলার ন্যায় সুবালার কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। নদীতে সহসা বন্যা আসিয়াছে, কোন গভীর স্থানে পড়িয়া সুবালা জলমগ্ন হইয়াছে।

হু হু শব্দ করিতে করিতে খাঁদা ভূত যখন রায়মহাশয়ের বাটী হইতে বাহির হয় এবং বাগানের উপর দিয়া দ্রুতবেগে মাঠের দিকে যখন সে চলিয়া যায়, তখন গ্রামের কয়েকজন লোক তাহাকে দেখিয়াছিল। রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া গ্রামে গিয়া তাহারা সংবাদ দিল। গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল যে—খাঁদাভূত পুনরায় আসিয়াছে!

তাহার পর যখন সুবালাকে কেহ খুঁজিয়া পাইল না, তখন গ্রামের লোকের বুঝিতে আর বাকী রহিল না। সকলেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল যে, "খাঁদা ভূত যেরূপ চপলাকে খাইয়াছিল, সুবালা-দিদিকেও সেইরূপ খাইয়াছে।" কিন্তু এবার সকলের ঘোরতর রাগ হইল। সকলে বলিল,—"আর আমাদের নিস্তার নাই। আজ খাঁদা ভূত সুবালা দিদিকে খাইল, কাল আমাদের বালক-বালিকাদিগকে খাইবে। সুবালা দিদি আমাদের লক্ষ্মী। তাঁহার জন্য আমরা প্রাণ বিসর্জন করিব। যখন সুবালাদিদিকে সে খাইল, তখন আমাদিগকেও সে ভক্ষণ করুক্। খাঁদা ভূতের

অনুসন্ধানে আমরা বাহির হইব। যদি তাহাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে দেখিব সে কেমন ভূত!”

বিজয়বাবু, বড়ালমহাশয় ও বিনয় পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, সমুদয় গ্রাম ও গ্রামের চারিদিকে নদী, নালা, মাঠ জলা—সকল স্থান তন্নতন্ন করিয়া সেই রাত্রিতে অনুসন্ধান করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ শতশত মশাল প্রস্তুত হইতে লাগিল: পুরাতন কাপড়, নূতন কাপড় যাহা সম্মুখে পাইলেন, পিসীমা তাহা বাহির করিয়া দিলেন। সেই সমুদয় কাপড় ছিঁড়িয়া মশাল প্রস্তুত হইল। বাড়িতে যত তৈল ছিল, পিসীমা তাহা বাহির করিয়া দিলেন। তাহার পর গ্রামে যাহার বাড়িতে যতটুকু তৈল ছিল, আপন আপন ঘর হইতে লোকে তাহা বাহির করিয়া দিল। সে রাত্রিতে গ্রামে আর একফোঁটা তৈল রহিল না। গ্রামে যতগুলি নৌকা ও ডোঙা ছিল, তাহাতে বসিয়া চারিদিকে লোক ধাবিত হইল। অবশেষে গ্রামে যত কলাগাছ ছিল, সে সমুদয় কাটিয়া লোকে ভেলা প্রস্তুত করিল। যাহাদের কদলীবৃক্ষ, তাহারা অণুমাত্র আপত্তি করিল না, বরং আহ্লাদসহকারে আপন আপন কলা-গাছ সকলে দেখাইয়া দিতে লাগিল। নৌকায়, ডোঙায় ও কলার ভেলায় বসিয়া জলপথে লোক চারিদিকে সুবালার অন্বেষণে দৌড়িল। কে কোন দিকে যাইবে বড়ালমহাশয় তাহা স্থির করিয়া দিলেন। নৌকা, ডোঙা অথবা ভেলায় যাহাদের স্থান হইল না, তাহারা পদব্রজে উচ্চ ভূমিসমূহে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সকল দিকে শত শত লোক প্রেরিত হইল। চার-পাঁচ জন লোকের সহিত বিনয় একখানি নৌকাতে করিয়া শিবমন্দিরের দিকে গমন করিলেন। আর একখানি নৌকাতে কতকগুলি লোকের সহিত বড়ালমহাশয় গ্রামের দক্ষিণ দিকের মাঠে গমন করিলেন। বিজয়বাবু বিদেশী লোক। তিনি পথ-ঘাট জানেন না। স্ত্রীলোকদিগের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত বড়ালমহাশয় তাঁহাকে বাটীতে রাখিয়া গেলেন।

গ্রামে একজন গুরুঠাকুর আসিয়াছিলেন। খাঁদা ভূতের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া ক্রোধানলে তাঁহার সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিত

হইলে কি হয়, তিনি একালের গুরুঠাকুর।—সভ্যভব্য নব্য বীরপুরুষ। সেকালের শাস্ত্রে নূতন বিজ্ঞানশাস্ত্র জোড়া দিয়া তিনি গুরুগিরি করেন। টিকিশূন্য মস্তক হইতে কিরূপে তড়িৎ-শক্তি বাহির হইয়া যায়, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। গ্রামের লোককে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কুপো আছে?"

সকলে জিজ্ঞাসা করিল,—"কুপো কেন?"

আরক্তনয়নে নব্য গুরুঠাকুর উত্তর করিলেন,—"কুপো কেন? আমি নৃসিংহমন্ত্র জানি। নৃসিংহ কে তা জান?

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ॥

নৃসিংহমন্ত্রবলে খাঁদা ভূতকে ধরিয়া কুপোতে বন্ধ করিয়া আনিব। তখন তোমরা আমার বিক্রম দেখিবে—আমি সাক্ষাৎ জাগ্রত গুরু। গুরুকে মানুষ জ্ঞান করিতে নাই কেন, তখন তোমরা বুঝিবে।"

গ্রামে কুপো ছিল না। কাজেই একটি বোতল লইতে হইল। খাঁদা ভূতকে ধরিয়া সেই বোতলে বন্ধ করিয়া তিনি আনিবেন। গুরুঠাকুর বলিলেন,—

"নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারিব জল ঝাঁটি।
হুহুঙ্কার শব্দে মোর ব্রহ্মাণ্ড যাবে ফাটি॥"

খাঁদা ভূতের উপর তর্জন-গর্জন করিতে করিতে গুরুঠাকুর বড়ালমহাশয়ের নৌকায় গিয়া উঠিলেন।

বিনয় ও তাঁহার সঙ্গিগণ প্রথম শিবমন্দিরের দিকে গমন করিলেন। নৌকা হইতে নামিয়া তাঁহারা শিবমন্দির ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি পুনরায় অতি সাবধানে অনুসন্ধান করিলেন। সুবালাকে তাঁহারা সেস্থানে দেখিতে পাইলেন না।

পুনরায় নৌকাতে উঠিয়া মন্দিরের পূর্বদিকের নালা দিয়া তাঁহারা নদীতে গিয়া পড়িলেন। প্রবল স্রোতে নৌকা অনেক দূরে ভাসিয়া গেল। তাহার দক্ষিণ দিকে আর একটি কাঁদার বা নালা দেখিতে পাইলেন। ইহাতেও এক্ষণে প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল।

নদী পরিত্যাগ করিয়া বিনয়ের নৌকা এই নালার ভিতর প্রবেশ করিল। রায়মহাশয়ের গ্রামের পূর্বদিকে নিম্নভূমির এক বিস্তৃত মাঠ আছে। নালা দিয়া বিনয়ের নৌকা এই মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাঠ এক্ষণে গভীর জলে প্লাবিত হইয়াছে। নদী হইতে স্রোত বাহির হইয়া ইহার ভিতর দিয়া প্রবল বেগে চলিতেছে। সমুদয় মাঠ এক্ষণে বৃহৎ একটা বিল বা জলার ন্যায় হইয়াছে। জলপ্লাবিত প্রান্তর বেষ্টন করিয়া সুবালার অণ্বেষণ করিতে করিতে, গ্রামের দক্ষিণ দিকে নৌকা লইয়া যাইবেন, বিনয় এইরূপ মানস করিলেন। জলার ভিতর কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় বামদিকে, অনেকটা দূরে সহসা অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সেই আগুনের আলোকে অনেকদূর পর্যন্ত আলোকিত হইল। সেই সঙ্গে খাঁদা ভূতের ভয়াবহ হুহুঙ্কার শব্দ সকলের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। যে স্থানে সহসা অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, সেই স্থান হইতে ভূতের হুহুঙ্কার শব্দ উত্থিত হইল।

এদিকে বড়ালমহাশয়ের নৌকা প্রথম গ্রামের দক্ষিণ দিকে গমন করিল। সে মাঠও এক্ষণে জলপ্লাবিত হইয়াছিল। গ্রামের দক্ষিণ দিক্ ঘুরিয়া ক্রমে তাঁহার নৌকা পূর্বদিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। জলমগ্ন প্রান্তরের উত্তর সীমায় বিনয়ের নৌকা ও দক্ষিণ সীমায় বড়ালমহাশয়ের নৌকা প্রায় এককালে আসিয়া উপস্থিত হইল। বড়ালমহাশয়ের নৌকা উত্তরদিগভিমুখে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় সেই অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। অল্পক্ষণ পরেই খাঁদা ভূতের ভয়ানক হুহুঙ্কার শব্দ জলপ্লাবিত প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হইল।

হু হু, হু হু, হু হু হু।

দূরে চারিদিকে উচ্চভূমিসমূহে শৃগালগণ ডাকিয়া উঠিল—হ্যাঁকা হুয়া, হ্যাঁকা হুয়া, হ্যাঁকা হুয়া হু। বৃক্ষসকল হইতে পক্ষিগণ উড়িয়া কলরব করিতে লাগিল। দূরে গ্রামের কুক্কুরগণ উর্ধ্বমুখ হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। রাত্রিকালে চারিদিকে ভয়ানক কোলাহল পড়িয়া গেল।

জনশূন্য জলমগ্ন প্রান্তর-মাঝে সহসা দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া

উঠিল, তাহার পরক্ষণেই খাঁদা ভূতের হুহুঙ্কার রবে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইল। এরূপ অবস্থায় কাহার হৃদয় না আতঙ্কে কম্পিত হয়? জলার একপ্রান্তে বিনয়ের নৌকা ও অপর প্রান্তে বড়ালমহাশয়ের নৌকায় যে সমুদয় গ্রামবাসী ছিল, তাহারা ঘোর ভয়ে ভীত হইল ও নৌকা ফিরাইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল। একদিকে বিনয় ও অপর দিকে বড়ালমহাশয় তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল যে, খাঁদা ভূত প্রকৃত ভূত নহে, সে জীবিত মানুষ। পূর্বে গ্রামে যে কালা বাবা ছিল, এই সেই লোক। বিনয়ের প্রবোধবাক্যে সে নৌকার লোকেরা কথঞ্চিৎ সুস্থির হইল। বড়ালমহাশয়ের সঙ্গিগণও সুস্থির হইত কিন্তু এই সময় গুরুঠাকুরের ভয় দেখিয়া তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

গুরুঠাকুরের সর্বশরীর থর থর কাঁপিতে লাগিল। ভয়ে দাঁতে দাঁতে ঘর্ষিত হইয়া কিড়মিড় শব্দ হইতে লাগিল। জ্ঞানহীন বাতুলের ন্যায় তিনি নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন ও নৌকা ফিরাইবার জন্য সকলের হাতে-পায়ে পড়িতে লাগিলেন।

গুরুঠাকুর বলিলেন,—"নৌকা ফিরাও! নৌকা ফিরাও! সর্বনাশ হইল। কেন মরিতে আস্ফালন করিয়াছিলাম? ভূতে সব জানিতে পারে। আমি তাহাকে ধরিব বলিয়াছিলাম। আমার উপর তাহার আড়ি হইয়াছে। আমাকে সে এখনি খাইয়া ফেলিবে। হায় হায় দু পয়সা পাইব বলিয়া এ গ্রামে আসিয়াছিলাম। তাহা না হইয়া প্রাণটি হারাইলাম। নৌকা ফিরাও! নৌকা ফিরাও! ক চ ট ত প। জ ড় দ গ ব। হ ব ঠ।"

বড়ালমহাশয় তাঁহাকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বাতুলের ন্যায় হইয়াছিলেন। সেই সমুদয় প্রবোধবাক্য তিনি শ্রবণ করিলেন না। আপনার মনে চীৎকার করিয়া তিনি নানারূপ খেদ করিতে লাগিলেন।

গুরুঠাকুর বলিলেন,—"ওগো তোমরা ওদিকে আর যাইও না। ওদিকে আর যাইও না। ভোমর! ভোমর! তোমার কপালে কি এই ছিল? ভোমর!—ওগো ভোমর আমার ব্রাহ্মণীর নাম—তোমাকে

নীলাম্বরী শাড়ি দিব বলিয়াছিলাম। আমি ভূতের পেটে যাইলাম, কে তোমাকে আর নীলাম্বরী শাড়ি দিবে? নিতু! নিতু!—ওগো নিতু আমার ছেলের নাম—কে তোমাকে এখন বিলাতী বিস্কুট কিনিয়া দিবে? মুড়ি তোমার মুখে ভালো লাগে না। সকাল বেলা এখন কি খাইবে? ফুলদার বিলাতী বিস্কুট না হইলে তোমার চলে না, আমি নিজে এখন ভূতের বিলাতী বিস্কুট হইলাম। প্রথম সে আমার ঘাড়ের রক্ত চুষিয়া খাইবে। তাহার পর আমাকে সে পাতকোর ভিতর লইয়া যাইবে। সেই স্থানে বসিয়া প্রথম আমার মাংস খাইবে। তাহার পর বিলাতী বিস্কুটের মত কুড়কুড় করিয়া আমার হাড়গুলি খাইবে। নৌকা ফিরাও! নৌকা ফিরাও! ক চ ট ত প। জ ড় দ গ ব। হ ব ঠ।"

বড়ালমহাশয় কিছু রাগিয়া বলিলেন,—"আমি বার বার আপনাকে বলিতেছি যে, ঐ হুহুঙ্কার শব্দ ভূতের নহে। এক জন জীবিত ক্ষিপ্ত সন্ন্যাসী ঐরূপ শব্দ করিতেছে। আর যদি ভূতও হয়, তাহা হইলেই বা আপনার ভয় কি? আপনি নৃসিংহমন্ত্র জানেন। ভূতকে ধরিয়া বন্ধ করিবেন বলিয়া সঙ্গে বোতল আনিয়াছেন।"

গুরুঠাকুর উত্তর করিলেন,—"ও গো না! ও সামান্য ভূত নয়। ও ব্রহ্ম-রাক্ষস। প্রবিলতীক্ষ্ণদন্তপঙক্তিরুন্নতনাসাবংশঃ প্রকটরক্তাক্তনয়ন উপচিতস্নায়ুসন্ততির্ণতগাত্রঃ শুষ্ককপোলঃ সুহুতহুতবহপিঙ্গলশ্মশ্রুকেশঃ—এই সমুদয় ব্রহ্ম রাক্ষসের লক্ষণ শাস্ত্রে আমি পড়িয়াছি। নৌকা ফিরাও! নৌকা ফিরাও! ক চ ট ত প। জ ড় দ গ ব। হ ব ঠ।"

শেষের কথাগুলি গুরুঠাকুর বিড়বিড় করিয়া উচ্চারণ করিলেন। তাঁহাকে সাহস দিবার জন্য বড়ালমহাশয় পুনরায় বলিলেন,—"এই আমি নৌকার অগ্রভাগে গিয়া দাঁড়াইলাম। ভূত প্রথমে আমাকে খাইবে, আপনাকে খাইবে না।"

এমন সময় খাঁদা ভূতের হুহুঙ্কারে পুনরায় সেই প্রান্তর কম্পিত হইল। হুহু, হুহু, হুহুহু। উক্ত ভূমিসমূহে পুনরায় শৃগালগণ ডাকিয়া উঠিল—হ্যাঁকা হুয়া, হ্যাঁকা হুয়া, হ্যাঁকা হুয়া হু।

পক্ষিগণ কলরব করিল। কুকুরগণ উর্দ্ধমুখে কাঁদিতে লাগিল।

গুরুঠাকুর বলিলেন,—"ঐ শুন গো, ঐ শুন! ও সামান্য ভূতের ডাক নয়, ও ব্রহ্ম-রাক্ষসের ডাক। ব্রহ্ম-রাক্ষস তোমার শুষ্ক দড়ি-দড়ি মাংস ভক্ষণ করিবে না। ছিবড়ে হইবে গো, ছিবড়ে হইবে। বড়ালমহাশয়! তুমি তোমার নিজের শরীর-পানে চাহিয়া দেখ। তোমার ও শুঁটকো শরীরের চিমড়ে মাংস খাইবে না। আমি শিষ্যবাড়ি গিয়া দুধ-ঘি খাই। আমার নধর শরীরের নরম মাংস ফেলিয়া তোমার ও শুঁটকো মাংস সে খাইবে না। ও গো! ব্রহ্ম-রাক্ষস অতি ভয়ানক বস্তু। ছোট হরিদাস ব্রহ্ম-রাক্ষস হইয়াছে—এইরূপ মনে করিয়া জগন্নাথে থাকিতে মহাপ্রভুর সঙ্গিগণও ভয়ে জড়সড় হইয়াছিল।

এক দিন জগদানন্দ স্বরূপ গোবিন্দ।
কাশীশ্বর শঙ্কর দামোদর মুকুন্দ॥
সমুদ্র স্নানে গেলা সবে তবে কথোদূরে।
হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে॥
মনুষ্য না দেখি মধুর গীত মাত্র শুনে।
গোবিন্দাদি মিলি সবে কৈল অনুমানে॥
বিষ খাঞা হরিদাস আত্মহতি কৈল।
সেই পাপে জানি ব্রহ্ম-রাক্ষস হইল॥"

উচ্চৈঃস্বরে গুরুঠাকুর এই কথা বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

জনশূন্য গভীর জলে নিমগ্ন প্রান্তর মাঝে খাঁদা ভূত কোথা হইতে আসিল?

সুবালা শিব-মন্দিরে নাই। সুবালা তবে কোথায়? সন্ধ্যার সময় শিব-মন্দিরে কে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়াছিল? আমগাছে উঠিয়া শাখাপল্লবের ভিতর লুক্কায়িত থাকিয়া একদৃষ্টিতে নিদ্রিতা সুবালার দিকে কে চাহিয়াছিল?

সে এখন কোথায়? সুবালা এখন কোথায়?

ষষ্ঠ অধ্যায়

জলমগ্ন প্রান্তর

সন্ধ্যার সময় যে উঁকিঝুঁকি মারিয়াছিল, তাহার পর আমগাছে উঠিয়া যে সুবালাকে দেখিতেছিল, সে ধনুকধারী; অন্য কেহ নহে। সুবালার ইচ্ছায় বড়ালমহাশয় ধনুকধারীকে কার্যোপলক্ষে অন্য গ্রামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আজ সে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছিল। বর্ষাকালে বন্যা আসিলে, এ অঞ্চলের লোক এ গ্রাম হইতে সে গ্রাম, অনেক স্থানে এমন কি, এ বাড়ি হইতে সে বাড়ি, নৌকার সহায়তা ভিন্ন গমনাগমন করিতে পারেনা। সেজন্য অনেকের বাড়িতে নৌকা অথবা তালগাছের ডোঙা থাকে এবং সকলেই প্রায় নৌকা পরিচালিত করিতে পারে। সন্ধ্যার পূর্বে বান আসিল। কোন লোকের নিকট হইতে ধনুকধারী একখানি নৌকা চাহিয়া লইল। যে গ্রামে সে গিয়াছিল, তাহা নদীর উত্তরদিকে ছিল। ধনুকধারী নিজেই নৌকা পরিচালিত করিয়া স্বগ্রাম অভিমুখে আসিতে লাগিল। স্রোতের প্রবলবেগে ভাসিয়া শীঘ্রই সে শিবমন্দিরের নিকট উপস্থিত হইল।

দুই বোতল মদ ধনুকধারী সঙ্গে আনিয়াছিল। মদের বোতল সে বাড়ি লইয়া যাইত না। শিব-মন্দিরের ভিতর প্রাচীর-গাত্রে একটি গর্ত ছিল। প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরে গহ্বর আপনি হইয়া থাকুক, অথবা ইঁদুর করিয়া থাকুক, অথবা খাঁদা ভূত করিয়া থাকুক, ধনুকধারী সেই গর্তের সন্ধান পাইয়া তাহার ভিতর মদের বোতল লুক্কায়িত রাখিত। আবশ্যক হইলে বাহির করিয়া সে সুরাপান করিত।

নৌকা লইয়া ধনুকধারী শিবমন্দিরের পশ্চিমে কাঁদাড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া কাঁদাড়ের কিনারায় নৌকা রাখিয়া, মদ দুই বোতল হাতে লইয়া, যথারীতি মন্দিরের ভিতর লুকাইয়া রাখিবার নিমিত্ত সে ভূমির উপর উঠিল। বকের নিম্নে আসিয়া,—আশ্চর্য! সে দেখিল, সুবালা অঘোর নিদ্রা যাইতেছেন। দুই-চারি বার উঁকিঝুঁকি মারিয়া নৌকার

নিকট সে ফিরিয়া গেল। মদ দুই বোতল নৌকার ভিতর রাখিয়া, মন্দিরের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সে আমগাছের উপর উঠিল। গাছে বসিয়া সে সুবালাকে দেখিতে লাগিল।

রাত্রি হইল। চারিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। চমকিত হইয়া সুবালার নিদ্রাভঙ্গ হইল। "আমি কোথায়?"—প্রথম সেই চিন্তা সুবালার মনে উদয় হইল। নানা বৃক্ষে পরিবেষ্টিত ভগ্নমন্দির দেখিয়া সুবালার স্মরণ হইল। একাকিনী সেই নির্জন স্থানে,—সুবালার বড় ভয় হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গৃহাভিমুখে তিনি গমন করিতে লাগিলেন। "রাত্রি হইয়া গিয়াছে, তথাপি আমাকে কেহ খুঁজিতে আসে নাই কেন!"—তাহা ভাবিয়া সুবালা আশ্চর্যান্বিতা হইলেন।

কাঁদাড়ের ধারে গিয়া তিনি পৌঁছিলেন। সর্বনাশ! বান আসিয়াছে। কাঁদাড়ে গভীর জল হইয়াছে। তাহার ওদিকে বাগান পর্যন্ত নিম্নভূমি জলে পূর্ণ হইয়াছে। তিনি যেদিকে চাহিলেন, সেই দিকেই দেখিলেন,—জল, জল, দূর পর্যন্ত ধূ ধূ করিতেছে। নিকটে কোন লোকের বাড়ি ছিল না। দূরে বাগানের এই প্রান্তে ত্রিলোচন ও শঙ্করা মালীর ঘর ছিল। যথাসাধ্য উচ্চৈঃস্বরে সুবালা ডাকিলেন,—"ত্রিলোচন! ত্রিলোচন! ত্রিলোচন! শঙ্করা—শঙ্করা!"

সুবালার উচ্চৈঃস্বরে—কেবল নামে উচ্চ, কাজে অতি মৃদু শব্দ। সে শব্দ অধিক দূর গেল না। কোন উত্তর তিনি পাইলেন না। হতাশ হইয়া সেই স্থানে তিনি বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর ভাবিলেন,—"শীঘ্রই আমার অন্বেষণে লোক বাহির হইবে। আর অধিকক্ষণ এ স্থানে আমাকে বসিয়া থাকিতে হইবে না।"

সেই মুহূর্তে তাঁহার দক্ষিণ দিকে তিনি নৌকার শব্দ পাইলেন। সুবালা ডাকিয়া বলিলেন,—"কে গা! নৌকা লইয়া যাও? আমি সুবালা! আমাকে বাড়ি লইয়া চল।"

নৌকা নিকটে আসিয়া কিনারায় লাগিল। নৌকার লোক লাফ দিয়া ভূমির উপর পড়িল। সুবালা তখন তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন,—"কে ও, ধনুকধারী?"

এই কথা বলিয়াই সুবালা ভাবিতে লাগিলেন,—'ইহার সহিত যাওয়া উচিত কি না।'

পুনরায় তিনি ভাবিলেন,—"সে দিন শেষকালে এ লজ্জিত ও ভীত হইয়া আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল। পুনরায় আমাকে কি ও অযথা কথা বলিতে সাহস করিবে ?"

তিনি আবার ভাবিলেন,—"এ নির্জন স্থানে ইহার সহিত একাকী থাকা অপেক্ষা বাড়ির দিকে যাওয়াই ভাল।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া সুবালা বলিলেন,—"ধনুকধারী! আমাকে বাড়ি লইয়া চল।"

ধনুকধারী কোন উত্তর করিল না। সুবালা নৌকার অগ্রভাগে গিয়া বসিলেন। ধনুকধারী অপর দিকে বসিয়া নৌকা পরিচালিত করিল।

অল্পক্ষণের নিমিত্ত সুবালা মস্তক অবনত করিয়া অন্যমনস্কভাবে বসিয়াছিলেন। এখন একবার মুখ তুলিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। চমকিত হইয়া তিনি বলিলেন,—"ধনুকধারী! নদীর মাঝখানে তুমি নৌকা আনিলে কেন ?"

ধনুকধারী উত্তর করিল,—"স্রোতে ভাসাইয়া আনিল, আমি কি করিব!"

সুবালা বলিলেন,—"নৌকা ফিরাও, এখনি নৌকা ফিরাও। যেস্থানে হয় কিনারায় আমাকে নামাইয়া দাও। যেমন করিয়া পারি, সে স্থান হইতে আমি বাড়ি যাইব।"

ধনুকধারী বলিল,—"বাগানের ও ধারে নৌকা লাগাইব।"

সুবালা বলিলেন,—"না, তাহা হইবে না। কিনারার দিকে তুমি নৌকা লইয়া যাও। আমি নামিয়া যাইব।"

ধনুকধারী কোন উত্তর করিল না। নৌকা ফিরাইল না। কিনারার দিকে সে লইয়া গেল না। সুবালা একবার মনে করিলেন যে, "জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ি।" কিন্তু নৌকা এখন কোথায় আসিয়াছিল এবং কিনারা কতদূর, অন্ধকারে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

সুবালা বলিলেন,—"আজ তুমি পুনরায় মদ খাইয়াছ ?"

ধনুকধারী উত্তর করিল,—"হাঁ খাইয়াছি। আবার এই দেখ খাই।"

এই কথা বলিয়া নৌকার ভিতর হইতে সে বোতল বাহির করিল ও ছিপি খুলিয়া কতক মদ হড়-হড় করিয়া আপনার মুখে ঢালিয়া দিল।

সুবালা পুনরায় বলিলেন,—"নৌকা শীঘ্র কিনারার দিকে লইয়া চল, না লইয়া গেলে চীৎকার করিয়া আমি লোক ডাকিব।"

ধনুকধারী বলিল,—"লোক ডাকিবে? বটে! তবে এখনই আমি নৌকা ডুবাইয়া দিব।"

এই বলিয়া নৌকার একধারে সে এক পা ও অন্যধারে অপর পা রাখিয়া দোল দিতে লাগিল। নৌকার এ ধার—পুনরায় সে ধার অবনত হইয়া জলমগ্ন-প্রায় হইতে লাগিল। দোল দিতে দিতে ধনুকধারী এক-প্রকার বিকট হাসি হাসিতে লাগিল।

সে মনে করিয়াছিল যে, ভয় পাইয়া সুবালা তাহার নিকট কাকুতি মিনতি করিবেন। কিন্তু সুবালা কিছুই করিলেন না। "এ নরাধম পশুকে আমি আর কি বলিব!"—এইরূপ ভাবিয়া সুবালা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন ও মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ দোল দিয়া ধনুকধারী পুনরায় স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বোতলের ছিপি খুলিয়া আর একবার মদ্য পান করিল। পুনরায় সে বলিতে লাগিল,—"কেবল এক অঙ্গুলি থাকিতে ছাড়িলাম। নৌকার পাশ যদি আর এক আঙ্গুল নীচু করিতাম, তাহা হইলে এতক্ষণ বাছা! তোমাকে হাবুডুবু খাইতে হইত। আমার ধর্মজ্ঞান আছে, মনে দয়া আছে, তাই এ অকূল পাথারে তোমাকে ভাসাইতে বিলম্ব করিলাম। চীৎকার করিবে? করিয়া দেখ—কে তোমার চীৎকার শুনিতে পাইবে?"

সুবালা চুপ করিয়া রহিলেন। মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।

নৌকা আরও কিছু দূর স্রোতে ভাসিয়া গেল। নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে

এক বিস্তৃত নিম্নভূমির মাঠ আছে। নদীতে বান আসিলে ইহা গভীর জলে পূর্ণ হয়।

ধনুকধারী নৌকা লইয়া এই মাঠের ভিতর প্রবেশ করিল। সমস্ত নিম্নভূমি এক্ষণে জলপ্লাবিত হইয়াছিল। সমুদ্রের ন্যায় চারিদিকে জল ধূ ধূ করিতেছিল। মাঝে মাঝে এক-একটি গাছ দ্বীপের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল।

সম্মুখে একটি তালগাছ দেখিতে পাইয়া নৌকা লইয়া ধনুকধারী তাহার নিকট গমন করিল। গাছটি অধিক উচ্চ নহে। তাহার কাণ্ডের পাঁচ ছয় হাত জল মগ্ন হইয়াছিল। অবশিষ্ট অংশ উপরে জাগিয়াছিল। ইহার চারিদিকে অনেকগুলি বৃহৎ ও শুষ্কপত্র নিম্নমুখ হইয়া ঝুলিতেছিল। একটি পুরাতন ও জীর্ণ রজ্জু দ্বারা ধনুকধারী এই তালগাছে নৌকা বন্ধন করিল।

পুনরায় সুরা পান করিয়া সুবালার নিকট সে আসিয়া বসিল। তাহার পর নিজের কথা যথাসাধ্য মিষ্ট করিয়া সে বলিতে লাগিল,—"সুবালা! তোমার মনে আছে, আমি সেদিন কি বলিয়াছিলাম? কি করিব বল, আমার মনকে আমি সুস্থির করিতে পারিতেছি না। তোমাকে যদি না পাই তাহা হইলে আর কোন বস্তুতেই আমার প্রয়োজন নাই। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে তোমা ছাড়া হইয়া আমি এ প্রাণ রাখিব না। সেই জন্য আমি ছোরা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। এই দেখ সেই ছোরা। সর্বদা ইহা আমার বুকের উপর থাকে। কথার কথা নহে, আমি দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছি, তোমা ছাড়া হইয়া এ ছার প্রাণ আমি রাখিব না। তুমি দয়াময়ী। মানুষ দূরে থাকুক, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকল জীবের প্রতি তোমার দয়া অসীম। কিন্তু আমার প্রতি কি তোমার বিন্দুমাত্র দয়া হয় না! ছেলে বেলার কথা স্মরণ কর। চির কাল আমরা একসঙ্গে। যখন যাহা বলিয়াছ, তখন তাহা আমি করিয়াছি। আমার প্রতি তখন তোমার কত স্নেহ-মমতা ছিল। সে স্নেহ-মমতা এখন কোথায় গেল। ঝোঁকড়া-চুলো ছোঁড়া কে যে, আমার কাছ হইতে তোমাকে সে কাড়িয়া লইল? চল সুবালা আমরা কলিকাতা

যাই। সে স্থানে গিয়া, চল আমরা অন্য ধর্মে দীক্ষিত হই। খ্রীষ্টীয় ধর্ম আছে, ব্রহ্ম-ধর্ম আছে, আর্য নামক আর এক প্রকার নূতন ধর্ম আবির্ভাব হইয়াছে। এক ঈশ্বরের ভজনা করিতে এই সকল ধর্মে উপদেশ প্রদান করে। ইহারা নদীনালা, গাছ পালা, নোড়ানুড়ি, গরু-বাঁদর পূজা করিতে বলে না। শোকাকুলা মাতা অথবা ভগিনীকে ইহারা জীয়ন্ত ধরিয়া পোড়াইতে বলে না। ইহাদের শাস্ত্রে বলে যে, ভগবানের চক্ষে সকল মানুষ সমান। কিন্তু আমাদের ধর্ম দেখ। জনকয়েক ছাড়া পৃথিবীর যাবতীয় মানুষকে তুমি ঘৃণা করিবে,—আমাদের ধর্মে এই রূপ শিক্ষা প্রদান করে। অমুক কায়স্থ, উহাকে অল্প ঘৃণা করিবে; অমুক সদ্‌গোপ, উহাকে তাহা অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করিবে; অমুক নীচ জাতি উহাকে স্পর্শ পর্যন্ত করিবে না। নীচ জাতিরা ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিবে না। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তার সঙ্খেপ নাম পর্যন্ত ইহারা উচ্চারণ করিতে পারিবে না। ভগবানকে ইহারা ডাকিতে পারিবে না। ইহারা পয়সা দিবে, ইহাদের হইয়া আর-একজন ভগবানের পূজা করিবে। ইহারা অন্য জাতির দাসত্ব করিবে। ইহাই আমাদের ধর্মের শিক্ষা। কিন্তু আর অধিক দিন লোকে এ দৌরাত্ম্য সহ্য করিবে না। দক্ষিণে পরয়া, তিয়া প্রভৃতি জাতি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। পূর্বদেশে নমঃশূদ্র জাতিরা ক্ষেপিয়াছে। কলিকাতায় আমাদের কায়েতরা ক্ষেপিয়াছে। এখন আর তাহারা ব্রাহ্মণ দেখিয়া প্রণাম করে না। গলায় এক গাছা সুতা পরিয়া, গোঁপে চাড়া দিয়া আমাদের কায়েতরা এখন তাল ঠুকিয়া বেড়াইতেছে। “মানুষকে ঘৃণা কর,”—বলিতে গেলে ইহাই আমাদের ধর্মের সার। কিন্তু প্রকৃত ইহা ধর্ম নহে, পাপ। এই পাপের ফলে আমাদের কি দুর্গতি হইয়াছে, তাহা দেখ। তুমি ভূগোল পড়িয়াছ, ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছ। বল দেখি, এরূপ জাতি পৃথিবীতে আর কোথায় আছে? সেই জন্য তোমায় বিনয় করিয়া বলি যে, চল সুবালা, আমরা কলিকাতা যাই। সে স্থানে গিয়া আমরা অন্যধর্ম অবলম্বন করি। সেই ধর্ম অনুসারে আমরা বিবাহ করিব। তাহার পর আমরা পরম সুখে দিনযাপন করিব। তুমি

মিথ্যা কথা বলিতে জান না। আমি নিশ্চয় জানি যে, একবার তুমি 'হাঁ' বলিলে, সে কথার কখন আর অন্যথা হইবে না। বল, সুবালা, আমার প্রতি দয়া করিয়া বল যে, তুমি এ কাজ করিবে। তাহা হইলে মুহূর্তে নৌকা লইয়া আমি বাড়ি যাই। তাহার পর কল্য প্রাতঃকালে দুইজনে কলিকাতা পলায়ন করিব।"

সুবালা উত্তর করিলেন,—"আমি সামান্য বালিকা ধর্মের কথা আমি কি জানি? চিরকাল যাহা চলিয়া আসিতেছে, আমি তাহাই করি। বাল্যকালের স্নেহ-মমতা আমি ভুলি নাই। তোমাকে আমি বড় ভাই বলিয়া জানি। সেই স্নেহ-মমতা স্মরণ করিয়া তোমাকে আমি কিছু বলিব না। আমার বড় ভাই পাগল হইয়া আমাকে কুকথা বলিয়াছে, —এইরূপ বিবেচনা করিয়া তোমাকে আমি ক্ষমা করিব। চল, নৌকা লইয়া বাড়ি চল। কল্য প্রাতঃকালে বড়ালমহাশয়কে বলিয়া তোমাকে টাকা দিব। কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা দেশে ভ্রমণ করিলে, নানারূপ নূতন নূতন বিষয় দেখিলে তোমার এ ক্ষিপ্ততা দূর হইবে। তখন কোন স্থানে বাস করিয়া তুমি কাজ-কর্ম করিতে পারিবে। কিন্তু এ গ্রামে তুমি আর কখন আসিতে পারিবে না। আমার সহিত আর কখন তুমি সাক্ষাৎ করিতে পারিবে না। আমার আজ্ঞা অমান্য করিলে তোমার অনিষ্ট হইবে। তখন আর আমি তোমাকে ক্ষমা করিব না।"

ধনুকধারী হাসিয়া উত্তর করিল,—"তুমি আমার অনিষ্ট করিবে? তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে না? তুমি এখন কোথায় আছ, বাছাধন? চারিদিকে চাহিয়া দেখ। অকূল সমুদ্রের মাঝে সামান্য একখানি নৌকাতে একাকিনী তুমি আমার নিকট বসিয়া আছ। তোমার টাকা এখন কোথায়? এখন আমি তোমার হর্তা-কর্তা বিধাতা। আমি মনে করিলে তোমার জীবন দিতে পারি। পুনরায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, —কল্য প্রাতঃকালে আমার সহিত কলিকাতা পলায়ন করিয়া, সে স্থানে অন্য কোন ধর্মে দীক্ষিত হইয়া, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে কি না? বিশেষ বিবেচনা করিয়া উত্তর দিবে। কারণ, যদি বল 'হাঁ' তাহা

হইলে তোমার প্রাণরক্ষা হইবে যদি বল 'না' তাহা হইলে আমাদের দুইজনকে এই স্থানে মরিতে হইবে।"

সপ্তম অধ্যায়

ভূতে ও মাতালে

সুবালা বলিলেন,—"আমার উত্তর চাও? আমার উত্তর এই—না, না, না। আমি মরিতে ভয় করি না। ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে মরিব। আমাকে জীবিত রাখিতে যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই নির্জন জলাতে কোন না কোন উপায়ে তিনি আমার প্রাণরক্ষা করিবেন।"

ধনুকধারী বলিল,—"বার বার, তিন বার, এই শেষ বার আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—কল্য প্রাতঃকালে আমার সহিত কলিকাতা পলায়ন করিয়া, অন্য কোন ধর্মে দীক্ষিত হইয়া, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে কি না?"

সুবালা বলিলেন,—"আমিও এই শেষ বার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি যে, তোমার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু আমার পক্ষে শত সহস্র গুণে শ্রেয়। আর আমি তোমার সহিত কথা কহিব না। তুমি অতি পাপিষ্ঠ, তুমি অতি নরাধম, তোমার সহিত কথা কহিলেও পাপ হয়। আমার উত্তর এই—না, না, না।"

ধনুকধারী বলিল,—"বটে! তবে দেখ, আমি কি করি।"

এই কথা বলিয়া ধনুকধারী প্রথম নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগে গমন করিল। বোতল বাহির করিয়া পুনরায় সুরা পান করিল। তাহার পর টলিতে টলিতে নৌকার মধ্যস্থলে আসিয়া বসিল। বক্ষঃস্থল হইতে ছোরা বাহির করিয়া তাহার আঘাতে তক্তা কাটিয়া নৌকার ঠিক মধ্যস্থলে একটা ছিদ্র করিল। সেই ছিদ্রপথে কল কল শব্দে নৌকার ভিতর জল প্রবেশ করিতে লাগিল।

তাহার পর সুবালার নিকট পুনরায় সে আসিয়া বসিল। পকেট হইতে সিগারেটের বাক্স ও দিয়াশলাই বাহির করিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়া তাহার ধূমপান করিতে লাগিল।

সিগারেটের ধূম পান করিতে করিতে ধনুকধারী বলিতে লাগিল,—"ছিদ্র দিয়া যে পরিমাণে জল উঠিতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, আধ ঘণ্টার ভিতর নৌকা জলমগ্ন হইবে। আর আধ ঘণ্টা মাত্র আমাদের পরমায়ু আছে। আধ ঘণ্টা পরে আমরা দুই জনে পরমেশ্বরের নিকট গিয়া দাঁড়াইব। তিনি বিচার করিবেন। তাঁহার নিকট জাতিবিচার নাই। তোমার প্রতি আমার কিরূপ অসীম ভালবাসা, তাহা তিনি দেখিবেন। কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া তুমি আমার এই ভালবাসা তুচ্ছ করিলে। বাল্যকালের বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া ঝোঁকড়া-চুলোকে তুমি মনোনীত করিলে। এই পাপের জন্য ইহকালে অল্প বয়সে তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে। এই হইল তোমার প্রথম দণ্ড। পরকালে কুম্ভীপাক, রৌরব প্রভৃতি নরকে তোমাকে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।"

সুবালা কোন উত্তর করিলেন না। মনে মনে তিনি কেবল ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন,—"হে জগদীশ্বর! আমি বালিকা। বাঁচিয়া থাকিতে আমার বাসনা আছে। কিন্তু আমার পক্ষে কি ভাল, কি মন্দ, তুমি তাহা জান, আমি জানি না। আজ আমার মৃত্যু হইলে, যদি ভাল হয়, তবে তাহাই হউক। যদি আমাকে বাঁচাইতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই জনশূন্য জলামাঝে তাহার উপায় আসিয়া উপস্থিত হউক। তুমি যাহা করিবে, তাহা আমার মঙ্গলের জন্যই করিবে,—সেই বিশ্বাস আমার মনে, হে প্রভো! দৃঢ়ীভূত হউক। যদি মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ হয়, তাহা হইলে আমার মন হইতে মৃত্যুভয় দূর হউক। তোমার প্রতি আমার হৃদয়ে অসীম ভক্তি হউক, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিবার নিমিত্ত আমার মনে শক্তি হউক।"

কল কল শব্দে নৌকার ভিতর জল প্রবেশ করিতে লাগিল।

ধনুকধারী নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগে গিয়া পুনরায় মদ্য পান করিল। তাহার পর সুবালার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সিগারেটের ধূম পান

করিতে করিতে সে বলিতে লাগিল—"এ প্রাণ রাখিব না বলিয়া ছোরা গড়াইলাম। কিন্তু তখন মনে করিয়াছিলাম যে, আমি একেলা মরিব, তোমাকে কিছু বলিব না। ঝোঁকড়া-চুলোর সঙ্গে যে দিন তোমার বিবাহ হইবে, সেই দিন আমি মরিব। এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ সন্ধ্যাবেলা মন্দিরের সম্মুখে আমগাছে বসিয়া যখন তোমাকে দেখিতেছিলাম, তখন ভাবিলাম যে,—আমি একেলা মরি কেন? ঝোঁকড়া-চুলোর জন্য সুবালাকে রাখিয়া যাই কেন? নদীতে বান আসিয়াছে, চারি দিক্ জলে প্লাবিত হইয়াছে, এই নির্জন শিবমন্দিরে কেহ নাই। সুবালাকে ধরিয়া একসঙ্গে জলে ঝাঁপ দিব।—এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে তুমি জাগরিত হইয়া কাঁদাড়ের ধারে গমন করিলে। তাড়াতাড়ি গাছ হইতে নামিয়া, নৌকা লইয়া তোমার নিকট আমি উপস্থিত হইলাম। তুমি আপনি আমার নৌকায় উঠিয়া বসিলে। সমস্ত বিধাতার খেলা।"

সুবালা কোন উত্তর করিলেন না। নীরবে বসিয়া তিনি ভগবানকে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

কলকল শব্দে নৌকার ভিতর জল প্রবেশ করিতে লাগিল। নৌকা ক্রমেই জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইল।

ধনুকধারী পুনর্বার সুরা পান করিতে গমন করিল। পুনরায় সুবালার নিকট আসিয়া বসিল। তাহার পা টলিতেছিল। তাহার কথায় জড়তা হইয়াছিল। উকি তুলিতে তুলিতে সে বলিতে লাগিল,—"এ ছোরায় আর আবশ্যক নাই। ছোরা আমি এই ফেলিয়া দিলাম।"

বক্ষঃস্থল হইতে ছোরা বাহির করিয়া ধনুকধারী দূরে জলে ফেলিয়া দিল।

তাহার পর সে পুনরায় বলিতে লাগিল,—"ছোরার সহায়তায় আর আমাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে না। এই জলের ভিতর অবিলম্বে আমার প্রাণত্যাগ হইবে। আমি তোমাকে বধ করিব না, তুমি আমার প্রাণবধ করিবে! আমি সাঁতার জানি, জলে আমার সহজে মৃত্যু হইত

না। কিন্তু তুমি আমার মৃত্যুর কারণ হইবে। নৌকা যেই ডুবিবে, আর সেই সঙ্গে আমরাও দুই জনে জলে নিমগ্ন হইব। জলমগ্ন লোকেরা তৃণগাছটি পর্যন্ত ধরিতে চেষ্টা করে। আমাকে নিকটে পাইয়া তুমি আমাকে জড়াইয়া ধরিবে। তোমার হাত হইতে আমি আপনাকে ছাড়াইতে চেষ্টা করিব না। সঙ্গে সঙ্গে দুইজনে জলমগ্ন হইব। দুই হাতে তুমি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিবে, সেই অবস্থায় আমার প্রাণ বাহির হইবে। ইহার অপেক্ষা আর সুখের কি আছে। স্ব-ইচ্ছায় তুমি আমার সহিত সহ-মরণে যাইবে। তুমি আমার পতিব্রতা সতী হইবে। অরুন্ধতীকে লইয়া বশিষ্ঠ যেরূপ স্বর্গে বাস করিতেছেন, তোমাকে লইয়া সেইরূপ আমিও যুগ যুগান্তর—কত মন্বন্তর—স্বর্গ-ধামে বাস করিব। হাঃ, হাঃ, সুবালা আমার সহিত সতী হইবে। এ কথা মনে করিলে হাসি পায়, দুঃখ হয় না।"

সুবালা কোন উত্তর করিলেন না। নীরবে বসিয়া তিনি ভগবান্‌কে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

কলকল শব্দে নৌকার ভিতর জল প্রবেশ করিতে লাগিল। জলে পূর্ণ হইতে আর অল্প বাকী রহিল। দিয়াশলাই জ্বালাইয়া ধনুকধারী সুবালাকে দেখাইল। সে বলিল,—"সুবালা! এই দেখ, আর বিলম্ব নাই। নৌকা এখনি জলমগ্ন হইবে। তখন দুইজনে আমরা স্বর্গে গমন করিব। আহা! দুইজনে একসঙ্গে জীবন বিসর্জন করিলাম। ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি আছে!"

ধনুকধারী যখন দিয়াশলাই জ্বালাইল, তখন সুবালা দেখিলেন যে, সত্য সত্যই আর বিলম্ব নাই, নৌকা প্রায় সম্পূর্ণ পূর্ণ হইয়াছে, অল্পমাত্র জাগিয়া আছে, দুই-চারি মিনিটের মধ্যে ইহা ডুবিয়া যাইবে, দুই-চারি মিনিটের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইবে। সুবালা ভাবিলেন,—পাপিষ্ঠ যাহা মনে করিয়াছে, তাহা আমি কিছুতেই করিব না। পাপিষ্ঠকে কিছুতেই আমি স্পর্শ করিব না। স্রোতোবলে দূরে ভাসিয়া যাইতে চেষ্টা করিব। হে জগদীশ্বর! তোমার যাহা ইচ্ছা!"

ভগবানকে ডাকিবার সময় সুবালা আকাশের দিকে চাহিয়া

দেখিলেন। ধনুকধারীর হাতে তখনও দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বলিতেছে। সুবালার দৃষ্টি তালগাছের উপর পড়িল। শুষ্ক বড় বড় অনেকগুলি পত্র তালগাছকে বেষ্টন করিয়া নিম্নমুখ হইয়া ঝুলিতেছিল। সুবালা তাহা দেখিলেন।

সিগারেট ও দিয়াশলাইয়ের বাক্স সেই স্থানে রাখিয়া ধনুকধারী পুনরায় মদ্য পান করিতে গেল; সেই অবসরে সুবালা খপ করিয়া দিয়াশলাইয়ের বাক্স তুলিয়া লইলেন। পায়ের অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া তিনি উচ্চ হইয়া দাঁড়াইলেন, ও দিয়াশলাই জ্বালাইয়া নিম্নমুখ তালপত্রে অগ্নি দিয়া দিলেন। উপর পাহাড়ে বৃষ্টি হইয়াছিল, সেই জন্য নদীতে বান আসিয়াছিল। কিন্তু এ অঞ্চলে কয়েক দিবস বৃষ্টি হয় নাই, সেজন্য তালপত্রগুলি সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া ছিল। দিয়াশলাই জ্বালাইয়া যেই সুবালা তালপাতায় ধরিলেন, আর পাতাগুলি অমনি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। চারি দিক বহু দূর পর্যন্ত আলোকিত হইল।

তালগাছের মাথায় কে একজন বসিয়া ছিল। নদীতে বান আসিবার পূর্বে সে এই মাঠে আসিয়া তালগাছের উপর উঠিয়াছিল। তাহার পর যখন সমস্ত মাঠ জলপ্লাবিত হইল, তখন সে আর পলায়ন করিতে পারিল না। গাছের উপর তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইল। ধনুকধারী তাহা জানে না, সুবালাও তাহা জানেন না।

তালগাছ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। অগ্নির উত্তাপ সে সহ্য করিতে পারিল না, অথবা তাহার ভয় হইল। মৃদুস্বরে, হু, হু, হু, হু, শব্দ করিতে করিতে সড়সড় করিয়া সে গাছ হইতে কোনরূপ নামিয়া নৌকার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। সুবালা তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সুবালা বলিলেন,—"কালা বাবা! কালা বাবা! এই দুরাত্মার হাত হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

কেন,—তাহা বলিতে পারা যায় না, সেই মুহূর্তে খাঁদা ভূত ধনুকধারীকে জড়াইয়া ধরিল। ধনুকধারীও খাঁদা ভূতকে জড়াইয়া ধরিল। খাঁদা ভূতের এখন ক্ষিপ্ত অবস্থা। সোনা-বৌয়ের নিকট হইতে আপনার নাক লইয়া সে অতি দ্রুতবেগে মাঠ-ঘাট পার হইয়া এই স্থানে আসিয়া

উপস্থিত হইয়াছিল। বৃক্ষারোহণ-অভ্যাসের বশবর্তী হইয়া সে এ
তালগাছের উপর উঠিয়া বসিয়াছিল। পাগলের মর্জি! কেন
ধনুকধারীকে ধরিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। ধনুকধারী বোধ হ
ভাবিল যে,—'এই খাঁদা ভূত চপলাকে যেরূপ খাইয়াছে, সেইরূ
আমাকেও হয়তো খাইবে।' আতঙ্কের বশবর্তী হইয়া সে খাঁদা
ভূতকে জড়াইয়া ধরিল।

ভীমে ও কীচকে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, মগ্নপ্রায় নৌকা
উপর দুইজনে সেইরূপ তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। দুইজ
ধরাধরি, জড়াজড়ি, হুড়াহুড়ি হইতে লাগিল। অজ্ঞানপ্রায় হই
সুবালা নৌকার একপার্শ্বে বসিয়া এই ভীষণ রণ দর্শন করি
লাগিলেন।

অল্পক্ষণ হুটোপুটির পর জলপ্লাবিত প্রান্তরের মাঝে খাঁদা ভূতের মু
হইতে সহসা সেই ভয়াবহ হুহুঙ্কার শব্দ নির্গত হইল। অন্য বৎস
ক্ষিপ্ত হইবার সাত-আট দিন পরে খাঁদা ভূতের মুখ হইতে এই শব
নির্গত হইত ও তাহার পর তাহার শরীরের সুস্থতা হয়। এ বৎস
নানা কারণে তাহার মন উত্তেজিত হইয়াছিল। তাহার পর ধনুকধারী
সহিত এই তুমুল সংগ্রাম। সেইজন্য বোধ হয় সদ্য সদ্য তাহার মুখ দিয়
হুহুঙ্কার শব্দ নির্গত হইল।—

হু হু, হু হু, হু হু হু

ভয়ানক চীৎকারের চারিদিক্—পূর্ণ হইল।

জলপ্লাবিত প্রান্তরমধ্যে চারিটি গাছে যে সমুদয় কাক-পক্ষী
বসিয়াছিল, তাহারা সেই ভয়ানক শব্দ শুনিয়া ভীত হইল ও ভয়ার্তরবে
চারিদিক্ পূর্ণ করিয়া এদিক্ ওদিক্ উড়িতে লাগিল। আরও দূরে
গ্রামের কুক্কুরগণ উর্ধ্বমুখ হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

হু হু, হু হু, হু হু হু

খাঁদা ভূতের শব্দ।

হুয়া হুয়া, হ্যাঁকা হুয়া, হুয়া হুয়া হু।—শৃগালের ডাক।

তিনবার এইরূপ শব্দে পৃথিবী পরিপূরিত হইল।

কলকল শব্দে নৌকায় জল উঠিতে লাগিল। ধরাধরি, জড়াজড়ি, হুড়োহুড়ি, হুড়োহুড়ি,—দুইজনে যুদ্ধ হইতে লাগিল।

প্রজ্বলিত তালপত্রে চারিদিক্ আলোকিত হইল।

ঘোর বিপদে পতিত হইয়া সুবালার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ হইয়াছিল। দূরে যৎসামান্য আলোক তাঁহার নয়নগোচর হইল। তাহার পর গুরু ঠাকুরের প্লুতস্বরে ছোট-হরিদাস সম্বন্ধে ক্রন্দন তিনি শুনিতে পাইলেন। দুই দিকে নৌকার শব্দও অল্প অল্প তাঁহার কর্ণগোচর হইল। চীৎকার করিয়া সুবালা বলিলেন,—"কে গো! নৌকা লইয়া যাও? আমি সুবালা।"

এই কয়টি কথা বলিবামাত্র, বামদিক্ হইতে উত্তর আসিল,—"যাই, যাই, ভয় নাই।"

দক্ষিণ দিক্ হইতেও সেই মুহূর্তে উত্তর আসিল,—"ভয় নাই, ভয় নাই, যাই, যাই।"

উত্তর দিকে বিনয়ের ও দক্ষিণ দিকে বড়ালমহাশয়ের কণ্ঠস্বর বলিয়া বোধ হইল।

ব্রহ্মরাক্ষসের নিষ্ঠুর স্বভাব ও গুরুঠাকুরের নিদারুণ খেদ শুনিয়া গ্রামের লোক নৌকা ফিরাইয়া পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছিল। এমন সময় সুবালার কাতর ডাক সকলে শুনিতে পাইল। বড়ালমহাশয় তখন গ্রামবাসীকে ধিক্কার দিয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—"ঐ শুন. সুবালাদিদির কণ্ঠস্বর। ঘোরতর বিপদে পড়িয়া তিনি আমাদিগকে ডাকিতেছেন। আমি তোমাদিগকে বার বার বলিতেছি যে, যাহার হু হু শব্দ শুনিলে, সে ভূত নহে; সে জীয়ন্ত মানুষ, সে ক্ষিপ্ত। উন্মাদের হাতে সুবালাদিদিকে ফেলিয়া তোমরা পলায়ন করিবে? ছি, ছি, ধিক্ তোমাদিগকে!"

গ্রামের লোক লজ্জিত হইয়া নৌকা ফিরাইয়া যেদিকে আগুন জ্বলিতেছিল, যেদিক হইতে খাঁদা ভূতের হু হু শব্দ ও সুবালার কণ্ঠস্বর আসিয়াছিল, সেই দিকে দ্রুতবেগে তাহারা ধাবিত হইল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিনয় ও বড়ালমহাশয়ের নৌকা নিকটে পৌঁছিতে

না পৌঁছিতে ধনুকধারী ও খাঁদা ভূত জড়াজড়ি করিয়া দুইজনে জলে পতিত হইল। জলে পড়িবামাত্র সেই স্থানে ডুবিয়া গেল। তালপাতার আলোকে সুবালা সেই স্থানে কেবল গুটিকতক বুদ্‌বুদ্‌ দেখিতে পাইলেন। তাহাদের আর কোন চিহ্ন তিনি দেখিতে পাইলেন না।

দেখিবার অবকাশও ছিল না। নৌকাখানি জলে পূর্ণ হইতে অতি সামান্যই বাকী ছিল। খাঁদা ভূতের ও ধনুকধারীর হুড়াহুড়িতে সে সামান্য অংশটি অতি সত্বর পূর্ণ হইয়া গেল। নৌকা জলমগ্ন হইল। যে জীর্ণ ও পুরাতন রজ্জু দ্বারা তালগাছে নৌকা বাঁধা ছিল, জলের ভারে তাহা ছিঁড়িয়া গেল।

সুবালা ডুবিয়া গেলেন। তিনি অল্প অল্প সাঁতার জানিতেন। হাত-পা নাড়িয়া একবার তিনি ভাসিয়া উঠিলেন। মাথা তুলিয়া কিছুদূরে প্রজ্বলিত তালগাছ তিনি দেখিতে পাইলেন। কিন্তু স্রোত তাঁহাকে গাছ হইতে দূরে ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

পূর্বাপেক্ষা নিকট হইতে পুনরায় আশ্বাসবাক্য আসিল,—"ভয় নাই, ভয় নাই! যাই, যাই!"

বিনয়ের নৌকা প্রথম আসিয়া তালগাছের নিকট পৌঁছিল। সে স্থানে কাহাকেও না দেখিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তালপাতায় কে আগুন দিল! সুবালার কণ্ঠস্বর তিনি শুনিয়াছিলেন। সুবালা কোথায় গেলেন! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুদূরে একটা কৃষ্ণবর্ণের গোলাকার পদার্থ সহসা জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। দ্রুতবেগে সেই স্থানে বিনয় নৌকা পরিচালিত করিলেন। কৃষ্ণবর্ণের সেই গোলাকার পদার্থ সুবালার মস্তক। হাবুডুবু খাইতে খাইতে সুবালা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন। তাড়াতাড়ি বিনয় তাঁহাকে নৌকার উপর তুলিয়া ফেলিলেন।

নৌকায় উঠিয়া সুবালা কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তথাপি অতি কষ্টে তিনি বলিলেন,—"ঐ তালগাছ।—ধনুকধারী ও কালা-বাবা ডুবিয়াছে।"

নৌকা লইয়া বিনয় তালগাছের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। সুবালা হাত বাড়াইয়া দেখাইলেন,—"ঐ স্থানে···ধনুকধারী ও কালা-বাবা।"···

আর তিনি বলিতে পারিলেন না। কাঁপিতে কাঁপিতে সুবালা অচেতন হইয়া পড়িলেন। বিনয় তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিয়া ডুব দিলেন। অল্পক্ষণ পরে নিঃশ্বাস লইবার জন্য জলের উপর তিনি মস্তক তুলিলেন। দীর্ঘশ্বাসে বায়ু গ্রহণ করিয়া পুনরায় তিনি ডুব দিলেন। অল্পক্ষণ পরে জলের উপর পুনরায় তিনি মস্তক উত্তোলন করিলেন। তাঁহার পরিশ্রম বিফল হইল। ধনুকধারী ও খাঁদা ভূতকে তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

পুনরায় তিনি ডুব দিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় একজন গ্রামবাসী বলপূর্বক তাঁহাকে নৌকার উপর তুলিয়া ফেলিল ও তাঁহাকে ধরিয়া রহিল। সে বলিল,—"আপনার এ কাজ নয়। তাহারা যদি ডুবিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি তাহাদিগকে তুলিতে পারিবেন না। আপনি নিজে মারা পড়িবেন।"

এখন বিনয় জানিতে পারিলেন যে, সুবালা অচেতন হইয়াছেন। সুবালার শুশ্রূষায় তিনি এখন নিযুক্ত হইলেন। সুবালাকে সচেতন করিবার নিমিত্ত তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময় বড়ালমহাশয়ের নৌকা সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। বিনয় বলিলেন,—"বড়ালমহাশয়! সুবালাকে আমি নৌকায় তুলিয়াছি। সুবালার জন্য কোন ভয় নাই। কিন্তু সুবালা অচেতন হইয়াছে। তাহাকে লইয়া আমি বাড়ি চলিলাম। শুনিলাম যে, ধনুকধারী ও খাঁদা ভূত এই স্থানে জলমগ্ন হইয়াছে। তাহাদিগকে তুলিতে আপনারা চেষ্টা করুন। সুবালাকে লইয়া আমরা বাড়ি চলিলাম।"

বিনয়ের নৌকা গৃহাভিমুখে গমন করিল। ধনুকধারী সে স্থানে ডুবিয়াছে শুনিয়া বড়ালমহাশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন। জলমগ্ন প্রান্তরমধ্যে ধনুকধারী কোথা হইতে আসিল! সুবালাকেই বা সে স্থানে কে আনিল! আশ্চর্যান্বিত হইয়া বড়ালমহাশয় এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সেদিন কূপ হইতে যে লোক চপলার অস্থি তুলিয়াছিল, সে বড়ালমহাশয়ের নৌকাতে ছিল। পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া বড়ালমহাশয় তাহাকে ধনুকধারী ও খাঁদা ভূতের অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়
বিকৃত মস্তিষ্ক

পুরস্কারের লোভে অন্যান্য অনেক লোকও জলে ঝাঁপ দিল। অধিক অনুসন্ধান করিতে হয় নাই। তালগাছ হইতে অল্পদূরে দুইজনকে তাহারা দেখিতে পাইল। দুইজনে পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়াছিল। খাঁদা ভূত চেন-সম্বলিত নিজের নাক গলায় পরিধান করিয়া ছিল। দুইজনেরই প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। একখানি নৌকাতে দুইটি মৃতদেহ তুলিয়া অন্যান্য লোকের সহিত বড়ালমহাশয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অল্পক্ষণ পূর্বে সুবালাকে লইয়া বিনয়ও গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তাপ-সেক, সেবা-শুশ্রূষা করিতে করিতে সুবালার জ্ঞান হইল। কিরূপে ধনুকধারী তাঁহাকে সেই জনশূন্য জলপ্লাবিত মাঠে লইয়া গিয়াছিল এবং সে তাঁহাকে কিরূপ কথা বলিয়াছিল, ধীরে ধীরে সমস্ত পরিচয় বিজয়বাবু প্রভৃতিকে তিনি প্রদান করিলেন। ধনুকধারীর কু-ব্যবহার শুনিয়া বিজয়বাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

লজ্জায় ও ঘৃণায় কিছুক্ষণ অধোবদন থাকিয়া বড়ালমহাশয় বলিলেন, —"সুবালা দিদি! পাষণ্ডের সকল কথা তোমাকে আমি বলি নাই। বলিব বা কি করিয়া? কারণ, পূর্বে আমি এসব কথা শুনি নাই। যেদিন তোমরা আমাকে উইলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেদিন ঘরে গিয়া গৃহিণী আমাকে ধনুকধারীর গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। শুনিলাম যে উইল সম্বন্ধে ভয় দেখাইয়া সর্বদাই সে তাহার পিসীর নিকট হইতে টাকা-পয়সা লইত। এক দিন টাকা না পাইয়া

সে তাঁহাকে মারিতে পর্যন্ত গিয়াছিল। যাহা হউক, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন দিদি, তুমি তাহাকে ক্ষমা কর।"

নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করিয়া, ঘোর ভয়ে ভীত হইয়া, অনেকক্ষণ আর্দ্র বস্ত্রে থাকিয়া সুবালা সেই রাত্রিতে জ্বরে আক্রান্ত হইলেন।

বিজয়বাবুর আদেশে বড়ালমহাশয় থানায় সংবাদ দিয়াছিলেন। পুলিশের অনুমতি পাইয়া মৃতদেহ দুইটির তিনি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। বিজয়বাবুর আজ্ঞায় চেন-সম্বলিত খাঁদা ভূতের নাসিকা গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হইল।

সুবালার জ্বর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে বিকারে পরিণত হইল। পীড়া অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিল। দুই-চারি দিনের জন্য সকলকে তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বিজয়বাবুর আজ্ঞায় বিনয় কলিকাতা গিয়া তাঁহার মাতাকে আনিলেন। সুবালার কাকামহাশয় সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আত্মীয়-স্বজন সকলে অসীম স্নেহের সহিত সুবালাকে ঘিরিয়া রহিল। কায়মনঃপ্রাণে সকলে সুবালার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ইতর-ভদ্র, আবালবৃদ্ধ নর-নারী সুবালার জন্য সকলে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

ভগবানের কৃপায় সুবালার রোগ ক্রমে উপশম হইল। ভগবানের কৃপায় তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল।

সুবালা তখনও বড় দুর্বল, এইরূপ অবস্থায় এক দিন তিনি বালিশ ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন; বিজয়বাবু, কাকামহাশয়, বিনয়, বড়ালমহাশয় প্রভৃতি অনেকে সেই ঘরে বসিয়া গল্পগাছা করিতেছেন। সুবালা তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছেন। এমন সময় বিনয় তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা! খাঁদা ভূত বলিয়াছিল যে, রাজাবাবু ভূত হইয়া তাহার সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সোনা-বৌ সেই কথা বলিয়াছিলেন। রাজাবাবু সত্য কি ভূত হইয়াছেন? ভূত হইয়া সত্যই কি তিনি এই দুইজনের সহিত বার বার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন?"

বিজয়বাবু কি উত্তর প্রদান করেন; তাহা শুনিবার নিমিত্ত সাতিশয় আগ্রহসহকারে সকলে কান পাতিয়া রহিলেন।

বিজয়বাবু বলিলেন,—"না। রাজাবাবু যে ভূত হইয়াছেন, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। এই পৃথিবীতে অনেক লোক বিকৃতমস্তিষ্ক লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে অনেকে বড় হইয়া ধর্ম, রাজনীতি, সমাজসংস্কার অথবা অর্থোপার্জন—এই কয় বিষয়ের এক বিষয় লইয়া পাগল হয়। কিন্তু যে সীমা অতিক্রম করিলে মানুষকে ক্ষিপ্ত বলিতে পারা যায়, সে সীমা তাহারা অতিক্রম করে না। সেজন্য সহজ মানুষের ন্যায় থাকিয়া তাহারা সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকে। কিন্তু দৈবক্রমে কোন একটা প্রলোভনে পড়িয়া অথবা কোন একটা ঘটনা ঘটিয়া যদি তাহাদের বিকৃত মস্তিষ্ক অধিকতর উত্তেজিত হয়, তাহা হইলে তখন তাহারা সেই সীমা পার হইয়া ক্ষিপ্তদশায় উপনীত হয়। খাঁদা ভূত ও সোনা-বৌয়ের ভাগ্যে ইহাই ঘটিয়াছিল। প্রথম তো ইহারা বিকৃত মস্তিষ্ক লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। একরূপ-প্রকৃতিবিশিষ্ট দুইজন লোক ঘটনাক্রমে একত্র হইল। অতি নিষ্ঠুর কার্যে ইহারা প্রবৃত্ত হইল। ভাগ্যক্রমে সে চেষ্টা সফল হইল না। নিদ্রিত নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করিতে ইহারা উদ্যত হইয়াছিল। সে লোক একজনের স্বামী, অপর জনের প্রাণরক্ষাকর্তা। এই দুষ্কর্মের চিন্তা সর্বদাই তাহাদের মনে জাগরিত ছিল। সুতরাং রাজাবাবুর আকৃতি সর্বদা তাহারা মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিত। ইহাদের বয়ঃক্রম যতই অধিক হইতে লাগিল, মস্তিষ্কের বিকারও সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে দুইজনেই রীতিমত ক্ষিপ্ত হইল। তবে ক্ষিপ্ততা অনেক প্রকার। সচরাচর যাহাকে পাগল বলে, সোনা-বৌ তাহাই হইয়াছিলেন। খাঁদা ভূত বৎসরে একবার পাগল হইত এবং সে সময় অনেক পরিমাণে তাহার জ্ঞান থাকিত। বাল্যকালে আমাদের সহিত একটি বালক স্কুলে পড়িত। কিছুদিন তাহার মুখ হইতে হু হু এইরূপ একটি শব্দ নির্গত হইত। সে তাহা নিবারণ করিতে পারিত না। কিন্তু সে বালক ক্ষিপ্ত হয় নাই। খাঁদা ভূত যথার্থ পাগল হইয়াছিল।

সোনা-বৌ ও খাঁদা ভূত রাজাবাবুর ভূতকে দর্শন করে নাই, তাহাদের বিকারপ্রাপ্ত-মনঃসম্ভূত ছায়া দেখিত মাত্র। তবে এ কথা নিশ্চয় জানিও যে, আমরা সর্ব্বদা নানাপ্রকার ভৌতিক জীব দ্বারা পরিবৃত হইয়া আছি।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মৃত্যুকালে জ্যেঠামহাশয় বলিয়াছিলেন যে, খাঁদা ভূত নদীতীরে বসিয়া কাদা দিয়া আপনার নাসিকা গড়িতেছে এবং সোনা-বৌ উষর প্রান্তরে বৃক্ষতলে বসিয়া কাঁদিতেছে। পরে শুনিলাম সত্য সত্যই এইরূপ ঘটিয়াছিল। জ্যেঠামহাশয় কি করিয়া তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন?"

বিজয়বাবু উত্তর করিলেন,—"আমাদের শরীর ও মনের অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহাকে লোকে জীবাত্মা বলে। পৃথিবীতে তাহাকে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত থাকিয়া কাজ করিতে হয়, সেজন্য তাহার শক্তি অল্প। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে অসীম শক্তি নিহিত আছে। কোন কোন মানুষে সেই শক্তি আপনা-আপনি বিকশিত হয়, কোন কোন মানুষ নিয়মানুসারে যত্ন করিয়া সেই শক্তি বিকশিত করে, কোন কোন মানুষে পীড়িত অবস্থায় অথবা মৃত্যুকালে সেই শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে বিকশিত হয়। এই শক্তি বিকশিত হইলে মানুষের অনেক প্রকার অদ্ভুত ক্ষমতা হয়। অনেক দূরে কোনরূপ শব্দ হইলে কেহ বা তাহা শুনিতে পায়। ইংরাজিতে ইহাকে ক্লের-অডিয়েন্স (clair-audience) বলে। অনেক দূরের ঘটনা-সমূহ কেহ বা দেখিতে পায়। ইংরাজিতে ইহাকে ক্লের-ভয়ান্স (clair-voyance) বলে। পাপী ও দানববংশসম্ভূত, মনুষ্যজাতির অহিতকারী ব্যক্তিদিগের শরীর হইতে যে একপ্রকার কদাকার নীল আভা বাহির হয়, তাহাও কোন কোন ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হয় ও সেইরূপ লোকের দেহ হইতে যে একপ্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহাও তাহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। সকল মানুষ সর্বদা যে সমুদয় ভাল মন্দ ভৌতিক জীবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া আছে, তাহাদিগকেও কেহ কেহ দেখিতে পায়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন লোকের মধ্যে অনেক মহাত্মা আছেন, যাঁহাদের আশীর্বাদে লোকের নিশ্চয় মঙ্গল হয়। তাঁহাদের অভিশাপও অতি ভয়ানক। মৃত্যুকালে আমার

দাদামহাশয়ের মানসিক বৃত্তিসমূহ কিয়দংশে উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহার প্রভাবেই তিনি খাঁদা ভূতের নাসিকাগঠন ও সোনা-বৌয়ের অরণ্যে রোদন দর্শন করিয়ছিলেন।”

সুবালা সুস্থ ও সবল হইলে একদিন বিজয়বাবু সকলের সাক্ষাতে তাঁহাকে বলিলেন,—“সুবালা! “এই সম্পত্তি অতিশয় অমঙ্গলজনক অর্থাৎ অপয়া। পূর্বে যাঁহাদের ইহা ছিল তাঁহারা নির্বংশ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চিহ্নমাত্র এখন এ গ্রামে নাই। তাহার পর আমার দাদামহাশয় ইহার অধিকারী হইয়াছিলেন। ইহা লাভ করিয়া তাঁহারও সুখ হয় নাই। অতএব এ সম্পত্তি আমিও লইব না এবং তোমাকেও লইতে দিব না।”

সুবালা সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তাহার পর সুবালার কাকামহাশয়ের দিকে চাহিয়া বিজয়বাবু বলিলেন,—“আপনি যদি এ সম্পত্তি লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনাকে ইহা আমি লিখিয়া দিতে পারি।”

কাকামহাশয় উত্তর করিলেন,—“না, ভাই! আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই। আমি গরিব মানুষ বটে, কিন্তু এ সম্পত্তিতে আমার কোন অধিকার নাই। ইহা লইলে আমারও মঙ্গল হইবে না। আমিও পুত্র-কন্যা লইয়া ঘর করি। তাহাদের প্রাণ বড়, না টাকা বড়!”

বেণীবাবুর কোন আত্মীয় আছেন কি না, বিজয়বাবু এখন সেই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বেণীবাবুর পিতা পূর্বদেশ হইতে এ অঞ্চলে আসিয়া জেলায় মোক্তারি করিতেন। জেলার কাছারির কাগজপত্রের অন্বেষণ করিয়া তিনি পূর্বদেশে তাঁহার জন্মস্থানের নাম বাহির করিলেন। তাহার পর জানিতে পারিলেন যে, সে গ্রামের তাঁহাদের জ্ঞাতি-গোত্র অনেকেই জীবিত আছেন। সর্বাপেক্ষা যিনি নিকট জ্ঞাতি, তাঁহাকে আনাইয়া বিজয়বাবু এই সম্পত্তি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু কড়িকাঠের ভিতর হইতে যে ‘বার’ সোনা ও নগদ টাকা প্রভৃতি বাহির হইয়াছিল,

সে সমুদয় কতকগুলি সৎকার্যে তিনি নিয়োজিত করিলেন। প্রথম—সুবালা নিয়ম করিয়াছিলেন যে, এ গ্রামের কোন লোক উপবাসী থাকিবে না, অথবা পীড়িত হইলে বিনা চিকিৎসায় পড়িয়া থাকিবে না, সেই নিয়ম অনুযায়ী চিরকাল কার্য হইবার নিমিত্ত কতক টাকা নিয়োজিত হইল। দ্বিতীয়—সুবালা যেরূপ পশুপক্ষীদিগের আহার প্রদান করিতেন, চিরকাল সেইরূপ আহার প্রদানের নিমিত্ত ব্যবস্থা হইল। তৃতীয়—নদীর তীরে যে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গ্রামের অনিষ্ট হইতেছিল বিজয়বাবু সে বাঁধ পুনরায় বাঁধিয়া দিলেন। চতুর্থ—গ্রামে তিনি একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিলেন। পঞ্চম—গ্রামের পথ-ঘাট ও জল-নির্গমের পথ ভালরূপে প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ষষ্ঠ—নিকটস্থ একখানি গ্রামে লোকের জলকষ্ট ছিল, সেস্থানে বিজয়বাবু একটি পুষ্করিণী খননের নিমিত্ত অর্থ প্রদান করিলেন। সপ্তম—বড়ালমহাশয় ও বড়াল-গৃহিণী যাহাতে অবশিষ্ট জীবন পরম সুখে যাপন করিতে পারেন, সেজন্য প্রচুর অর্থ তাঁহাদিগের হস্তে তিনি সমর্পণ করিলেন। অষ্টম—চপলার মাতা ও তাহার ভগিনীর ভরণ-পোষণের নিমিত্ত বিজয়বাবু ভালরূপ ব্যবস্থা করিলেন। পশুপক্ষীদিগকে আহার দিবার নিমিত্ত পাগলীকে তিনি নিযুক্ত রাখিলেন। বাঘা কুকুরকে সুবালা আপনার সঙ্গে লইয়া গেলেন।

সুবালা এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাহা শুনিয়া গ্রামে হাহাকার পড়িয়া গেল। সীতা-সহিত রাম-লক্ষ্ণ ও দ্রৌপদী-সহিত পঞ্চপাণ্ডব যখন বনে গিয়াছিলেন, তখন প্রজাগণ যেরূপ বলিয়াছিলেন, গ্রামবাসিগণ এখন সেইরূপ বলিতে লাগিল। সকলে বলিল যে,—"সুবালা দিদিকে ছাড়িয়া আমরা এ গ্রামে থাকিতে পারিব না; তিনি যে স্থানে যাইবেন, আমরাও সেই স্থানে যাইব।" কেহ কেহ বিজয়বাবু ও কাকামহাশয়ের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেক বিলাপ করিয়া তাহারা বলিতে লাগিল,—"আমাদের লক্ষ্মীকে আপনারা লইয়া যাইবেন না। সুবালাদিদি গ্রামের অধীশ্বরী হইয়াছেন, তাহা ভাবিয়া আমাদের মনে বড় ভরসা হইয়াছিল। ভগবান্‌ও সেইদিন হইতে আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। কত বৎসর পরে এ বৎসর

সুবৃষ্টি হইয়াছে। এ বৎসর প্রচুর ধান্য জন্মিবে, তাহার লক্ষণ চারিদিকে প্রতীয়মান হইতেছে। এই সময় জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়, কিন্তু এ বৎসর তাহা হয় নাই। আমরা পরম সুখে কালযাপন করিতেছি। আমাদিগকে হতাশ করিয়া, পুনরায় আমাদিগকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া, আমাদের লক্ষ্মীকে আপনারা লইয়া যাইবেন না।"

নবম অধ্যায়

শেষ কথা

তাহাদের ক্রন্দন দেখিয়া সুবালাও সেই সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন। সুবালা বলিলেন,—"তোমরা ভয় করিও না। আমি তোমাদিগকে কখনও ভুলিব না। সর্বদাই তোমাদের তত্ত্ব লইব। তোমরা যাহাতে সুখে থাক, সর্বদাই আমি সে চেষ্টা করিব। বিপদ-আপদ হইলে, তোমরা আমাকে সংবাদ দিবে। তোমাদিগকে দায় হইতে উদ্ধার করিতে যথাসাধ্য আমি চেষ্টা করিব।"

বিজয়বাবু, বিনয় ও তাঁহার মাতা কলিকাতা গমন করিলেন। খুড়ী-মা ও পিসী-মায়ের সহিত সুবালা তাঁহার কাকামহাশয়ের বাটীতে গমন করিলেন। গ্রামে সেই সময় পুনরায় কান্নার রোল পড়িয়া গেল। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, শিশু-বৃদ্ধ, ইতর-ভদ্র--সকলে আসিয়া তাঁহার পাল্‌কি ঘিরিয়া দাঁড়াইল। অতিকষ্টে তাহাদের নিকট হইতে সুবালা বিদায় প্রাপ্ত হইলেন। গ্রামের বালক-বালিকাগণ বহুদূর পর্যন্ত তাঁহার পাল্‌কির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া যাইতে লাগিল। পথে পাল্‌কি থামাইয়া সুবালা তাহাদিগকে সিকি, দুয়ানি ও পয়সা প্রদান করিলেন এবং অনেক প্রবোধ দিয়া তাহাদিগকে বাটী ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

বড়ালমহাশয় ও বড়াল-গৃহিণী সুবালার সহিত তাঁহার কাকামহাশয়ের গ্রামে গমন করিলেন। "অল্পদিন সে স্থানে থাকিব, তাহার পর ফিরিয়া আসিব"— এইরূপ মনন করিয়া তাঁহারা গিয়াছিলেন। কিন্তু সুবালা

তাঁহাদিগকে ছাড়িলেন না এবং তাঁহারাও সুবালাকে ছাড়িয়া আসিতে পারিলেন না। কয়েক মাস তাঁহারা সেই গ্রামে রহিলেন, তাহার পর সুবালার সহিত তাঁহারা কলিকাতা গমন করিলেন। অনেক দিন পরে বিজয়বাবু তাঁহাদিগকে গ্রামে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

যথাসময়ে শুভদিনে ও শুভক্ষণে বিনয়ের সহিত সুবালার বিবাহ হইল। বিজয়বাবু ও তাঁহার গৃহিণীর আনন্দের সীমা রহিল না। অতি গৌরবের সহিত তাঁহারা সকলকে বলিতে লাগিলেন,—"এস! তোমরা আমাদের মা- লক্ষ্মীকে দেখ।"

সুবালার দয়া-মায়া ও ধর্মপরায়ণতার বিবরণ শ্রবণ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল ও সকলেই শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

পাক-স্পর্শ অর্থাৎ বৌভাতের দিন বিনয়ের অনেকগুলি বন্ধু নববধূকে দেখিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়া উপলক্ষে বস্ত্রাদি প্রদানের প্রথা অনেকের পক্ষে দণ্ডস্বরূপ হইয়াছে। তাঁহার বাড়িতে আসিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ পাছে সেই দণ্ডে দণ্ডিত হন, সেই কারণে নববধূ দেখাইতে বিজয়বাবু প্রথম সম্মত হন নাই। কিন্তু বিনয়ের বন্ধুগণের নিতান্ত অনুরোধে শেষে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল।

পাড়ার অল্পবয়স্কা কন্যা ও বধূগণের দ্বারা পরিবৃতা ও একহাত ঘোমটা দ্বারা অবগুণ্ঠিতা হইয়া, সুবালা একটি ঘরে বসিয়াছিলেন। বিনয়কে ও তাঁহার বন্ধুগণকে সঙ্গে লইয়া বিজয়বাবু সেই ঘরের সম্মুখে বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন, পাড়ার একটি কন্যা সুবালাকে বাহিরে আনিল। বিজয়বাবুর আজ্ঞায়—একদিকে বিনয় ও অপর দিকে সুবালা—তাঁহার দুইপার্শ্বে দুইজন দণ্ডায়মান হইলেন। পাড়ার সেই কন্যা অবগুণ্ঠন খুলিয়া নববধূর মুখ সকলকে দেখাইল।

লজ্জায় ও ভয়ে নববধূর পদদ্বয় ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। যথারীতি তিনি নয়নদ্বয় মুদিত করিয়াছিলেন। ঘোর কৃষ্ণবর্ণের চক্ষুপল্লবগুলি মুদিত নয়নদ্বয়ের উপর পড়িয়া, আহা! কি অপূর্ব শোভার আবির্ভাব হইয়াছিল। লোকে যাহাকে 'আহা মরি!' বলে সুবালা সেরূপ রূপবতী

ছিলেন না। তাঁহার সৌন্দর্য চাকচিক্যশালী সূর্যকিরণদ্বারা গঠিত হয় নাই। তাঁহার সৌন্দর্য শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের মৃদু-মধুর সুশীতল রশ্মিদ্বারা গঠিত হইয়াছিল। সাগর হইতে উঠিয়া অমৃতভাণ্ড ভূতলে রাখিয়া লক্ষ্মী যখন দেবগণের সম্মুখে লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন তখন তিনি যেরূপ দেখিতে হইয়াছিলেন, যুবকবৃন্দের সম্মুখে দণ্ডায়মানা সুবালাকে আজ সেইরূপ দেখাইতে লাগিল।

বিজয়বাবু বলিলেন,—"সুবালা, মা! একবার তুমি চক্ষু উন্মীলিত কর। তোমার ঐ দয়া-মায়া-পূর্ণ মৃদুভাবাপন্ন মৃগনয়ন দুইটি দেখিয়া সকলের মনে আনন্দ হউক। প্রসন্নবদনে বিস্ফারিত-লোচনে সকলের দিকে একবার চাহিয়া দেখ, মা!"

এই বলিয়া বিজয়বাবু পুনরায় তাঁহার ঘোমটা উন্মোচন করিয়া তাঁহার মাথার কাপড় সরাইয়া দিলেন শ্বশুরমহাশয়ের আজ্ঞা সুবালা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। ক্ষণকালের নিমিত্ত একবার তিনি চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর লজ্জায় পুনরায় তিনি অবগুণ্ঠনে মস্তক ও বদনমণ্ডল আবৃত করিয়া অধোমুখ হইয়া রহিলেন।

বিজয়বাবু অতি স্নেহের সহিত এক হাত বিনয়ের স্কন্ধে ও অপর হাত সুবালার স্কন্ধে রাখিয়া উপস্থিত যুবকবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া করিয়া বলিলেন,—"বৎসগণ! কার্যোপলক্ষে অনেক লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। অনেকের ব্যবহার দেখিয়া আমি হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি ভাবিতাম যে, সত্য, সাধুতা ও কর্তব্যপরায়ণতা এ দেশে অতি বিরল। যে দেশে সত্য সাধুতা ও কর্তব্যপরায়ণতা নাই, সে দেশের কিছুতেই মঙ্গল হয় না। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, কালক্রমে এই বাঙ্গালী জাতি ধ্বংস হইয়া যাইবে। যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদিগকে কুলি-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে হইবে। কিন্তু আমার পুত্রবধূকে দেখিয়া আমার মনে এখন আশার সঞ্চার হইয়াছে। 'যাহা সত্য, যাহা ধর্মসঙ্গত, যাহা কর্তব্য, তাহা আমি করিব',—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া আমার পুত্রবধূ কিরূপ মূল্যবান্ সম্পত্তি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহা তোমরা

সকলেই শুনিয়াছ। যে জাতির মধ্যে এরূপ সত্যপরায়ণা বালিকা জন্মিতে পারে, সে জাতির জন্য ভাবনা নাই। আমার পুত্রবধূ যে কেবল একেলা ধর্মপরায়ণা, তাহা কখনই নহে। বোধ হয়, দেশে তাঁহার মত শতশত বালক-বালিকা আছে। তাহাদিগকে আমরা জানি না এইমাত্র। তবে আর আমাদের ভাবনা কি? ঈশ্বর বাঙ্গালী জাতিকে যেরূপ প্রখর বুদ্ধি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন, সেরূপ প্রখর বুদ্ধি অন্য কোন জাতিকে তিনি প্রদান করেন নাই। এই প্রখর বুদ্ধি যখন সত্য, সাধুতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা দ্বারা আরও প্রভাবিশিষ্ট হইবে, তখন বাঙ্গালী জাতি পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। পুত্রগণ! আমি ও আমার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছি। অল্পদিন পরে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে পরলোকগমন করিতে হইবে। তখন বাঙ্গালী জাতির মান-সম্ভ্রম ও গৌরব তোমাদের হস্তে ন্যস্ত হইবে। বাঙালীজাতির নানারূপ কলঙ্ক আছে। বাঙ্গালী জাতি ভীরু, বাঙ্গালী সত্যকথা বলে না, প্রতিজ্ঞা পালন করে না, কার্যের ভার গ্রহণ করিয়া সে কার্য সম্পন্ন করে না। সেই জন্য বাঙ্গালী পরস্পরকে বিশ্বাস করে না, আর সেই নিমিত্ত পাঁচজনে মিলিত হইয়া কোন কাজ করিতে পারে না। অন্য জাতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও বাঙ্গালীর জ্ঞান হয় না। তিনশত বৎসর পূর্বে এক ইংরাজ বণিকসম্প্রদায় জনকত মুহরিকে এ দেশে প্রেরণ করিলেন। বিলাত হইতে ভারত তখন ছয় মাসের পথ ছিল। তথাপি সেই বণিকসম্পদায় ঐ জনকয়েক মুহরির সহায়তায় এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। এখনও দেখ—বিলাতে থাকেন ধনী, ভারতের পূর্বপ্রান্তে আসামের নিবিড় বনে তাঁহারা সামান্য কর্মচারী প্রেরণ করেন। কর্মচারী বন কাটিয়া চায়ের ক্ষেত্র করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু বাঙ্গালী কোন কার্যের সূচনা করিয়া কেবল দুই ক্রোশ মাত্র দূরে কর্মচারী পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত মনে থাকিতে পারে না। বহুদিন হইতে এইরূপ নানা প্রকার কলঙ্কের পসরা বাঙ্গালী জাতি মাথায় বহন করিয়া আসিতেছে। বৎসগণ! বাঙ্গালী জাতির এই সমুদয় কলঙ্ক

তোমাদিগকে দূর করিতে হইবে। প্রধান কথা এই যে, সত্য, সত্য ভিন্ন আমাদের অন্য গতি নাই। সর্বদা সত্যকথা বলিবে। ভুলিয়াও কখন অসত্য কথা বলিবে না। কখনও সত্যপথ হইতে বিচলিত হইবে না। 'অসত্য কথা, অসত্য আচরণ বাঙ্গালী একেবারেই জানে না,'—যখন আমাদের এই যশ জগতে ঘোষিত হইবে, তখন বাঙ্গালীর ঘর ধনধান্যে পূর্ণ হইবে, বাঙ্গালীর বিদ্যা ও ধর্মপ্রভাবে জগতে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইবে, সকল জাতি তখন বাঙ্গালীকে পূজা করিবে, বাঙ্গালীর গৌরবে তখন সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হইবে। বৎসগণ! একমাত্র সত্য, সত্য,সত্য ভিন্ন আর আমাদের অন্য গতি নাই। পুনরায় বলি,—সত্যপথ হইতে কখনও বিচলিত হইবে না। তোমাদের নিকট আমার এই একান্ত মিনতি।

"আর একটি উপদেশ তোমাদিগকে আমি প্রদান করি। অন্যের কাছ হইতে কিছু লইব, অন্য লোক আমাকে দিউক,—কখনও এরূপ কামনা করিবে না। নীচপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট লোকেরা এইরূপ কামনা করে। যাহারা অন্য লোকের নিকট হইতে কিছু লইতে চেষ্টা করে, জগদীশ্বর চিরকাল তাহাদিগকে পর-প্রত্যাশী করিয়া রাখেন। আমি এরূপ অনেক লোককে দেখিয়াছি। তাহাদের মনে লজ্জা নাই। কিন্তু সাধারণের নিকট তাহারা যে কিরূপ ঘৃণার পাত্র, তাহা তাহারা জানে না। কাহারও নিকট হইতে যেন কিছু লইতে না হয়, অন্য লোককে যেন দিতে পারি, জগদীশ্বরের নিকটও পিতৃলোকের নিকট সর্বদা এইরূপ প্রার্থনা করিবে।"

তাহার পর সুবালার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—"মা সুবালা! সর্বগুণে গুণান্বিতা তুমি, তোমাকে আমি এখন এই আশীর্বাদ করি যে, তুমি সত্যবাদী, ধর্মপরায়ণ ও কর্তব্যপরায়ণ বীরপুত্রদিগের জননী হও।"

সুবালাকে লইয়া পাড়ার কন্যাটি পুনরায় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। বিনয়ের বন্ধুগণ বাহির-বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। বিনয়ের মাতাপিতা—পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া—মনের সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।